কিশোর আনন্দ

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

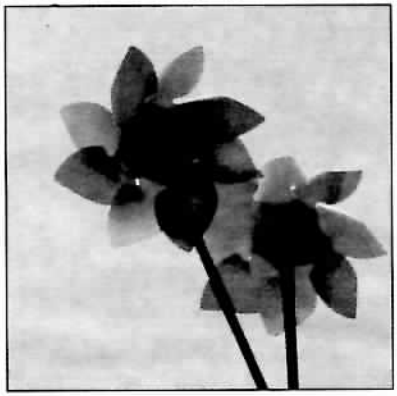

কিশোর আনন্দ ৫

আলোকিত মানুষ চাই

কিশোর আনন্দ ৫

সম্পাদনা ॥ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২২৫

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

নির্বাহী সম্পাদক
কাজল ঘোষ

শিল্প সম্পাদক
ধ্রুব এষ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪১০ জানুয়ারি ২০০৪

প্রথম সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ
পৌষ ১৪১৮ নভেম্বর ২০১১

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
নিজাম প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস
২/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0224-x

Kishore Anondo, Editor : Abdullah Abu Sayeed.
Published by Bishwo Shahitto Kendro, 14 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1000
Bangladesh. Cover Design : Dhrouv Esh. First Edition : January 2004.

ভূমিকা

তোমরা, আমাদের দেশের কিশোর-তরুণরা, যাতে আলোকিত মানুষ হিশেবে গড়ে উঠতে পার সেজন্য তোমাদের মন ও বয়সের উপযোগী সবচেয়ে সুন্দর আর স্বপ্নেভরা বইগুলো তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বহুদিন ধরে সারা দেশে ঐ চেষ্টা করে আসছি। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তোমাদের হাতে আমরা তুলে দিচ্ছি নানারকম আনন্দময় উপন্যাস, মজাদার ভ্রমণকাহিনী, মহৎ মানুষদের জীবনী, রম্যরচনা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও আরও নানা ধরনের বই—এমন সব বই যা পড়লে তোমাদের মন অনুভূতিময় ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠবে এবং জ্ঞানের উচ্চতর জগতে প্রবেশের জন্য তোমরা উন্মুখ ও যোগ্য হবে।

কিন্তু এসব বই পড়ার পাশাপাশি মানব-সভ্যতার সেই সব বিষয় ও তথ্যও তো তোমাদের জানতে হবে যেগুলো জানলে তোমরা সুঅবহিত আধুনিক বিশ্ব-নাগরিক হিশেবে গড়ে উঠবে। 'কিশোর আনন্দ' প্রকাশ করা হল সে জন্যেই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে 'আসন্ন' নামে আমরা তোমাদের জন্য যে উৎকর্ষধর্মী মাসিক পত্রিকাটি বের করি তার লেখাগুলো নিয়েই এই 'কিশোর আনন্দ' প্রকাশিত হচ্ছে।

একজন ছেলে বা মেয়ের যা কিছু জেনে বড় হওয়া উচিত তার অধিকাংশ তথ্যই তোমরা পাবে এই কিশোর আনন্দে। বিশ থেকে পঁচিশ খণ্ডে কিশোর আনন্দ প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রইল। এর মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, অর্থনীতি থেকে শুরু করে মানবজগতের অসংখ্য তথ্য তো তোমরা পাবেই সেইসঙ্গে পাবে অনেক অনবদ্য গল্প, কবিতা, কুইজ, চুটকি, স্মরণীয় বাণী, এমনি আরও অনেক রমণীয় ও উপভোগ্য লেখা।

আমরা আশা করি যারা এই বইয়ের সবগুলো সংখ্যা মন দিয়ে পড়বে পৃথিবীর জ্ঞানজগতের সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলো সম্বন্ধে তারা একটা মোটামুটি ধারণা পাবে।

এ বইয়ের সব লেখাই অত্যন্ত সুলিখিত ও উপভোগ্য। তোমাদের জন্য ভালো ভালো লেখকদের যেসব অনন্য লেখা তাঁদের বই ও পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোকে ঐ সব বই ও পত্রপত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এই সংকলনে প্রকাশ করা হয়েছে। লেখাগুলো পড়ে তোমরা আনন্দ পেলে আমাদের কষ্ট সার্থক হবে।

কেবল কিশোর-তরুণরা নয়, আমাদের ধারণা সব বয়সের সবরকম মানুষই 'কিশোর আনন্দ' একইভাবে উপভোগ করতে পারবেন এবং পড়ে উপকৃত হবেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

কিশোর আনন্দ ৫

সূ চি প ত্র

ছড়া / কবিতা

নবীর শিক্ষা ॥ শেখ হবিবর রহমান ৯
খিচুড়ি ॥ সুকুমার রায় ৩২
শাহজাদা ॥ ফররুখ আহমদ ৭৭
আকাশ তুমি ॥ আহমাদ মাযহার ১০৭
বাবা রে বাবা ॥ লুৎফর রহমান রিটন ১৫১

গল্প

বেঁচে থাকো সর্দিকাশি ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ১৫
কতটা জমি দরকার ॥ লিও টলস্টয় ৪৩
সমানে সমান ॥ জসীম উদ্‌দীন ৬৯
বিচার নেই ॥ আমীরুল ইসলাম ৮৪
এক মিনিটের হাসি ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ৯৫
সুলেখার ক্রন্দন ॥ বনফুল-এর গল্প ১০৪
জামগাছ ॥ কৃষণ চন্দর ১২২
বিউটি ও অদ্ভুত জন্তুর গল্প ॥ ফ্রান্সের রূপকথা ১৩২

প্রবন্ধ

কথা ভাষা নিয়ে : বাংলাভাষা ॥ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ১০
মাছেরাও কথা বলে ॥ বিপ্লব দাশ ২৯
স্ট্যাচু অব লিবার্টি নির্মাণের কাহিনী ৩৮
সুপার নোভা ॥ অরূপরতন ভট্টাচার্য ৬৩
র‍্যাফ্লেশিয়া ॥ গিয়াসউদ্দীন বুলবুল ৭৪
উত্তর মেরুর শাদা ভালুক ॥ খায়রুল আলম সবুজ ৮০
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ৮৬
মাছ পোষা ৮৯
শিকারি ডেলমন্টের কাহিনী ৯৭
আফ্রিকার ডোরাকাটা ১১৪
ডিম্ব নৃত্য ॥ আবদুল হক খন্দকার ১১৯

জীবনী

আব্রাহাম লিঙ্কন ২৫
পিকাসোর ছেলেবেলা ১২৮

ইতিহাস / ভ্রমণকাহিনী

এভারেস্টজয়ী শেরপা তেনজিং ৩৩
ওয়াটারলুর প্রান্তরে ৫৬

খেলা / বিলিভ ইট অর নট

এক হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারে কচ্ছপ ৬১
বাস্কেটবল খেলা প্রথম কোথায় হয়েছিল? ৭৬
সম্রাট শাহজাহানের চিকিৎসক ৮২
শতাব্দীর সেরা খেলা ১০৮

কুইজ / ধাঁধা

কাগজের জাল ৪২

বিবিধ

কাঠবিড়াল কি উড়তে পারে? ১৪
ট্রেন ফেল করা চার্চিল ৩১
এরোপ্লেন পাখি ৬৮
জাতীয় সংগীতের কথা ৮৩
হেমিংওয়ের ঠিকানা ৮৫
হাঁসের মতো লম্বা গলা ৯৪
বিশ্ববিদ্যালয় কবে গড়ে উঠেছিল? ৯৬

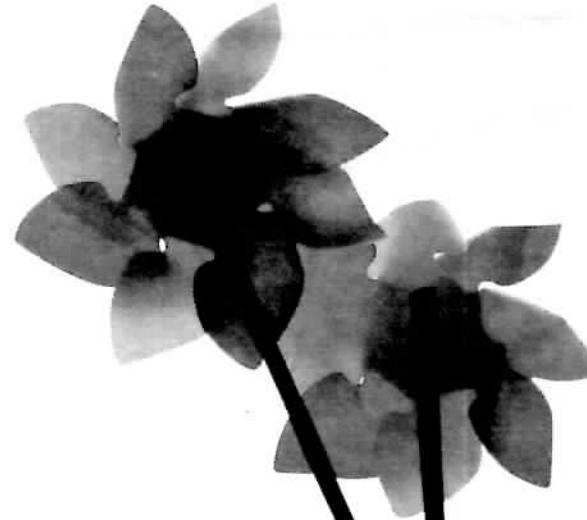

শেখ হবিবর রহমান

নবীর শিক্ষা

'তিন দিন হতে খাইতে না পাই, নাই কিছু মোর ঘরে,
দারা পরিবার বাড়িতে আমার উপোস করিয়া মরে।
নাহি পাই কাজ তাই ত্যাজি লাজ বেড়াই ভিক্ষা করি।
হে দয়াল নবী দাও কিছু মোরে নহিলে পরানে মরি।'
আরবের নবী, করুণার ছবি ভিখারির পানে চাহি,
কোমল কণ্ঠে কহিলা, 'তোমার ঘরে কি কিছুই নাহি?'
বলিল সে, 'আছে শুধু মোর কাছে কম্বল একখানি।'
কহিলা রসুল, 'এক্ষণি গিয়া দাও তাহা মোরে আনি।'
সম্বল মোর কম্বলখানি বেচিয়া তাহার পরে,
অর্ধেক দাম দিলেন রসুল খাদ্য কেনার তরে,
বাকি টাকা দিয়া কিনিলা কুঠার হাতল লাগায়ে নিজে,
কহিলেন, 'যাও, কাঠ কেটে খাও, দ্যাখো খোদা করে কী যে।'

সেদিন হইতে শ্রম-সাধনায় ঢালিল ভিখারি প্রাণ,
বনের কাষ্ঠ বাজারে বেচিয়া দিন করে গুজরান।
অভাব তাহার রহিল না আর, হইল সে সুখী ভবে,
নবীর শিক্ষা : কোরো না ভিক্ষা, মেহনত করো সবে।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

কথা ভাষা নিয়ে : বাংলাভাষা

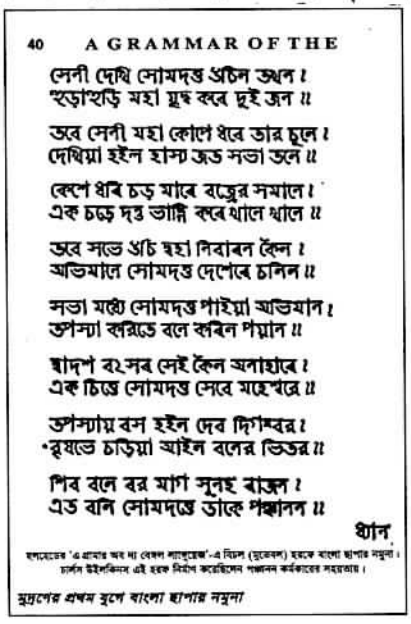

40 A GRAMMAR OF THE

সেনী দেখি সোমদত্ত উঠিল তখন।
হুড়াহুড়ি মহা যুদ্ধ করে দুই জন॥

তবে সেনী মহা কোপে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য জত সভা তলে॥

কেশে ধরি চড় মারে বক্ষের সমালে।
এক চড়ে দত্ত ভাঙ্গি করে থালে থালে॥

তবে সভে উঠি দুহা নিবারন কৈল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশেরে চলিল॥

সভা মধ্যে সোমদত্ত পাইয়া অভিমান।
তপস্যা করিতে বলে করিল পয়ান॥

দ্বাদশ বৎসর সেই কৈল অনাহারে।
এক চিত্তে সোমদত্ত সেবে মহেশ্বরে॥

তপস্যায় বস হইল দেব দিগম্বর।
বৃষভে চাড়িয়া আইল বলের ভিতর॥

শিব বলে বর মাগ সুনহ বাহুল।
এত বলি সোমদত্তে তাকে পঞ্চানন॥

ধ্যান

হলহেডের 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'-এ বিদগ্ধ (ছুকেবল) হরফে বাংলা ছাপার নমুনা। চার্লস উইলকিন্স এই হরফ নির্মাণ করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায়।

মুদ্রণের প্রথম যুগে বাংলা ছাপার নমুনা

দেশের নাম বাংলা—বাংলাদেশ। আর ভাষা আমাদের বারো কোটি মানুষের মাতৃভাষা—বাংলাভাষা। কেবল আমরাই নই, আমাদের দেশের বাইরেও কয়েক কোটি মানুষ কথা কয় এই ভাষায়। এই বাংলাভাষায় গান, কবিতা লিখেছেন চণ্ডীদাস, আলাওল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। আজ আমাদের গৌরব, আমাদের ভাষার সাহিত্য পৃথিবীর পয়লা সারিতে আপন ঠাঁই করে নিয়েছে।

মা-কে নিয়ে কথা বলতে কত সুখ। তেমনি সুখ, তেমনি গর্ব আপন ভাষা নিয়ে। এ-যে মায়ের ভাষা। তাই বলি মাতৃভাষা। আবার জননী মায়ের মতো, জন্মভূমি দেশের মতো, নিজের ভাষাও হচ্ছে ভাষা-জননী। তাই বাংলাভাষা আমাদের ভাষা-জননী। সে-কারণেই তো জননীর ইজ্জত-রক্ষার লড়াইয়ে বাহান্ন সালে ছেলেরা হাসিমুখে জান দিয়েছে।

এই বাংলাভাষা নিয়ে কথা।

এ-ভাষার জন্ম কবে, কোথায়, কেমন করে?

জটিল প্রশ্ন। সোজা কথায় তার জবাব নেই। ভাষার পণ্ডিতেরা কত কেতাব লিখেছেন সেই জন্মকথা নিয়ে। আপাতত ভারী ভারী সেসব আলোচনা থাক। যখন বয়েস হবে তখন জানতে পারবে।

ভাষার জন্ম কবে? সন তারিখ মিলিয়ে খুব নির্দিষ্ট করে তা বলা সম্ভব নয়। কেননা, কোন বিশেষ দিনে, বিশেষ ক্ষণে ভাষা জন্ম নিল—ভাষার ব্যাপারে তেমনটি কিছু ঘটে না। ভাষা আসলে

হয়ে ওঠে। মানুষের মুখ থেকে মুখে আপনাআপনি হয়ে ওঠে। রোজকার নানান দরকারে, অভিজ্ঞতায়, হরেক টানাপড়েনে তা একটি বিশেষ চেহারা নিতে থাকে। এবং ক্রমে, জানি না কখন, তা গড়ে ওঠে।

বাংলাভাষারও জন্ম এমনিভাবে। সেই কবে অতীতে তখনকার ভারতবর্ষের পুব-অঞ্চলে মানুষের মুখে-মুখে এ-ভাষার জন্ম। কত হাজার বছর আগে নিশ্চিত করে তা কে বলবে?

কেননা মুখে-মুখে চলিত ভাষাকে তো ধরে রাখা যায় না। তাই তার লিখিত কোনো দলিল থাকে না। মুখের ভাষা জীবন্ত ভাষা। কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারে না। কেবলই তা বদলে যায়—এক এলাকা থেকে আরেক এলাকা, এক যুগ থেকে আরেক যুগে। আবার দেখা যায়, একই ভাষায় সমাজের উঁচুতলা, মাঝের তলা, নিচুতলার মানুষের কথাবার্তায় গরমিল রয়েছে মেলা। জীবন্ত এবং মৌখিক লক্ষণই তাই। কিন্তু কবিতা, সাহিত্য, ধর্ম-উপদেশ যা কিনা লেখা হয়ে থাকে তা ধরে থাকে লেখার হরফে। এটা হচ্ছে লেখার ভাষা বা সাহিত্যের ভাষা। লেখার ভাষা মুখের মতো নয়। মুখ থেকে মুখে, কান থেকে কানে তা তেমনভাবে বদলে যায় না বা মুছে যায় না। লেখার ভাষা হচ্ছে সে-ভাষার দলিল, তার ইতিহাস। তাই থেকে খবর পাওয়া গেছে পুরোনো বাংলাভাষার।

আমাদের ভাষার এই দলিল আবিষ্কার করেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার থেকে তিনি গোটা পঞ্চাশেক কবিতা-গানের এক পুঁথি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। পণ্ডিতেরা বললেন, এই হচ্ছে সবচাইতে পুরোনো বাংলা ভাষায় লেখা সাহিত্য। আর এ-ভাষার বয়েস হবে হাজারখানেক বছর। অতএব, আমরা বলি, আমাদের ভাষার সাহিত্য এবং আমাদের সাহিত্যের ভাষা হাজার বছরের পুরোনো। হাজার বছরের পুরোনো বাংলা কবিতা—সেগুলোর সাধারণ নাম চর্যাপদ, চর্যার গান। এ-ভাষার নমুনা এইরকম :

ক ॥ *এক সো পাদুমা চউস্‌টঠী পাখুড়ি।*
তহি চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি।

এখনকার বাংলায়—একটি সেই পদ্ম, তার চৌষট্টি পাপড়ি। ডোম্বি বেচারি তার ওপরে চড়ে নাচে।

খ ॥ *গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ।*

এখনকার বাংলায়—ওরে, গঙ্গা-যমুনার মধ্যে নৌকা বয়।

গ ॥ *উঁচু উঁচু পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।*

এখনকার বাংলায়—উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে শবরী বালিকা(শিকারি জাতির মেয়ে) বাস করে।

চর্যার ভাষার ঐরকম কিছু-কিছু শব্দ এই হাজার বছর পরেও আমাদের বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। তবে গোটা কবিতা পড়লে দেখা যাবে এ-ভাষার মধ্যে খানিকটা আবছা আড়াল ভাব রয়েছে। খানিকটা ধাঁধার মতো। সেজন্যে চর্যার পুরোনো বাংলাকে বলা হয়ে থাকে 'সনধা' ভাষা বা 'আলো-আঁধারি' ভাষা। কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না, কিছুটা আলো, কিছুটা আঁধার। সে-কারণে এই পরিচয়—'আলো-আঁধারি'।

আরেকটা কথা। সেই এক হাজার বছর আগে বাংলাভাষা আর বাংলা কবিতার চর্চা যাঁরা করে গেছেন তাঁরা কিন্তু সমাজের নামিদামি লোক নন। সমাজের নিচুমহলে যাদের বাস, নগরের গ্রামের ভেতরে যাদের জায়গা হয়নি, সেইসব মানুষের জীবনের কথা নিয়ে চর্যার ভাষায় কবিতা। সমাজের যাঁরা প্রধান, শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি তাঁরা কিন্তু বাংলাভাষার চর্চা করতেন না। তাঁরা পড়তেন সংস্কৃত, লিখতেন সংস্কৃতে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, সংস্কৃত হচ্ছে স্বর্গের ভাষা, দেবতার ভাষা। বাংলাভাষার চর্চা করলে গতি নরকে। আসলে কবিতায়-গানে আমাদের বাংলাভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সমাজের সাধারণ মানুষেরাই। সে-

কারণে হাজার বছরের পুরোনো বাংলায় যেসব শব্দের দেখা পাই, তার বেশকিছু শব্দ তখনকার অতিসাধারণ মানুষের মুখের কথা। চর্যাপদের ভাষায় যাদের জীবনের ছবি পাই তারা হল এইসব মানুষ--ডোম, চাঁড়াল, তাঁতি, ধুনরি, শিকারি প্রভৃতি।

হাজার বছরের এই পুরোনো বাংলাকে পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছেন প্রাচীন বাংলা। এখন সহজেই প্রশ্ন আসবে—তা হলে এই বাংলাভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে। তার পরের প্রশ্নটি তখন হবে—সে-ভাষা আবার জন্ম নিয়েছে কোন ভাষা থেকে। কীভাবে এবং কোন সময় তার জন্ম। এমনি ধারায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন রয়েছে, তারও পর প্রশ্ন রয়েছে। এভাবে জন্মকথার খোঁজ নিতে গেলে বাংলাভাষার পুরোদস্তুর ঠিকুজিই দাঁড় করাতে হবে। ব্যাপারটা কিন্তু খুব সহজ নয়। কিছুটা পণ্ডিতি ধরনের।

তা হলে এক্ষেত্রে সেই পণ্ডিতদের কথাই মানতে হয়।

হাজার পাঁচেক বছর আগেকার কথা। তখন ইয়োরোপের কোনো-এক এলাকায় এক বিশেষ ভাষা চালু ছিল। তাকেই বলা হয়ে থাকে আমাদের আজকের ভাষার আদির আদি। পণ্ডিতেরা তার নাম দিয়েছেন ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা। যেসব মানুষ সেই আদি ভাষায় কথা বলত তারা সবাই এক জায়গায় বসে থাকেনি। আবাদ আর আবাসের জন্যে একেক দল একেক দিকে বেরিয়ে গেছে। যুগের-পর-যুগ তারা পথ হেঁটেছে। কোথায় পাবে প্রচুর আহার, কোথায় পাবে নিরাপদ আশ্রয়, তারই খোঁজে ইয়োরোপ থেকে 'আর্য' নামের দলটি ইরানে এসে বসত করল। আর্যদের আরেক অংশ আরো এগিয়ে হিন্দুস্থান পর্বত ডিঙিয়ে প্রবেশ করল ভারতবর্ষ উপমহাদেশের উত্তর-অঞ্চলে। কালে সেই ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে নতুন আর্যভাষা জন্ম নেয়। দুদেশে তার দুভাগ—ইরানের আর্যভাষা আর ভারতের আর্যভাষা। সেও প্রায় তিন-সাড়ে তিন হাজার বছরের মতো হয়ে গেল।

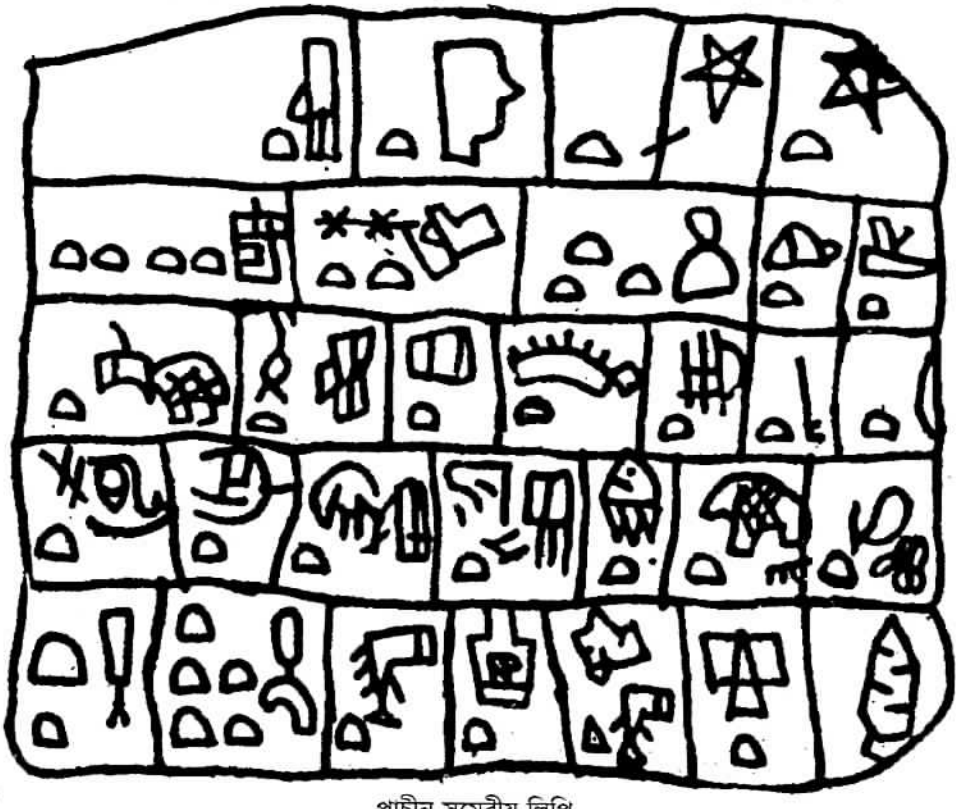

প্রাচীন সুমেরীয় লিপি

ভাষা চলে নদীর স্রোতের মতো। এতগুলো বছর ধরে কত চড়াই-উতরাই ভেঙে ভাষা-নদী পেরিয়ে এসেছে কত দীর্ঘ পথ। কোথাও তার স্রোত গেছে হারিয়ে। কোথাও বেগবতী হচ্ছে নতুন স্রোতে। এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে জন্ম মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার এবং তা থেকে নবীন ভারতীয় আর্যভাষার। বলা দরকার, এসব নাম কিন্তু হাল-আমলের পণ্ডিতদের দেওয়া নাম। এখন, মধ্যযুগের যে-ভাষা তা হচ্ছে পালি আর প্রাকৃত। বুদ্ধ-অশোকের আমলে পালির খুব প্রসার হয়েছিল। পরের যুগ প্রাকৃত ভাষার যুগ। পালি-প্রাকৃতের কাল শেষ হয়ে আসে যিশুখ্রিস্টের জন্মের হাজারখানেক বছরের মধ্যেই। ভারতের পূর্ব-অঞ্চলের যে-প্রাকৃত, এই সময় নাগাদ তা থেকে আমাদের বাংলাভাষার জন্ম। তবে পণ্ডিতেরা বলেন, প্রাকৃত থেকে সরাসরি বাংলার জন্ম হয়নি। পূর্বের প্রাকৃত ভেঙে অপভ্রংশ, তা-ই থেকে বাংলা। এই বাংলা তো মাত্র হাজার বছরের পুরোনো। তাই এ-ভাষা হচ্ছে নবীন ভারতীয় আর্যভাষা। বাংলার সাথে তেমনি আরো রয়েছে—হিন্দি, উর্দু, আসামী, উড়িয়া, বিহারী ইত্যাদি উপমহাদেশের আধুনিক ভাষাগুলি।

চর্যার কবিতা-গানের ভাষাকে বলেছি প্রাচীন বাংলা। তার পরেও তো বাংলাভাষার প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাস।

বারোশো খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মুসলমান তুর্কিরা বাইরে থেকে এসে তখনকার বাংলাদেশের ভেতরে দখল নেয়। তারপর প্রায় ছ'শো বছর ধরে চলে নবাব-সুলতানদের আমল। এ-আমলে বিশেষ করে নজর পড়েছে দেশী ভাষার চর্চায়। রাজা-বাদশা অবিশ্যি তাঁদের রাজকর্ম চালিয়েছেন তাঁদের নিজেদের ভাষায়। ওদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও সংস্কৃত ছাড়া বাংলাকে স্বীকারই করেননি। কিন্তু বাংলাভাষা আপন জোরে নিজে জায়গা করে নিয়েছে। কেননা, এ ভাষা যে সাধারণ অসংখ্য মানুষের প্রাণের ভাষা। তাই সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে, তার হাসি-কান্না নিয়ে, তার ধর্মসমাজ নিয়ে ছ'শো বছরে এক বিপুল বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আর আপন ভাষার জোরেই এ সাহিত্য জীবন্ত।

বাংলাভাষার যেটা নতুন যুগ তা এদেশে ইংরেজরা আসবার পর থেকে। তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য, তাদের শাসনব্যবস্থা দেশের অনেক কিছুই বদলে দিল। অন্যদিকে এইসাথে ইয়োরোপের নতুন হাওয়া এসে লাগে এদেশের মানুষের মনে।

ভাষা-সাহিত্য তো মানুষের জন্যেই। তাই দেশের মানুষের জীবনে আর মনে যখন পরিবর্তন, তখন ভাষায় আর সাহিত্যেও তার ঢেউ এসে লাগে।

এই নতুন যুগেই বাংলাভাষার সাহিত্যকে দুনিয়ার দরবারে পৌঁছে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলাভাষার আশ্চর্য ক্ষমতা আবিষ্কার করলেন নজরুল ইসলাম। তিনি লিখলেন বিদ্রোহের আগুন-ঝরানো গান।

আর আজ যে আমরা স্বাধীন হয়েছি তা তো বাংলাভাষার জন্যেই, আমাদের মায়ের ভাষা বাংলাকে নিয়েই।

কাঠবিড়াল কি উড়তে পারে?

কাঠবিড়াল এক অতিপরিচিত প্রাণী। এখানে-সেখানে পার্কে, গাছগাছালির কাছে—প্রায় সর্বত্রই ওদের দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর সকল দেশেই কাঠবিড়াল আছে। কাঠবিড়ালের প্রকারভেদ অনেক। ওদের কেউ-কেউ বিড়ালের মতো বড় হয়। আবার কোনো-কোনো কাঠবিড়ালের আকার হয় ইঁদুরের মতো। সাধারণত ওদেরকে দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—মাটিতে থাকা-কাঠবিড়াল (Ground squirrel) ও গাছে-থাকা কাঠবিড়াল (Tree squirrel)। এই দুটি প্রধান শ্রেণী বাদেও আর-একপ্রকার কাঠবিড়াল আছে। ঐ কাঠবিড়ালগুলি 'উড়ন্ত কাঠবিড়াল' (Flying Squirrel) বলে পরিচিত।

উড়ন্ত কাঠবিড়ালের প্যারাসুটের মতো পাতলা পরদা থাকে। ঐ পরদা ওদের দেহের উভয়পাশে, সামনে ও পিছনের অঙ্গের সাথে সংযুক্ত থাকে। যখন ওরা ওদের পা বিস্তৃত করে, তখন গ্লাইডারের (ইঞ্জিনবিহীন বিমান) ডানার মতো ঐ পরদা ঝাপটা খায় বা আন্দোলিত হয়। এর ফলে হাওয়ায় ওরা ভেসে চলতে পারে। হাওয়ায় ভেসে চলাকালে যদি পেঁচা বা অন্যকোনো শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয় তা হলে ওরা সঙ্গে সঙ্গেই আবার গাছে ফিরে আসে এবং গাছের গুঁড়িতে লুকিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করে।

আজ পর্যন্ত মানুষ প্রায় ৩৫ প্রজাতির উড়ন্ত কাঠবিড়ালের কথা জেনেছে। উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার কোনো-কোনো অংশে ওদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা ওদেরকে খুব কমই দেখতে পাই। তার কারণ, সাধারণত ওরা দিনের বেলায় ঘুমিয়ে কাটায়। ওদের গায়ে কোমল লোম থাকে। চোখদুটো হয় বেশ বড় বড়।

লেজ বাদে এদের দেহের দৈর্ঘ্য ৮ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার। গাছের উপরেই ওরা বাস করে এবং ফলমূল, সুপারি, পোকামাকড় ও উদ্ভিদ খেয়ে জীবনধারণ করে। অন্যদের মতো এরা নিচে আসে না। খুব কমই ওদেরকে মাটিতে আসতে দেখা যায়। উড়ন্ত কাঠবিড়ালেরা নিশাচর—অর্থাৎ ওরা রাতে ভালো দেখতে পায়। উড়ন্ত এই কাঠবিড়ালেরা হাওয়ায় ভেসে ৬০ মিটার (প্রায় ২০০ ফুট) পর্যন্ত চলতে পারে।

সৈয়দ মুজতবা আলী

বেঁচে থাকো সর্দিকাশি

ভয়ঙ্কর সর্দি হয়েছে। নাক দিয়ে যা জল বেরুচ্ছে তা সামলানো রুমালের কর্ম নয়। ডবল সাইজ বিছানার চাদর নিয়ে আগুনের কাছে বসেছি। হাঁচছি আর নাক ঝাড়ছি, নাক ঝাড়ছি আর হাঁচছি। বিছানার চাদরের অর্ধেকখানা হয়ে এসেছে, এখন বেছে-বেছে শুকনো জায়গা বের করতে হচ্ছে। শীতের দেশ, দোর-জানালা বন্ধ, কিচ্ছু খোলার উপায় নেই। জানালা খুললে মনে হয় গৌরীশঙ্করের চুড়োটি যেন হিমালয় ত্যাগ করে আমার ঘরে নাক গলাবার তালে আছেন।

জানি, একই রুমালে বারবার নাক ঝাড়লে সর্দি বেড়েই চলে, কিন্তু উপায় কী? দেশে হলে রকে বসে বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়তুম, এ-নোংরামির হাত থেকে রক্ষা তো পেতুমই। নাকটাও কাপড়ের ঘষায় ছড়ে যেত না। হঠাৎ মনে পড়ল পরশুদিন এক ডাক্তারের সঙ্গে অপেরাতে আলাপ হয়েছে। ডাকসাইটে ডাক্তার—ম্যুনিক শহরে নাম করতে পারাটা চাট্টিখানা কথা নয়। যদিও জানি ডাক্তার করবে কচু, কারণ জর্মন ভাষাতেই প্রবাদ আছে, 'ওষুধ খেলে সর্দি সারে সাত দিনে, না-খেলে এক সপ্তায়।'

তবু গেলুম তাঁর বাড়ি। আমার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কী। আমি শুধালুম, 'সর্দির ওষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা ব্যবস্থা করে

দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরুচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওডার। "ডাক্তার যদিও জর্মন তবু হাত দুখানি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন ফরাসিস কায়দায়। বললেন, "অবাক করলেন স্যার! সর্দির ওষুধ নেই? কত চান? সর্দির ওষুধ হয় হাজারো রকমের।"

বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খুললেন লালকেল্লার সদর-দরজা পরিমাণ এক আলমারি। চৌকো, গোল, কোমর-মোটা, পেট-ভারী বাহান্ন রকমের বোতল-শিশিতে ভরতি। নানা রঙের লেবেল আর সেগুলোর উপর লেখা রয়েছে বিকট-বিকট সব লাতিন নাম।

এবারে খানদানি ভিয়েনিজ কায়দায় কোমরে দু-ভাঁজ হয়ে বাও করে বাঁহাত পেটের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে তলোয়ার চালানোর কায়দায় দেরাজের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি দেখিয়ে বললেন, "বেছে নিন, মহারাজ (কথাটা জর্মন ভাষায় চালু আছে); সব সর্দির দাওয়াই।'

আমি সন্দিগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে তাকালুম। ডাক্তার মুখব্যাদান করে পরিতোষের ঈষৎ হাস্য দিয়ে গালের দুটি টোল খোলতাই করে দিয়েছেন—হাঁ-টা লেগে গিয়েছে দু-কানের ডগায়।

একটা ওষুধের কটমটে লাতিন নাম অতি কষ্টে উচ্চারণ করে বললুম, "এর মানে তো জানিনে।"

সদয় হাসি হেসে বললেন, "আমিও জানিনে, তবে এটুকু জানি, ঠাকুরমা-মার্কা কচু-ঘেঁচু-মেশানো দিশী দাওয়াই মাত্রেরই লম্বা-লম্বা লাতিন নাম হয়।"

আমি শুধালুম, "খেলে সর্দি সারে?"

বললেন, "গলায় একটু আরাম বোধ হয়, নাকের সুড়সুড়ি হয়তো একটু-আধটু কমে। আমি কখনো পরখ করে দেখিনি। সব পেটেন্ট ওষুধ—নমুনা হিসেবে বিনা-পয়সায় পাওয়া। তবে সর্দি সারে না, এ-কথা জানি।"

আমি শুধালুম, "তবে যে বললেন সর্দির ওষুধ আছে?"

বললেন, "এখনো বলছি আছে কিন্তু সর্দি সারে সে-কথা তো বলিনি।"

বুঝলুম, জর্মনি কান্ট হেগেলের দেশ। বললুম, "অ"।

ফিসফিস করে ডাক্তার বললেন, "আরেকটা তত্ত্বকথা এই বেলা শিখে নিন। যে-ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন, সে-ব্যামো ওষুধে সারে না।"

ততক্ষণে আবার আমি হাঁচ্ছো হাঁচ্ছো আরম্ভ করে দিয়েছি। নাক চোখ দিয়ে এবার রাইন-ওডার না, এবারে পদ্মা-মেঘনা। ডাক্তার ডজন-দুই কাগজের রুমাল আর একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ধাক্কাটা সামলে উঠে প্রাণভরে জর্মন সর্দিকে অভিসম্পাত দিলুম!

দেখি, ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছেন।

আমার মুখে হয়তো একটু বিরক্তি ফুটে উঠেছিল।

বললেন, "সর্দিকাশির গুণও আছে।"

আমি বললুম, "কচু, হাতি, ঘণ্টা!"

বললেন, 'তর্জমা করে বলুন।'

আমি বললুম, " 'কচুর' লাতিন নাম জানিনে; 'হাতি' হল 'এলেফান্ট' আর 'ঘণ্টা' মানে 'গ্লকে'।"

"মানে?"

"আর বুঝে দরকার নেই; এগুলো কটুবাক্য।"

আকাশ পানে হানি যুগলভুরু বললেন, "অদ্ভুত ভাষা। হাতি আর ঘণ্টা গালাগালি হয় কী করে! একটা গল্প শুনবেন? সঙ্গে গরম ব্র্যান্ডি?"

আমি বললুম, "প্রথমটাই চলুক। মিক্স করা ভালো নয়।"

ডাক্তার বললেন, "আমি ডাক্তারি শিখেছি বার্লিনে। বছর তিনেক প্র্যাকটিস করার পর একদিন গিয়েছি স্টেশনে, বন্ধুকে বিদেয় দিতে। ফেরার সময় স্টেশন-রেস্তরাঁয় ঢুকেছি একটা ব্র্যান্ডি খাব বলে!

"ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। দেখি, এককোণে এক অপরূপ সুন্দরী। অত্যন্ত শাদাসিধে বেশভূষা—গরিব বললেও চলে—আর তাই বোধহয় সৌন্দর্যটা পেয়েছে তার চরম খোলতাই। নর্থ সী দেখেছেন? তবে বুঝতেন হব-হব সন্ধ্যায় তার জল কীরকম নীল হয়—তারই মতো সুন্দরী চোখ। দক্ষিণ ইটালিতে কখনো গিয়েছেন? না? তবে বুঝতেন সেখানে সোনালি রোদে রুপালি প্রজাপতির কী রাগিণী। তারই মতো তাঁর ব্লন্ড চুল। ডানয়ুব নদী দেখেছেন? না? তাহলে আমার সব বর্ণনাই বৃথা।"

"না, থাক। ওরকম বেয়ারিং পোস্টের বর্ণনা দিতে আমার মন মানে না। আমরা ডাক্তার-বদ্যি মানুষ, ভাষা বাবদে মুখ্যুসুখ্য। অনেক মেহন্নত করে যে একটিমাত্র বর্ণনা কব্জায় এনেছি সেইটেও যদি না-বোঝেন তবে আমার শোকটা কোথায় রাখি বলুন তো।"

কাতর হয়ে বললুম, "নিরাশ করবেন না।"

"তবে চলুক ত্রিলেগেড রেস। ডানয়ুব নদীর শান্ত-প্রশান্ত ভাবখানা তাঁর মুখের উপর। অথচ জানেন, ডানয়ুব অগভীর নদী নয়। আর ডানয়ুবের উৎপত্তিস্থল দেখেছেন? না। তাহলে বুঝতেন সেখানে তন্বঙ্গী ডানয়ুব যেরকম লাজুক মেয়ের মতো এঁকেবেঁকে আপন শরীর ঢাকতে ব্যস্ত, এ-মেয়ের মুখে তেমনি ছড়ানো রয়েছে লজ্জার কেমন যেন একটা আঁকুবাঁকু ভাব।

"এই লজ্জাভাবটার উপরই আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, লজ্জা-শরম বলতে আমরা যা-কিছু বুঝি সেসব মধ্যযুগের পুরনো গল্প থেকে। বেয়াত্রিচে দান্তেকে

দেখে লাজুক হাসি হেসেছিলেন—আমরা তাই নিয়ে কল্পনার জাল বুনি। আজকের দিনে এসব তো আর বার্লিন শহরে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের নাইটদের শিভালরি গেছে আর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে মেয়েদের মুখ থেকে সব লজ্জা সব ব্রীড়া।

"কিন্তু আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই এখনো এই মধুর জিনিসটি দেখতে পাওয়া যায়, আর তার চেয়েও নিশ্চয়, আপনাদের দেশের লোক এখনো পশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে।

"তাই আপনি বিশ্বাস করবেন, কিন্তু আমি নিজে এখনো ঠিক করতে পারিনি কী করে যে আমার তখন মনে হল, এ-মেয়েকে না পেলে আমার চলবে না।

'হাসলেন না যে? তার থেকেই বুঝলুম, আপনি ওকিবহাল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন; কিন্তু জর্মনরা আমার এ-অবস্থার কথা শুনে হাসে। আর হাসবেই-বা না কেন? চেনা নেই, শোনা নেই, বিদ্যাবুদ্ধিতে মেয়েটা হয়তো অফিসবয়ের চেয়েও আকাট, হয়তো মাতালদের আড্ডায় বিয়ার বিক্রি করে পয়সা কামায়, কিম্বা এও তো হতে পারে যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এসব কোনোকিছুর তত্ত্ব-তালাশ না করে এক ঝটকায় মনস্থির করে ফেলা—এ-মেয়ে না হলে আমার চলবে না। আমি কি খামখেয়ালির চেঙ্গিসখান, না হাজারো প্রেমের ডন জুয়ান?

"ভাবছি আর মাথার চুল ছিঁড়ছি—কোন অজুহাতে কোন অছিলায় এঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।

'কিছুতেই কোনো হদিশ পাচ্ছিনে, আমাদের মাঝখানে তিনখানা মাত্র ছোট্ট টেবিলের যে উত্তাল সমুদ্র, সেটা পেরিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছই কী প্রকারে। প্রবাদ আছে, প্রেমে পড়লে বোকা নাকি বুদ্ধিমান হয়ে যায়—প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য তখন ফন্দি-ফিকির আর আবিষ্কার-কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায়; আর বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পড়লে হয়ে যায় একদম গবেট—এমন সব কাণ্ড তখন করে বসে যে দশজন তাজ্জব না-মেনে যায় না, এ-লোকটা এসব পাগলামি করছে কী করে!

"এ-জীবনে সেই সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে আমি বুদ্ধিমান। কারণ পূর্ণ একঘণ্টা ধরে ভেবেও আমি সামান্যতম কৌশল আবিষ্কার করতে পারলুম না, আলাপ করি কোন কায়দায়। কিন্তু এহেন হৃদয়াভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না। তখন বরঞ্চ বোকা বনতে পারলেই হয়তো কোনো একটা কৌশল বেরিয়ে যেত।

"ফ্রলাইন উঠে দাঁড়ালেন। কী আর করি! পিছু নিলুম। তিনি গিয়ে উঠলেন ম্যুনিকের গাড়িতে। আমিও ছুটে গিয়ে টিকিট কাটলুম ম্যুনিকের। কিন্তু এসে দেখি সে-কামরার আটটা সিটই ভরতি হয়ে গিয়েছে। আরো প্রমাণ হয়ে গেল, আমি বুদ্ধিমান, কারণ এ-কথা সবাই জানে, বুদ্ধিমানকে ভগবান সাহায্য করলে এ-পৃথিবীতে বোকাদের আর বাঁচতে হত না। আমি ভগবানের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলুম না।"

আমি বললুম, 'ভগবানকে দোষ দিচ্ছেন কেন? এ তো কন্দর্পঠাকুরের ডিপার্টমেন্ট।"

বললেন, "তাতেই-বা কী লাভ? তিনি তো অন্ধ। মেয়েটাকে বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরই মতো অন্ধ। এই-যে আমি একটা এতবড় আপলো, আমার দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকাল না। ওঁকে ডেকে হবে—"

আমি বললুম, "কচু, হাতি, ঘণ্টা।"

এবার ডাক্তার বাঙলা কটুকাটব্যের কদর বুঝলেন। বললেন, 'আহা-হা-হা।'

তারপর জর্মন উচ্চারণে বললেন, "কশু, হাটি, গণ্টা! খাসা গালাগাল।"

আমি বললুম, 'কামরাতে আটজনের সিট ছিল তো বয়েই গেল। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আপনি কোনো গতিকে ধাক্কাধাক্কি করে—"

বললেন, "তাজ্জব করলেন। একি আপনার ইন্ডিয়ান ট্রেন, না সাইবেরিয়াগামী প্রিজনার-ভ্যান।

চেকার পত্রপাঠ কামরা থেকে বের করে দেবে না?

"দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরের করিডরে ঠায়। দেখি, মেয়েটি যদি খানা-কামরায় যায়। স্টেশনে তো খেয়েছে শুধু কফি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল, কত লোক কত কামরা থেকে উঠল নামল কিন্তু আমার স্বর্গপুরী থেকে কোনো—(কটুকাব্য)—নামল না। সব ব্যাটা নিশ্চয়ই যাচ্ছে ম্যুনিক। আর কোথাও যেতে পারে না? ম্যুনিক কি পরিস্থান না ম্যুনিকের ফুটপাত সোনা দিয়ে গড়া? অবাক করলে এই ইডিয়টগুলো।

"প্রেমে পড়লে নাকি ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। একবেলার জন্য হয়তো পায়। আমি লাঞ্চ খাইনি, ওদিকে ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে—আমার পেটের ভিতর হুলুধ্বনি জেগে উঠেছে। এমন সময় মা মেরির করুণা হল। মেয়েটি চলল খানা-কামরার দিকে। আমিও চললুম ঠিক পিছনে-পিছনে। আহা, যদি একটা হোঁচট খেয়ে আমার উপর পড়ে যায়! দুত্তোর তারও উপায় নেই—উঁচু হিলের জুতো হলে গাড়ির কাঁপুনিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—এ পরেছে ক্রেপ-সোল।

"ঠিক পিছনে-পিছনে গিয়ে খানা-কামরায় ঢুকলুম। ওয়েটারটা ভাবলে স্বামী-স্ত্রী। না হলে তরুণ-তরুণী এরকম মুখ গুমসো করে খানা-কামরায় ঢুকবে কেন? বসাল নিয়ে একই টেবিলে—মুখোমুখি। হে মা মেরি, নত্রদাম গির্জেয় তোমার জন্য আমি একশোটা মোমবাতি মানত করলুম। দয়া করো মা, একটা-কিছু ফিকির বাতলাও আলাপ করবার।

"বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান, কোনো সন্দেহ নেই আমি বুদ্ধিমান। কোনো ফিকিরই জুটল না, অথচ মেয়েটি বসে আছে আমার থেকে দুহাত দূরে এবং মুখোমুখি। দুহাত না হয়ে দুলক্ষ যোজনও হতে পারত—কোনো ফারাক হত না।

"জানালা দিয়ে এক ঝটকা কয়লার গুঁড়ো এসে টেবিলের উপর পড়ল। মেয়েটি ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাতেই আমি ঝটিতি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে করে ফেললুম আরেক কাণ্ড। ঠাস করে জানালাটা বুড়ো আঙুলের উপর পড়ে সেটাকে দিল থেঁতলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত।

"মা মেরির অসীম দয়া কাণ্ডটা যে ঘটল। মেয়েটি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'দাঁড়ান আমি ব্যান্ডেজ নিয়ে আসছি।'

"আমি নিজে ডাক্তার, বিবেচনা করুন অবস্থাটা। রুমাল দিয়ে চেপে ধরলুম আঙুলটাকে। মেয়েটি ছুটে নিয়ে এল কামরা থেকে ফার্স্ট এডের ব্যান্ডেজ। তারপর আঙুলটার তদারকি করল শাস্ত্রসম্মত ডাক্তারি পদ্ধতিতে। বুঝলুম মেডিকেল কলেজে পড়ে। ঝানু ডাক্তার ফার্স্ট এডের ব্যান্ডেজ বয়ে বেড়ায় না, আর আনাড়ি লোক এরকম ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারে না।

আমি তো 'না, না', 'আপনি কেন মিছে', 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ', 'উহ, বড্ড লাগছে','এতেই হবে', 'ব্যস ব্যস' করেই যাচ্ছি, আর সেই লিলির মতো শাদা হাতের পরশ পাচ্ছি। সে কীরকম মখমলের হাত জানেন? বলছি; আপনি কখনো রাইন ল্যান্ড গিয়েছেন? না? থাক, ভুলেই গিয়েছিলুম, প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনাকে কোনো বর্ণনা দেব না।

"প্রথম পরশে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়, বলে না? বড় খাঁটি কথা। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার হাতে কোনোপ্রকারের স্পর্শকাতরতা থাকার কথা নয়, তবু আমার যে কী অবস্থাটা হয়েছিল আপনাকে সেটা বোঝাই কী করে? মেয়েটি বোধহয় টের পেয়েছিল, কারণ একবার চকিতের তরে ব্যান্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিল।

"তাতে ছিল বিস্ময়, প্রশ্ন এবং হয়তোবা একটুখানি, অতি সামান্য খুশির ঝিলিমিলি। তবে কি আমার হাতের স্পর্শ—? কোন সাহসে এ-বিশ্বাস মনের কোণে ঠাঁই দিই, বলুন।"

আমি গুনগুন করে বললুম :

"জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম হায় রে।"

ডাক্তার বললেন, "খাসা মেলডি তো। মানেটাও বলুন।"

বললুম, "আফটার ইউ। আপনি গল্পটা শেষ করুন।"

বললেন, "গল্প নয়, স্যার, জীবন-মরণের কথা হচ্ছে।"

আমি শুধালুম, "কেন, সেপ্টিকের ভয় ছিল নাকি?"

রাগের ভাব করে বললেন, "ইয়োরোপে এসে আপনার কি সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে? আমাকে হেনেছে প্রেমের বাণ আর আপনি বলছেন অ্যান্টিসেপ্টিক আন।"

আমি বললুম, "অপরাধ নেবেন না।"

বললেন, "তারপর আমি সুযোগ পেয়ে আরম্ভ করলুম নানারকমের কথা কইতে। গোল গোল। আমি যে পরিচয় করার জন্য জান-কবুল সেটা ঢেকে চেপে। সঙ্গে-সঙ্গে কখনো নুনটা এগিয়ে দি, কখনো ক্রুয়েটটা সরিয়ে নি, কখনোবা বলি, 'মাছটা খাসা ভেজেছে, আপনি একটা খান না; ওহে খানসামা এদিকে—' ইত্যাদি।

"করে করে সুন্দরীর মনটা একটু মোলায়েম করতে পেরেছি বলে মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল।

"মেয়েটি লাজুক বটে কিন্তু ভারি ভদ্র। আমার ভ্যাজর-ভ্যাজর কান পেতে শুনল, দু-একবার ব্লাশ করল। সে যা গোলাপি—আপনি কখনো, না, থাক।

"কিন্তু খেল মাত্র একটি অমলেট আর দু-স্লাইস রুটি। নিশ্চয়ই গরিব। ক্ষীণ আশাটার গায়ে একটু গত্তি লাগল।"

এমন সময় ডাক্তারের অ্যাসিস্টান্ট এসে জানালো রোগী এসেছে। ডাক্তার বললেন, "এখখুনি আসছি।"

ফিরে এসে কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন, "ম্যুনিকে নাবলুম এক বস্ত্রে। এমন ভান করে কেটে পড়লুম যাতে মেয়েটি মনে করে আমি ভ্যান থেকে মাল নামাতে গেলুম। যখন 'গুডবাই' বলে হাত বাড়ালুম তখন সে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। প্রেমে পড়লে নাকি মানুষের পাখা গজায়—হবেও বা, কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি মানুষ তখন চোখেমুখে এমন সব নতুন ভাষা পড়তে পারে যার জন্য কোনো শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হয় না। তবে সে পড়াতে ভুল থাকে বিস্তর, কাকতালীয় এন্তার।

"আমি দেখলুম, লেখা রয়েছে 'বিপদ' কিন্তু পড়লুম, 'এই কি শেষ?' "

আমিও অবাক হয়ে শুধালুম, "বার্লিন থেকে ম্যুনিক অবধি হামলা করে স্টেশনে খেই ছেড়ে দিলেন?"

ডাক্তার বাঁকা হাসি হেসে বললেন, "আদপেই না। কিন্তু কী আর দরকার পিছু নিয়ে? মেডিকেল কলেজে পড়ে, ওতেই ব্যস।

"সেদিনই গেলুম মেডিকেল কলেজের রেস্তরাঁয়। লাঞ্চ খেতে নিশ্চয়ই আসবে। এবারে মেয়েটি আর লজ্জা দিয়ে মনের ভাব ঢাকতে পারল না। আমাকে দেখামাত্র আপন অজানাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত মুখে যে খুশি ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না, ভগবান মাঝে-মাঝে বুদ্ধিমানকেও সাহায্য করেন।

"ততক্ষণে মেয়েটি তার আপনহারা আবরণটাকে সামলে নিয়েছে—লজ্জা এসে আবার সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলেছে।'

ডাক্তার খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, "এখানেই যদি শেষ করা যেত তবে মন্দ হত না কিন্তু সর্দিকাশির তো তাহলে কোনো হিল্লে হয় না। তাই কমিয়ে-কমিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দি।"

আমি বললুম, "কমাবেন না। তালটা একটু দ্রুত করে দিন। আমাদের দেশের ওস্তাদরা প্রথম খানিকটে গান করেন বিলম্বিত একতালে, শেষে করেন দ্রুত তেতালে।"

ডাক্তার বললেন, "দুঃখিনী মেয়ে, বাপ-মা নেই। এক খাণ্ডার পিসির বাড়িতে মানুষ হয়েছে। দুমুঠো খেতে দেয়, ব্যস। কলেজের ফিসটি পর্যন্ত বেচারি জোগাড় করে মাস্টারি করে।

"তাতে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু আমার ঘোরতর আপত্তি এভাকে বুড়ি এমনি নজরবন্ধ করে রেখেছে যে, চকিতা হরিণীর মতো সমস্তক্ষণ সে শুধু ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়, ঐ বুঝি পিসি দেখে ফেললে, সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইছে। আমি তো বিদ্রোহ করে বললুম, 'এ কি বুখারার হারেম, না তুর্কি পাশার জেনানা? এ-অত্যাচার আমি কিছুতেই সইব না।' এভা শুধু আমার হাত ধরে বলে, 'প্লিজ, প্লিজ, তুমি একটু বরদাস্ত করে নাও; আমি তোমাকে হারাতে চাইনে।' এর বেশি সে কখখনো কিছু বলেনি।

'এই মোকামে পৌঁছতে আমার লেগেছিল ঝাড়া একটি মাস। বিবেচনা করুন।

"সাতদিন লেগেছিল প্রেম নিবেদন করতে। পনেরো দিন লেগেছিল হাতখানি ছুঁতে। তারো এক সপ্তাহ পরে সে আমায় বললে কেন সে এমন ভয়ে-ভয়ে ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়।

"থিয়েটার সিনেমা মাথায় থাকুক, আমার সঙ্গে রাস্তায় পর্যন্ত বেরুতে রাজি হয় না—পাছে পিসি দেখে ফেলে। আমি একদিন থাকতে না-পেরে বললুম, তোমার পিসির কুইনটুপ্লেট আছে নাকি যে তারা ম্যুনিকের সব স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তোমার উপর নজর রাখছে? উত্তরে শুধু কাতরস্বরে বলে, 'প্লিজ, প্লিজ।'

"যা-কিছু আলাপপরিচয়, ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা সব ঐ কলেজ-রেস্তরাঁয় বসে। সেখানে ভিড় সার্ডিন-টিনের ভিতর মাছের মতো। চেয়ারে-চেয়ারে ঠাসাঠাসি কিন্তু হাতে যে হাতখানা রাখব তারও উপায় নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে।"

আমি বললুম :

"সমুখে রয়েছে সুধা পারাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।"

ডাক্তার বললেন, "মানে বলুন।"

আমি বললুম, "আপ যাইয়ে, পরে বলব।"

ডাক্তার বললেন, "সেই ভিড়ের মাঝখানে, কিম্বা করিডরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আলাপচারী। করিডরে কথা কওয়া যায় প্রাণ খুলে, কিন্তু তবু আমি রেস্তরাঁর ভিড়ই পছন্দ করতুম বেশি। কারণ দৈবাৎ, ক্বচিৎ কখনো এভা তার ছোট্ট জুতোটি দিয়ে আমার পায়ের উপর দিত চাপ। তার মাধুর্য আপনাকে কী করে বোঝাই? এভাকে পরে নিবিড়তর করে চিনেছি। কিন্তু সেই পায়ের চাপ যে আমাকে কত কথা বলেছে, কত আশ্বাস দিয়েছে সেটা কী করে বোঝাই? হয়তো তার চেনা কোনো-এক ছোকরা স্টুডেন্ট এসে হাসিমুখে তাকে দুটি কথা বললে। অত্যন্ত হার্মলেস, আমি কিন্তু হিংসেয় জরজর। টেবিলের উপর রাখা আমার হাতদুটো কাঁপতে আরম্ভ করছে! আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিনে—

"এমন সময় সেই পায়ের মৃদু চাপ। সব সংশয়ের অবসান, সব দুঃখ অন্তর্ধান।"

ডাক্তার বললেন, 'তাই আমার দুঃখ আর বেদনার অবধি রইল না। এই বিরাট ম্যুনিক শহরে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিভৃতে মনের ভার নামাচ্ছে, নিষ্ঠুর সংসারে লড়বার শক্তি একে অন্যের সঙ্গসুখ স্পর্শসুখ থেকে আহরণ করে নিচ্ছে, আর আমি তারই মাঝখানে এমন কিছু করে উঠতে পারছিনে, যাতে করে এভাকে অন্তত একবারের মতো কাছে টেনে আনতে পারি।

"শেষটায় আর সইতে না পেরে একদিন এভাকে কিছু না-বলে ফিরে গেলুম বার্লিনে। সেখান থেকে লিখে জানালুম, 'ওরকম কাছে থেকে না-পাওয়ার দুঃখ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—আমার নার্ভস একদম গেছে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা আমার কিছুতেই হয়ে উঠত না—তোমার মুখের কাতর ছবি আমার চলে আসার সব শক্তি নষ্ট করে ফেলত।'"

আমি বললুম, "আপনি তো দারুণ লোক মশাই! তবে হ্যাঁ, আপনাদের নীটশেই বলেছেন, কড়া না হলে প্রেম মেলে না।"

ডাক্তার বললেন, "ঠিক উলটো। কড়া হতে পারলে আমি ম্যুনিক থেকে পালাতুম না। পলায়ন জিনিসটা কি বীরের লক্ষণ? তা সে-কথা থাক।

'উত্তর পেলুম সঙ্গে-সঙ্গেই। সে-চিঠিটা আমি এতবার পড়েছি যে তার ফুলস্টপ, কমা পর্যন্ত আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে! এবং তার চেয়েও বড় কথা, সে-চিঠিটির বক্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকল।

"আপনাদের দেশে অবিশ্বাস্য বলে কোনো জিনিস নেই—ভিখিরিকে মাথায় তুলে নিয়ে আপনাদের দেশে হাতি হামেশাই রাজা বানায়। কিন্তু জর্মনিতে তো সেরকম ঐতিহ্য নেই। চিঠিতে লেখা ছিল :

> 'বেশি লিখব না—আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থির করেছি, তোমার ইচ্ছামতো তোমায় আমায় একবার নিভৃতে দেখা হবে। তারপর বিদায়। যতদিন পিসি আছে ততদিন আমি আর কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আসছে বুধবার দিন আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাতে অপেক্ষা কোরো। আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসব।'"

ডাক্তার বললেন, "বিশ্বাস হয় আপনার? যে-মেয়ে পিসির ভয়ে আমার সঙ্গে কলেজ-রেস্তরাঁর বাইরে পর্যন্ত যেতে রাজি হত না, সে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আপন ঘরে?"

আমি বললুম, "পীরিতি-সায়রে ডোবার পূর্বে যে রাধা সাপের ছবি মাত্র দেখেই অজ্ঞান হতেন সেই রাধাই অভিসারে যাওয়ার সময় আপন হাত দিয়ে পথের পাশের সাপের ফণা চেপে ধরেছেন পাছে সাপের মাথার মণির আলোকে কেউ তাঁকে দেখে ফেলে।'

ডাক্তার বললেন, "তা-ই বটে, তবে কিনা আমি রাধার প্রেমকাহিনী কখনো পড়িনি। সে-কথা থাক।

'আমি ম্যুনিক পৌঁছলুম বুধবার দিন সন্ধের দিকে। কয়লার গুঁড়োয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল বলে ঢুকলুম একটা পাবলিক বাথে স্নান করতে। টাবে বসে সর্বশরীর ডলাই-মলাই করে আর গরম জলে সেদ্ধ হয়ে চিংড়িটার মতো লাল হয়ে যখন বেরুলুম তখন হাতে আর বেশি সময় নেই। অথচ টাব থেকে ওরকম হুট করে ঠাণ্ডায় বেরুলে যে সঙ্গে-সঙ্গে ঝপ করে সর্দি হয় সে-কথাও জানি। চানটা না-করলেও যে হত সে-তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম রাস্তায় বেরিয়ে। কিন্তু তখন আর আফসোস করে কোনো ফায়দা নেই। সেই ডিসেম্বরের শীতে চললুম এবার বাড়ির দিকে—মা মেরির উপর ভরসা করে, যে, এ-যাত্রায় সর্দিটা নাও হতে পারে।"

আমি বললুম, "আমরা বাঙলায় বলি, 'দুগগা বলে ঝুলে পড়লুম'।"

ডাক্তার বললেন, "সাড়ে এগারোটার সময় গিয়ে দাঁড়ালুম এভার বাড়ির সামনের রাস্তায়। টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নিচে—আপনাদের পাগলা ফারেনহাইটের হিসেবে বত্রিশের ঢের নিচে। রাস্তায় একফুট বরফ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর আমার চতুর্দিকে যে হিম ঘনাতে লাগল তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে পারি আমাকে যেন কেউ বিরাট ফ্রিজিডেরের ভিতর তালাবন্ধ করে রেখে দিল।

"তিন মিনিট যেতে-না-যেতে নামল মুষলধারে—বৃষ্টি নয়—সর্দি। সঙ্গে-সঙ্গে ডাইনামাইট ফাটার হাঁচি—হাঁচ্চো, হাঁচ্চো, হাঁচ্চো। আপনার আজকের সর্দি তার তুলনায় নস্যি, অর্থাৎ নস্যির খোঁচায় নামানো আড়াই ফোঁটা জল। হাঁচি আর জল, জল আর হাঁচি।

"কী করি, কী করি ভাবছি, এমন সময় এভা এসে নিঃশব্দে হাত ধরল—বরফের গুঁড়োর উপর পায়ের শব্দ শোনা যায় না। তার উপর সে পরেছে সেই ক্রেপ-সোলের জুতো—বেচারির মাত্র ঐ একজোড়াই সম্বল।

"কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে, করিডরের খানিকটা পেরিয়েই তার কামরা। নিঃশব্দে আমাকে সে ঢুকিয়ে দরজায় খিল দিয়ে মাথা নিচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

"এভার গোলাপি মুখ ডাচ পনিরের মতো হলদে, টুকটুকে লাল ঠোঁটদুটি ব্লু ডানয়ুবের মতো ঘন বেগুনি নীল—ভয়ে, উত্তেজনায়।

"আর সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল আবার আমার সেই ডাইনামাইট-ফাটানো হাঁচ্চো, হাঁচ্চো।

"এভা আমাকে ধরে নিয়ে আমার মাথা গুঁজে দিল বিছানায়। মাথার উপর চাপাল বালিশ আর সব ক'খানা লেপ-কম্বল। বুঝতে পারলুম কেন, পাশের ঘরে পিসি যদি শুনতে পান তবেই হয়েছে।

"আমি প্রাণপণ হাঁচি চাপবার চেষ্টা করছি আর লেপ-কম্বলের ভিতর বম-সেল ফাটাচ্ছি।

"কতকক্ষণ এরকম কেটেছিল বলতে পারব না। হাঁচির শব্দ কিছুতেই থামছে না। এভা শুধু কম্বল চাপাচ্ছে। আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম কিন্তু নিবিড় পুলকে বারবার আমার সর্বশরীর পুলকিত হচ্ছে—এভার হাতের চাপ পেয়ে।

"এমন সময় দরজায় ধাক্কা আর নারীকণ্ঠের তীব্র চিৎকার, 'দরজা খোল।'

"'পিসি!'

"আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি লেপের ভিতর থেকে বেরলুম। এভা ভয়ে ভিরমি গিয়েছে, খাটের উপর নেতিয়ে পড়েছে।

"আমি দরজা খুলে দিলুম। সাক্ষাৎ শকুনির মতো বীভৎস এক বুড়ি ঘরে ঢুকে আমার দিকে না-তাকিয়েই এভাকে বলল, 'কাল সকালেই তুই এ-বাড়ি ছাড়বি।'

"সঙ্গে-সঙ্গে আর কীসব বকুনি দিয়েছিল—'ঘেন্না, কেলেঙ্কারি', 'শোবার ঘরে পরপুরুষ', 'রাস্তার মেয়ের ব্যাভার' এইসব, সে আমার আর মনে নেই। বুড়ি আমার দিকে তাকায় না, গালের উপর গাল চড়ছে যেন ছ-গজি পিয়ানোর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি কেউ আঙুল চালাচ্ছে।

"আমি আর থাকতে পারলুম না। বুড়ির দুই বাহু দু-হাত দিয়ে চেপে বললুম,

"'আমার নাম পেটার সেলবাখ। বার্লিনে ডাক্তারি করি! ভদ্রঘরের ছেলে। আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই।'"

ডাক্তার বললেন, "মা মেরি সাক্ষী, আমি এভাকে বিয়ে করার প্রস্তাব এতদিন করিনি পাছে সে 'না' বলে বসে। আমি অপেক্ষা করছিলুম পরিচয়টা ঘনাবার জন্য। বিয়ের প্রস্তাবটা আমার মুখ দিয়ে যে তখন কী করে বেরিয়ে গেল আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

"পিসি আমার দিকে হাবার মতো তাকাল এক বিঘত চওড়া হাঁ করে। পাকা দু-মিনিট লেগেছিল ব্যাপারটা তার বুঝতে! তারপর ফুটে উঠল মুখের উপর খুশির পয়লা ঝলক। সেটা দেখতে আরো বীভৎস। মুখের কুঁচকানো এবড়োখেবড়ো গাল, ভাঙাচোরা নাক-মুখ-ঠোঁট যেন আরো বিকৃত হয়ে গেল।

"আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল করিডরের দিকে। চিৎকার করে কাকে যেন ডাকছে।

"এভা তখনো অচৈতন্য।

"বুড়ি ফিরে এল বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে। তার চেহারার খুশির পিছনে দেখলুম সেই ভীতভাব—এভার মুখে যেটা অষ্টপ্রহর লেপা থাকে। বুঝলুম, পিসির দাপটে এ-বাড়ির সকলেরই কণ্ঠশ্বাস। মনে হল বুড়ো খুশি হয়েছে, এভা যে এ-বাড়ির অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার জন্য। হায়, তার তো নিষ্কৃতি নেই।"

ডাক্তার বললেন, 'সেই দুপুররাতে ওয়াইন এল, শ্যাম্পেন এল। হোটেল থেকে সসেজ কটলেট এল। হৈ হৈ রৈ রৈ। এভা সম্বিতে ফিরেছে। বুড়ো শ্যাম্পেন টানছে জলের মতো। বুড়ি এক গেলাশেই টং। আমাকে জড়িয়ে শুধু কাঁদে আর এভার বাপের কথা স্মরণ করে বলে, ভাই বেঁচে থাকলে আজ সে কী খুশিটাই-না হত।

"আর এভা? আমাকে একবার শুধু কানে-কানে বলল, 'জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার উপর একটু নজর রেখো।'"

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আস্তে-আস্তে দরজা খুলে ঢুকলেন এক সুন্দরী—হাঁ, সুন্দরী বটে!

এক লহমায় আমি নর্থ সী-র ঘন নীল জল, দক্ষিণ ইটালির সোনালি রোদে রুপালি প্রজাপতি, ডানয়ুবের শান্ত প্রশান্ত ছবি, সেই ডানয়ুবেরই লজ্জাশীল দেহচ্ছন্দ, রাইল্যান্ডের শ্যামলিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল সবকিছুই দেখতে পেলুম।

আর সে কী লাজুক হাসি হেসে আমার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন। আমি মাথা নিচু করে ফরাসিস কায়দায় তাঁর চম্পক করঙ্গুলিপ্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে মনে-মনে বললুম :

"বেঁচে থাকো সর্দি-কাশি
চিরজীবী হয়ে তুমি।"

আব্রাহাম লিঙ্কন

আমেরিকার বিশাল ভূভাগ অনাদিকালের অরণ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই অরণ্য পরিষ্কার করে, আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের প্রায় সকলেই কৃষিকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। জঙ্গল কেটে মাঝে মাঝে বসেছে গ্রাম। অরণ্যের ক্রোড়দেশে এইরকম একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বা পল্লির মধ্যে একটি সামান্য পরিবারে লিঙ্কনের জন্ম হয়। প্রায় দশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন একেবারেই নিরক্ষর, নিজের নামটি পর্যন্ত বানান করে পড়তে পারতেন না। সেই গ্রামের সমস্ত ঘরবাড়িই ছিল কাঠের। জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে যেসব বিশাল গাছ কাটা হত তারই গুঁড়ি দিয়ে তৈরি করা হত এইসব বাড়ির দেওয়াল। সেসব কাঠের ঘরে কোনো জানালা থাকত না। এইরকম একটি সামান্য কাঠের ঘরে যিনি তাঁর বাল্য ও শৈশব অতিক্রম করে স্বীয় প্রতিভাবলে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ও রাষ্ট্রপতির জন্য নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক 'হোয়াইট হাউস' বাসভবনে বাস করেছিলেন তিনিই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে আব্রাহাম লিঙ্কন নামে খ্যাত। এজন্য তাঁর সম্পর্কে "From Log Cabin to White House"—এই বিখ্যাত উক্তিটি প্রচলিত আছে এবং এই একটিমাত্র কথার মধ্যে তাঁর সমগ্র জীবনেতিহাস যেন অতি সুন্দরভাবে আভাসিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব তাঁর এই উন্নতি-শিখরে আরোহণের কাহিনীর মধ্যে নয়। স্বদেশের জন্য ও পৃথিবীর মানুষের জন্য তিনি যা করে গিয়েছেন, লিঙ্কনের শ্রেষ্ঠত্ব তারই মধ্যে খুঁজতে হবে।

১৮৩০ সন থেকেই দাসপ্রথাকে উপলক্ষ করে আমেরিকায় আঞ্চলিক সংঘাত তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। ঐসময়েই শুরু হয় দাসত্ব-নিরোধ আন্দোলন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ যখন শেষ হয় তখনো

পর্যন্ত আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা মনে করত যে, এই দাসপ্রথা তারা লাভ করেছে উত্তরাধিকারসূত্রে; সুতরাং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অন্যান্য চিরাচরিত ঐতিহ্যের মতো এর জন্যেও তাদের দায়ী করা যায় না।

১৮৪০ সন থেকেই আমেরিকার রাজনীতিতে দাসপ্রথাই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিতে এই প্রথার ছিল গভীর প্রভাব। সম্ভবত এই কারণেই অনেকেই ছিলেন এই প্রথার উগ্র সমর্থক। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে ছিল মজুরি প্রথা। দক্ষিণীদের অভিমত এই ছিল যে, মজুরি প্রথার চেয়ে দাসপ্রথা অনেক বেশি মানবিক। কিন্তু ১৮৩০ সনের পরে দুশো বছরে এই প্রথার একটা স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। সে-সময় আমেরিকায় গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ দেখা দিতে শুরু করেছে এবং ক্রমেই তা গতিবেগ অর্জন করছে। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি সুবিচার করার জন্য যে-প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল সে-সময় তারই ফলে ঘটেছিল এই দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হ্যারিয়েট বিচার স্টো প্রণীত 'আঙ্কল টমস কেবিন' উপন্যাসখানি দাসপ্রথার অবিচার ও নিষ্ঠুরতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে এই আন্দোলনকে প্রবলতর করে তুলেছিল।

এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের পটভূমিকায় দেখতে হবে আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনকে। তখন হুইডা পার্টির পরিবর্তে দেখা দিয়েছে রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি শক্তিশালী সংগঠন। ১৮৫০ সনের নির্বাচনে এই দলের পরাজয় ঘটলেও উত্তরাঞ্চলে ঐ নতুন দলের প্রতিষ্ঠা খুবই সুদৃঢ় হয়। চেজ ও উইলিয়াম সিওয়ার্ডের মতো দাসপ্রথাহীন অঞ্চলের নেতৃবর্গ অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। এদেরই সঙ্গে দেখা দেন একজন দীর্ঘাকৃতি কৃশকায় ইলিনয়বাসী আইনব্যবসায়ী। এঁরই নাম আব্রাহাম লিঙ্কন। এই মহাপুরুষের শৈশব ও বাল্যজীবনের কাহিনী বড় বেদনাদায়ক। নয় বছর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন। তাঁর পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। নতুন মা এসে বালক আব্রাহামের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন। অনুকূল পরিবেশে তিনি যত্নের সঙ্গে বিদ্যা অর্জন করতে থাকেন। তিনি রাত জেগে অঙ্ক করতেন। কোদালের ফাল ছিল তাঁর শ্লেট, তার উপর চক খড়ি দিয়ে লিখতেন।

ষোলো বছর বয়সে লিঙ্কন জীবিকা অর্জনে বের হন। প্রথমে তিনি খেয়ানৌকার কাজ নেন। তাঁর মনিবের কতকগুলো পুস্তক ছিল। এই পুস্তকগুলো যখন তাঁর পড়া হয়ে গেল, তখন লিঙ্কন সে-কাজ ছেড়ে দিলেন। আস্তাবলে, কসাইখানায়, প্রতিবেশীর খামারে, গ্রামে মুদির দোকানে—কত জায়গায়ই যে তিনি কতরকমের কাজ করেছিলেন তার হিসেব নেই।

একুশ বছর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। দুই বছর পিতার সঙ্গে জরিপের কাজে নিযুক্ত থেকে একজনের পরামর্শে আইন পড়তে শুরু করেন। আটাশ বছর বয়সেই তিনি আইনব্যাবসা আরম্ভ করেন। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজ চেষ্টা, চরিত্র ও বুদ্ধির বলে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। তিনি এত সৎ ছিলেন যে কোনো মিথ্যা মোকদ্দমার জন্য তিনি নিযুক্ত হচ্ছেন বুঝতে পারলে, তখনই ওকালতনামা ছুড়ে ফেলে দিতেন। এরপর তাঁকে আমরা স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নির্বাচিত হতে দেখতে পাই। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসেবে তাঁর যুক্তিশক্তি ও নীতিনিষ্ঠা দেখে সবাই বিস্মিত হত।

এইভাবে দেশের ও দশের প্রতিনিধি হতে হতে কালক্রমে তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রায় অপরিচিতই ছিলেন। মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের অন্য শত শত আইনজীবী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাঁর কোনো পার্থক্য ছিল না। দাসপ্রথাকে তিনি বহু আগে থেকেই অন্যায় বলে মনে করতেন। ইলিনয়ের পিওরিয়াতে ১৮৫৪ সনে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, জাতীয় অঞ্চলগুলো এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত যাতে এগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-রচয়িতাগণ কর্তৃক গৃহীত নীতির

সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সে-নীতি হচ্ছে সামাজিক প্রথা হিসেবে দাসত্বকে সীমাবদ্ধ করে রাখা এবং শেষ পর্যন্ত বর্জন করা।

এই বক্তৃতার ফলে লিঙ্কন ক্রমবর্ধিষ্ণু পশ্চিমাঞ্চলের সর্বত্র সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। চার বছর পরে সিনেটর নির্বাচনে তিনি ইলিনয় থেকে স্টিফেন ডাগলাসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান। তাঁর নির্বাচনী প্রচারের প্রথম বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তিনি ১৮৫৮ সনের ১৭ জুন। এই উদ্বোধনী ভাষণের গোড়াতেই তিনি আমেরিকার ইতিহাসের পরবর্তী সাত বছরের মূলনীতিটিকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"আত্মদ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন পরিবার দাঁড়াতে পারে না। আমি চাই না যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে পড়ুক, আমি চাই না এই পরিবার ধ্বংস হোক, তবে আমি বিশ্বাস করি এই জাতি অর্ধ-দাস ও অর্ধ-মুক্ত অবস্থায় চিরকাল টিকে থাকতে পারে না। আমি চাই যে, পরিবার থেকে বিভেদ বিচ্ছেদ লুপ্ত হয়ে যাক।"

এই নির্বাচনের ফলে লিঙ্কন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন একজন জাতীয় নেতা হিসেবে। অচিরকালের মধ্যে দাসপ্রথা-বিরোধী ও তাঁর সমর্থকদের সংঘাত আবার তীব্র হয়ে উঠল। ১৮৬০ সনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় উত্তর ও দক্ষিণের বিভেদ একটা রাজনৈতিক আকার গ্রহণ করল। রিপাবলিকান দল মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা আব্রাহাম লিঙ্কনের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য সুপারিশ করল এবং ১৮৬১ সনের ৪ মার্চ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করলেন। তাঁর নির্বাচনের পরেই আমেরিকায় যে-ঘোরতর রাষ্ট্রবিপর্যয় দেখা দিয়েছিল সে-ইতিহাস সুপরিচিত এবং এরই পরিণতি ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ১৮৬৩ সনের শুরুতেই যুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের বিপর্যয় ঘটতে লাগল। কিন্তু ঐ বছর ১ জানুয়ারি তারিখে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। ঐদিন রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন

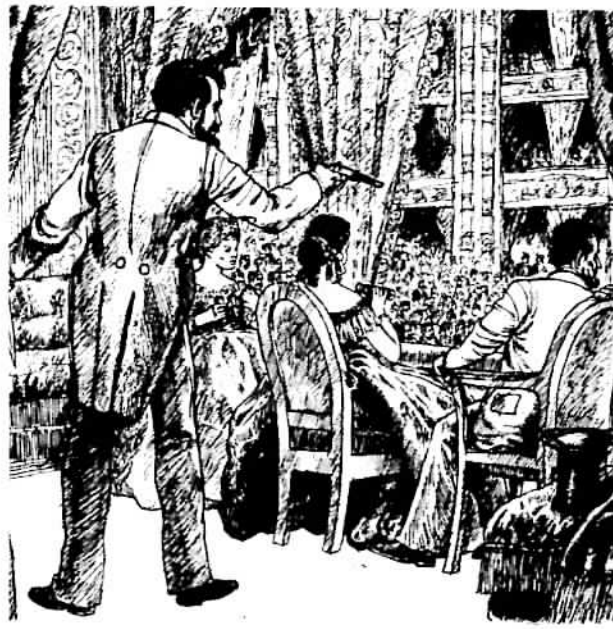

Emancipation Proclamation বা দাসমুক্তি ঘোষণা জারি করে ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘোষণা করলেন। দাসত্বপ্রথাকে চিরতরে নির্মূল করার আদর্শ ঘোষিত হল বটে, কিন্তু সংগ্রাম থামল না।

এই যুদ্ধ চলবার সময় জাতি বুঝতে পারল যে, লিঙ্কনের প্রজ্ঞা কত গভীর এবং তা কী পরিমাণ সতর্ক বিবেচনা ও গভীর চিন্তাশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রকৃত ব্যক্তিত্ব যে কত বিরাট সেটা এতদিনে সকলে উপলব্ধি করতে পারল। সত্যের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল গভীর, তাঁর ধৈর্য ছিল অপরিসীম এবং তাঁর চরিত্রের উদারতা ছিল বিরাট। পররাষ্ট্রীয় নীতিতেও তাঁর আত্মমর্যাদা, মনোবল ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেল। ক্ষমতার সঙ্গে কৌশলের সমন্বয় ঘটাতে তিনি ছিলেন দক্ষ। সর্বোপরি, বলপ্রয়োগ কিংবা উৎপীড়নের মাধ্যমে নয়, আন্তরিকতা ও ঔদার্যের ভিত্তিতে সমগ্র দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সুসংহত করে রাখতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী। এইসব বিবিধ কারণে তিনি জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করেছিলেন। তাই তারা রাষ্ট্রপতির পদে তাঁকে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত করল ১৮৬৪ সনে।

লিঙ্কন দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হওয়ার পর (৪ মার্চ, ১৮৬৫) তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণের উপসংহারে বলেছিলেন—"কারো প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করে, সকলের প্রতি উদারতার ভাব নিয়ে এবং ঈশ্বর আমাদের যে-ন্যায়দৃষ্টির অধিকারী করেছেন সে-অনুযায়ী দৃঢ় ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে যে-কাজে আমরা ব্রতী হয়েছি তাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে হবে, আমাদের জাতির ক্ষতস্থানকে নিরাময় করে তুলতে হবে, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি যে বহন করেছে তার জন্য, তার বিধবাদের জন্য এবং তার পিতৃহীন শিশুদের জন্য। ...স্বদেশে আমরা সকলের সঙ্গে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী শান্তিরক্ষার জন্য যা-কিছু করণীয় সবই করতে কৃতসংকল্প।"

তিন সপ্তাহ পরে দক্ষিণের বিদ্রোহ শান্ত হল, বিদ্রোহী জেনারেল লি আত্মসমর্পণ করলেন। ১৪ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট তাঁর মন্ত্রিসভার বৈঠকে শেষবারের জন্য যোগ দিলেন। তিনি তাঁর সচিববর্গকে অনুরোধ জানালেন যে, তাঁরা যেন রক্তপাত ও প্রতিশোধ গ্রহণের দিক থেকে তাঁদের চিন্তাধারাকে ফিরিয়ে নেন শান্তির দিকে।

সেই রাত্রেই লিঙ্কন যখন একটি প্রেক্ষাগৃহে বসে অভিনয় দেখছিলেন তখন একটি অর্ধোন্মাদ ব্যক্তির পিস্তলের গুলির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন।

লিঙ্কনের মৃত্যুর পরে কবি জেমস রাসেল লাওয়েল লিখেছিলেন—"যাঁকে কোনোদিন তারা দেখেনি সেইরকম একজন মানুষের আকস্মিক মৃত্যুতে সেই হতচকিত এপ্রিলের সকালে অসংখ্য মানুষ যেমনভাবে অশ্রুবর্ষণ করেছে—এমন আর কখনোই করেনি। যেন ঐ ব্যক্তিটির মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের জীবন থেকে চলে গেছে একজন হিতৈষী বন্ধুর উপস্থিতি এবং তাদের জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। সেদিন অপরিচিত লোকের দৃষ্টিবিনিময়ের মধ্য দিয়ে খবরে সমবেদনার যে-বাণী ধ্বনিত হয়েছে শ্রদ্ধানিবেদনের যে-কোনো বক্তৃতার চেয়ে তা বেশি হৃদয়স্পর্শী। সমগ্র মানবসমাজ সেদিন যেন এক পরমাত্মীয়কে হারিয়েছিল।"

মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানবহিতৈষীদের তালিকায় 'আব্রাহাম লিঙ্কন' এই নামটি তাই চিরকালের মতো স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সঙ্গে চারিত্রিক মহত্ত্বের যে-অপূর্ব সমন্বয় আমরা তাঁর জীবনে লক্ষ্য করি তা পৃথিবীর খুব কম রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই দেখা যায়। বস্তুত আব্রাহাম লিঙ্কনের চরিত্রমাধুর্য এবং মানবিকতাবোধ আর সেইসঙ্গে তাঁর দুর্লভ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান তাঁকে আমেরিকার ইতিহাসে যেমন, তেমনি বিশ্বের ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

জীবনী শতক 'বই' থেকে

বিপ্লব দাশ

মাছেরাও কথা বলে

মাছে ভাতে বাঙালি। যতই মাছের দাম বাড়ুক ভাতের পাতে মাছ না-থাকলে আমাদের মন খুঁতখুঁত করে। তো—এই মাছেদের নিয়েই আজকাল খুব খোঁজখবর চলছে। মাছেরা ডাকে, আওয়াজ করে। সাপের মতো হিসহিস শব্দ করে—শুয়োরের মতো ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে। হয়তোবা কথাও বলে। এইসব শব্দ নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণাও করেছেন এবং করছেন। জানা গেছে মোটামুটি দুভাবে এদের উৎপত্তি।

প্রথমটি ঘর্ষণ থেকে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্ট্রিডুলেশন। নিজের দাঁতে দাঁতে যদি কেউ খুব জোরে ঘষে তাতে একটা শব্দ তৈরি হবে। মাছেরাও সেরকম নিজেদের হাড়বিশিষ্ট অংশগুলো ঘষে শব্দ করে।

রাইনেক্যানথিস অ্যাকুইলিটাস একধরনের টাইগার মাছ। এদের বুকের পাখনার কাছাকাছি হাড়গুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে ঘষা খেয়ে শব্দ তৈরি করে। সূর্যমাছ এবং একধরনের কাঠবিড়ালী মাছে কানের ফুলকোর সরু সরু হাড়ের ঘষায় শব্দ হয়। অনেক সাধারণ মাছের পিঠের পাখনা আর লেজ-পাখনার কাঁটা বা হাড় থেকেও আওয়াজ হয়।

এ ছাড়া মাছেদের পেটে থাকে সুইম ব্লাডার বা হাওয়া-থলি। শরীরের বেশ বড় অংশ জুড়ে থাকে এই থলি। বাড়িতে মা যখন মাছ কাটেন তখন মাছ টিপে পেটের ভেতর থেকে যে-পটকা বের করে

আনেন সেটাই হাওয়া-থলি। এই থলি থেকে ইচ্ছেমতন হাওয়া পায়ুসংলগ্ন একটা ছিদ্রপথ দিয়ে শরীর থেকে ত্যাগ করে শব্দ করে মাছ। এই পটকা হল শব্দ করার দ্বিতীয় যন্ত্র।

মানুষের বা অন্যান্য বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণীদের যেমন স্বরতন্ত্রী থাকে, মাছের তেমন কিছু নেই। হাওয়া-থলির গায়ে যে-মাংসপেশি আছে সেটাকেই একটা তরঙ্গে থরথর করে কাঁপিয়ে দেয় সে। তাতে এক শব্দ ওঠে। কিন্তু এজাতীয় পটকা থেকে তৈরি শব্দ ঘর্ষণজনিত শব্দের থেকে অনেক ক্ষীণ। এটা শুনতে হাইড্রোফোনিক রেকর্ডার দরকার। দরকার সেই শব্দকে অনেকগুণ বাড়িয়ে মানুষের শোনার মতো করা।

আমরা, মেরুদণ্ডী প্রাণী এই মানুষেরা, কথা বলি। মনের ভাব প্রকাশের জন্য অর্থব্যঞ্জক কতগুলো শব্দসমষ্টি ব্যবহার করি। হয়তো মাছেরাও এমন বলে। অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী-মন তাই মাছেদের শব্দগুলোর মানে খুঁজে পেতে চাইছেন। কিছু-কিছু পেয়েছেনও। সবটুকু পাঠোদ্ধার না হলেও বিজ্ঞানীরাও এ-বিষয়টা নিশ্চিত যে মাছেরা বিশেষ কয়েকটি কারণেই শব্দ ব্যবহার করে।

যে-সমস্ত জলচর প্রাণী জলের নিচে গুহায় লুকিয়ে থাকে অথবা যারা থাকে খুব গভীর সমুদ্রে, তাদের কাছে সাধারণত সূর্যের আলো পৌঁছায় না। কিছু বায়োলুমিনাস বা জৈব স্বপ্রভ প্রাণী সেখানে নিজেরাই নিজেদের শরীর থেকে আলো বিকিরণ করে। কিন্তু সে-আলোর তীব্রতা অত্যন্ত কম। গরিবের বিয়েবাড়ির টুনি বাল্ব। তাই জৈব অভিযোজনের ফলে ঐ এলাকার মাছেদের চোখ খুব ছোট। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। দূরের জিনিস তেমন তারা চিনতে পারে না। এই ধরনের মাছ সমগোত্রীয়দের চেনার জন্য শব্দ ব্যবহার করে।

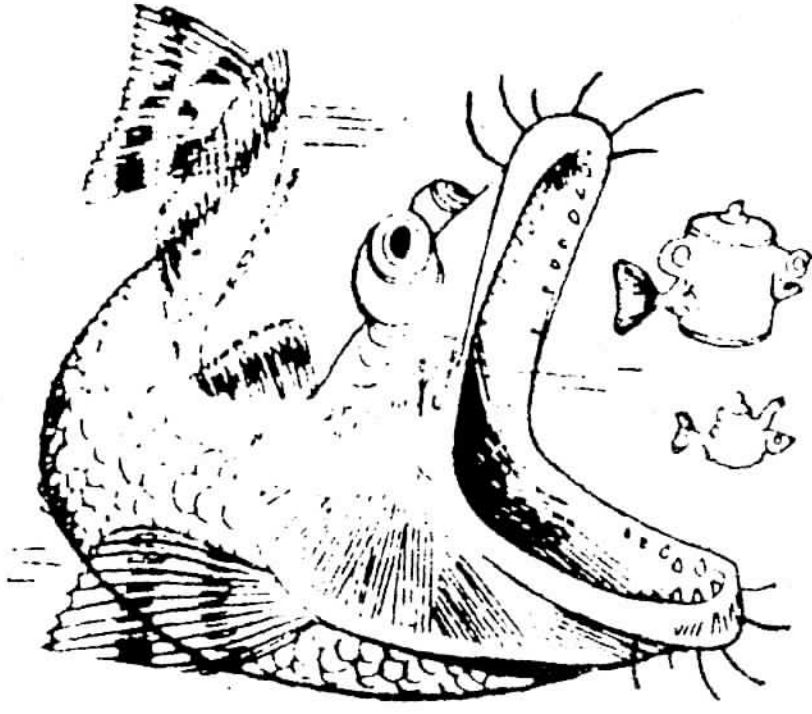

কখনো কখনো মাছেদের ডাক রেকর্ড করে দেখা গেছে যে সেগুলো গভীর সমুদ্রতল থেকে ওঠা প্রতিধ্বনি। তাতে মনে হয় মাছেরা সাগরতলের গভীরতা মাপার জন্যেও শব্দকে ব্যবহার করে।

গ্লোব মাছ-জাতীয় প্রাণী একেবারে কুকুরের মতো ঘেউঘেউ করে। এরা নিজেদের চৌহদ্দির ভেতরে অপরিচিত জানা নেই শোনা নেই জীবের উপস্থিতি সহ্য করে না। বাবুদের তালপুকুরে হাবুদের ডালকুকুরের মতো। তাই এমন আওয়াজ। সে কী ব্যস, করলে আওয়াজ, ও-মাছের এমনি রেওয়াজ। এতে নজরুলের 'লিচুচোর' শুধু নয়, শত্রুরাও পালিয়ে যায়।

সাধারণত ডিমপাড়ার সময় মাছেরা স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে আকর্ষণ করার জন্য একধরনের বিশেষ শব্দ করে। ঈল মাছের এই শব্দ ভীষণ তীক্ষ্ণ হয়। বেশিরকম খেপে গেলে কোনো-কোনো মাছ কিছুক্ষণ পরপর তীক্ষ্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী শব্দ করে। তা এত গভীর এবং জোরালো যে প্রায় একশো ফুট দূর থেকেও স্পষ্ট শোনা যায়।

ভাবো তো মাছ কাটার সময় বাজার থেকে আনা জ্যান্ত মাছেরা পরিষ্কার গলায় নাকিসুরে আওয়াজ ছাড়ছে—"মেরো না আমারে মেরো না মেরো না।" আর সেই কথা শুনে দয়াপরবশ আমাদের মায়েরা মাছ নামিয়ে রাখছেন। কী হবে তখন আমাদের মাছ খাওয়ার, বলো তো!

ট্রেন ফেল-করা চার্চিল

ইংল্যান্ডের এককালের প্রধানমন্ত্রী, লেখক, শিল্পী স্যার উইনস্টন চার্চিল জীবনে বহুবার ট্রেন ফেল করেছেন। ট্রেন ধরতে না-পারার ব্যাপারে তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন, আমার মধ্যে রয়েছে খেলোয়াড়ি মনোভাব, সেইজন্যে আমি ট্রেনগুলোকে সুযোগ দিই যাতে তারা পালিয়ে যেতে পারে।

খিচুড়ি

সুকুমার রায়

হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—"বাহবা কি ফূর্তি!
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।"
টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা—
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা?
ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,
চাপিল বিছার ঘাড়ে, ধড়ে মুড়ো সন্ধি!
জিরাফের সাধ নাই মাঠে ঘাটে ঘুরিতে,
ফড়িঙের ঢং ধরি' সেও চায় উড়িতে,
গরু বলে, "আমারেও ধরিল কি ও রোগে?
মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরগে?"
হাতিমির দশা দেখ,—তিমি ভাবে জলে যাই,
হাতি বলে, "এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই।"
সিংহের শিং নেই, এই তা কষ্ট—
হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট।

এভারেস্ট-জয়ী শেরপা তেনজিং

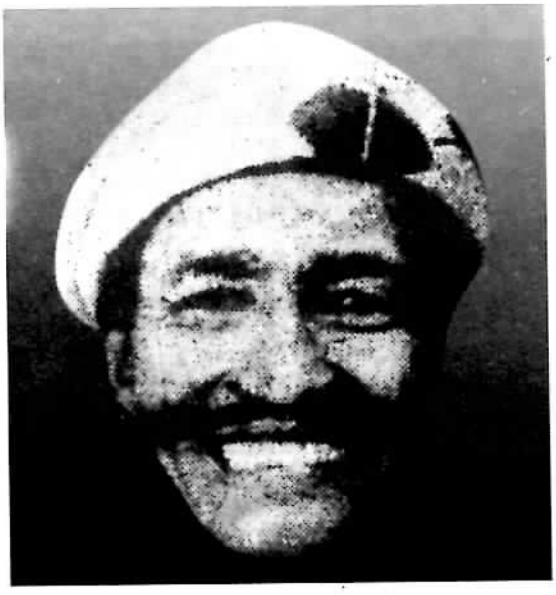

গিরিরাজ হিমালয়। মানুষের কাছে এক অনন্ত বিস্ময়। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর বুকে। অনড়, অটল। বিশাল অতিকায় রহস্যময়। শুধু রহস্যময়ই নয়, রহস্যের চেয়েও রহস্যময়। পৃথিবীজুড়ে কতই তো পাহাড়-পর্বত আছে। কিন্তু এত উঁচু পর্বত আর কোথাও নেই। তাই হিমালয়কে নিয়ে মানুষের কৌতূহল যুগ যুগ ধরে। আকাশচুম্বী এর শিখরদেশ। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা সমস্ত শরীর। যেন শাদা-রহস্যের মায়াজালে বোনা। কী যে জাদু আছে এর! শুধু হাতছানিতে ডাকে বারবার। রোমাঞ্চিত করে, পুলক জাগায়, রক্তে জাগায় চাঞ্চল্য, দুরন্ত শিহরন। কেউ-কেউ বলে, সেখানে নাকি দৈত্য-দানোর মতো অতিকায় তুষারমানবদের বাস। ভয় পাবার মতো চেহারা তাদের। লম্বা লম্বা পা, শরীর লোমে ঢাকা, কালো কুচকুচে গায়ের রং। কেউ আবার বলে, নরখাদক। আসলে যে কী, তার খোঁজ মেলেনি এখনও। শুধু কয়েকটা অদ্ভুত রকমের বড় বড় পায়ের ছাপ ছাড়া তুষারমানবের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি ঠিকই, তবে এরকম আশ্চর্য রোমহর্ষক অবিশ্বাস্য রমরমা খবর ছেপে অনেক পত্রিকা দুপয়সা কামিয়ে নিয়েছে। আসলে যে কী আছে, কে জানে! ব্যাপার রহস্যময় তো বটেই। এই রহস্যের মায়াজাল কেটে হিমগিরির রহস্য উদ্ঘাটন করা কি অতই সহজ? মোটেও না। ঝক্কিও কম নয়।

যুগ যুগ ধরে মানুষ হিমালয়ের সুউচ্চ চূড়ায় পায়ের চিহ্ন আঁকার কত স্বপ্ন দেখে আসছে। যার নাম 'এভারেস্ট'। মাটির পৃথিবীতে ওটাই সবচেয়ে উঁচু জায়গা। উচ্চতা ২৯০২৮ ফুট (৮৮৪৮ মিটার)। সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্টের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। মানুষ স্বপ্ন দেখেছে সেই চূড়ায় ওঠার। কিন্তু স্বপ্ন যে একদিন সত্যি হবে, তা কেউ ভাবতেও পারেনি। কারণ হিমালয়ের শীর্ষদেশে ওঠা ছেলেখেলা নয়। রীতিমতো জীবন নিয়ে খেলা। পবর্তটা যেমনি খাড়া, তেমনি দুর্গম। পিচ্ছিল বরফ-ঢাকা পথ। আছে

ছোটবড় খাদ। বড় বড় বরফের চাঁই। একবার ধসে পড়লে রক্ষা নেই। মৃত্যু অনিবার্য। কাজেই মৃত্যু যেখানে প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী সেখানে যাওয়াটা যতটা সহজ বলে মনে হয়, আসলে ততটা নয়।

যতই বাধাবিপত্তি আসুক-না, হিমালয় জয় করার কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়েছে মানুষ। জীবন বাজি রেখে এই অসাধ্যসাধনে সচেষ্ট হয়েছে প্রাণপণ চেষ্টায়, তবেই তো মানুষ! তাই মানুষ পারে না, এমন কাজ নেই। ঘরে আটকে রাখতে পারেনি কেউ। অভিযানের পাগলপারা দুরন্ত নেশায় ছুটিয়ে নিয়েছে হিমালয়ের চূড়ায়। মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টায় আর প্রবল ইচ্ছার ফলেই এই বিরাট বাধা অতিক্রম করেছে। পরাজিত করেছে প্রকৃতির বৈরিতাকে। জয় করেছে দুর্গম 'মাউন্ট এভারেস্ট'। এ শুধুমাত্র মানুষের অদম্য দুঃসাহস আর অমোঘ ইচ্ছাশক্তির ফসল।

এভারেস্ট বিজয় অভিযান ইতিহাসে এক অকল্পনীয় ঘটনা। এই জয়ের মাধ্যমে আরো একবার প্রমাণিত হল 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'।

দুরারোহ দুর্গম হিমালয়। বছরের বারো মাসই থাকে তুষারে ঢাকা। তার ওপর আবার যতই উপরে ওঠা যাবে, অক্সিজেনের ভাগ কমতে থাকে ততই। তাই একটু উপরে ওঠার পর স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। আর আরো বেশি উপরে উঠতে থাকলে অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া কোনো গতিই নেই।

তবু কি এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা থেমে থেকেছে? মোটেও না। মানুষ হিমগিরির চূড়ায় ওঠার

চেষ্টা করেই চলেছে একের-পর-এক। চেষ্টার কি শেষ আছে? আসুক-না যমদূত, তবু চেষ্টা থামেনি মৃত্যুভয়ে। 'পারিব না এ-কথাটি বলিও না আর'— ঠিক এইরকম ব্রত নিয়ে যেন ছুটেছে লোকেরা, সেই উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে।

মানুষ তার নিজ চেষ্টা আর অসীম দুঃসাহসের জোরে নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও জয় করেছে উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরুর মতো বিপদসঙ্কুল জায়গা। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, অরণ্য পেরিয়ে জংলি, হিংস্র, পশুপাখির আক্রমণ উপেক্ষা করেছে। আবিষ্কার করেছে কত-না নদনদী, অনাদৃত অবহেলিত, অজানা-অচেনা দেশ, জনপদ, অঞ্চল; জাহাজে-জাহাজে জলপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ঘুরেছে পৃথিবীর এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত। অনেক বিপজ্জনক অঘটন ঘটবার আশঙ্কা থাকলেও কেউ পিছু হঠেনি। দমে যায়নি। বরং এসবের ফলে অভিযান-পিপাসুদের অভিযানস্পৃহা আরো বেড়েছে হাজারগুণে। এগিয়ে গেছে নির্ভীকভাবে।

এভারেস্টের দিকে যারা ছুটেছিল তারাও দুঃসাহসী, দুরন্ত, প্রাণচঞ্চল। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, প্রায় দেড়শো বছর আগে ১৮২৮ সালে ক্যাপ্টেন শিয়ার্ড নামে এক ব্যক্তি দুঃসাহসের সাথে উঠেছিলেন ১৯ হাজার ফুট পর্যন্ত। তার পরে এক মহিলাও তাঁর স্বামীসহ ১৯০৩ সালে উঠেছিলেন ২২,০০০ ফুট উপরে। এভাবে ধীরে ধীরে আরো বেশি উঁচুতে উঠতে লাগল অভিযাত্রীরা। একবার দুজন অস্ট্রিয়ান পর্বতারোহী কনওয়ে ও একনস্টাইন ২৬,০০০ ফুট উঁচুতে উঠতে সক্ষম হন। এসব অভিযানকে ঠিক অভিযান বলা যায় না। অভিযানের প্রথম পর্যায় বলা যেতে পারে। টুকটাক অ্যাডভেঞ্চারের ছিটেফোঁটা আনন্দ রোমাঞ্চ ও অনুভবের জন্যেই মাঝেমধ্যে দু-একজন হিমালয়ে উঠতে চেষ্টা করেছেন।

সত্যি বলতে, ঘটা করে এভারেস্ট অভিযান শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর। ১৯২১ সালে হয় প্রথম অভিযান। এটা ছিল দুর্গম কঠিন হিমালয়ের চূড়ায় ওঠার একটা সহজ পথের সন্ধানে অভিযান। পথ একটা বের করা হল। পরের বছর থেকে শুরু হল অভিযান। দলের নায়ক জেনারেল ব্রুস। ৭৩ জনের বিরাট এক অভিযাত্রী বহর। তার মধ্যে ৬০ জনই শেরপা। দক্ষ অভিজ্ঞ তারা। হিমালয়ের হালচাল, নাড়িনক্ষত্র সব তাদের জানা খুব ভালো করেই। এ ছাড়া জেনারেল ব্রুসের সঙ্গে আছেন দুর্দান্ত পুরুষ ম্যালরি। অনেক বাধা অতিক্রম করে তাঁরা পৌঁছুলেন ২৭ হাজার ফুট। কিন্তু এত কাছে গিয়েও অভিযান বন্ধ করতে হল তাঁদের। বরফের সাগরে নিখোঁজ হল সাতজন শেরপা। হিমতুষারের রাজ্যে চিরতরে হারিয়ে গেল। কোথায় গেল? কোনো হদিশ পাওয়া গেল না।

কিন্তু তাই বলে এভারেস্ট অভিযান থেমে থাকেনি।

ম্যালরিরা ফিরে এসে নিরাশ হননি একদম। আবার দলবল নিয়ে ছুটেছেন হিমপুরীর উদ্দেশে। ১৯২৪ সালের কথা। একরাশ দুর্ভোগ মাথায় নিয়ে উপরে উঠেছেন ম্যালরি ও অরভিন। লক্ষ্য একটাই। এভারেস্ট চূড়ায় পা রাখতেই হবে। আর বেশি উঁচু নয়। চূড়ার কাছাকাছি তাঁরা এসে পড়েছেন। আর একটু কষ্ট করে উঠলেই হবে। মাত্র কয়েক ফুট বাকি। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস। আকস্মিক তুষারঝটিকায় সলিল-সমাধি ঘটল সেই দুই দুর্ধর্ষ হিমালয় অভিযাত্রীর। তাঁদের দুর্ভাগ্য, খুব কাছে পৌঁছেও জয় করতে পারলেন না হিমালয়, পারলেন না তার চিরউন্নত শিরে পদচিহ্ন আঁকতে।

এতবড় এক দুর্ঘটনার পরও কিন্তু অভিযান থামল না। ১৯৩৩, ১৯৩৬, ১৯৫১, ১৯৫২ পর্যন্ত আরো চারটা বড় অভিযান হল। রাটলেজ, শিপটন, ল্যাম্বেয়ার, তেনজিং-স্মাইথ, টিলম্যান প্রমুখ দুঃসাহসী অভিযাত্রী অনেক চেষ্টা করেও পৌঁছতে পারলেন না হিমগিরির শীর্ষে। তাঁদের কেউই ২ হাজার ফুটের উপরে উঠতে পারেননি।

১৯৫৩ সাল। এ-পর্যন্ত ছোটবড় মোট দশ-দশটা অভিযান হয়ে গেছে। কিন্তু ১৯৫৩ সালটা এভারেস্ট অভিযানের জন্যে একটি বিশেষ বছর। একটি গৌরবময় বছর। হিমালয়ের ১১তম

অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হল। এবার দলের নেতৃত্ব দেবেন কর্নেল জন হান্ট (জন্ম ২২ জুন, ১৯১০)। আর সঙ্গে থাকবেন দক্ষ অভিজ্ঞ শেরপা তেনজিং ও এডমন্ড হিলারি এবং আরো কয়েকজন অসমসাহসী পর্বতারোহী। প্রচণ্ড শীতের কামড় তুচ্ছ করে সবাই ছুটছেন উপরের দিকে। হিমালয় এমনই একটা জায়গা যেখানে অন্যান্য পাহাড়ের মতো চটপট হেঁটে ওঠা যায় না। কারণ খাড়া দুর্গম আর তুষারাচ্ছন্ন বলে পিচ্ছিল। কাজেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কঠিন বরফ কেটে কেটে ধাপে ধাপে এগুতে হয় সামনের দিকে। তাঁরা খুব সাবধানে চলছেন। শীত-টিত কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করেই উঠে চলেছেন নির্ভীকভাবে।

অভিযাত্রী দলের তেনজিং একজন তুখোড় পর্বতারোহী। পুরো নাম তেনজিং নোরাগে। ১৯১৪ সালে তাঁর জন্ম। নেপালের ওয়াংডিতে। জন্ম নেপালে হলেও চলে আসেন ভারতে। দার্জিলিং-এ শেরপার কাজ নিয়ে রয়ে যান। ফলে পাহাড়ে ওঠা ব্যাপারটা তাঁর জন্যে পানির মতোই ছিল। পাহাড়চূড়ায় অত্যন্ত পারদর্শী এই শেরপা আর হিলারি কোমরে দড়ি বেঁধে উঠছেন। ২৭,৮০০ ফুট ওঠার পর একটা তাঁবু ফেলা হল। সেটা ২৮ মে, ১৯৫৩। প্রচণ্ড শীত তো রয়েছেই। আর যত উপরে উঠছেন তত বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণও কমছে। কাজেই কাঁধে অক্সিজেন সিলিন্ডার বাঁধাই আছে। বরফের উপর পা ফেলে ফেলে আরো কিছুদূর গিয়ে আরেকটা তাঁবু গাড়লেন। সেখান থেকেই হবে শেষযাত্রা।

চূড়া থেকে আর মাত্র ৮৮০ গজ দূরে তাঁরা। এখন একটুও অসাবধান হওয়া যাবে না। তা হলেই সব পণ্ডশ্রম। শুধু তা-ই নয়, জীবন যাবে একেবারে।

অবশেষে এল সেই চিরকাঙ্ক্ষিত গৌরবময় দিন। এভারেস্ট অভিযানের একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। ২৯ মে ১৯৫৩। ঠিক বেলা ১১.৩০ মিনিটে মানুষের কাছে হার মানল অনড়, অটল, কঠিন হিমালয়। প্রথম মানুষের পা পড়ল চিরতুষারের দেশ এভারেস্ট-শৃঙ্গে।

মাউন্ট এভারেস্টে প্রথম মানব শেরপা তেনজিং। তিনি প্রথম পায়ের চিহ্ন এঁকে দিলেন "চির উন্নত মম শির ঐ শিখর হিমাদ্রীর" উপরে। তারপর তিনি হিলারিকে টেনে উপরে তোলেন। হিমালয়ের চূড়া

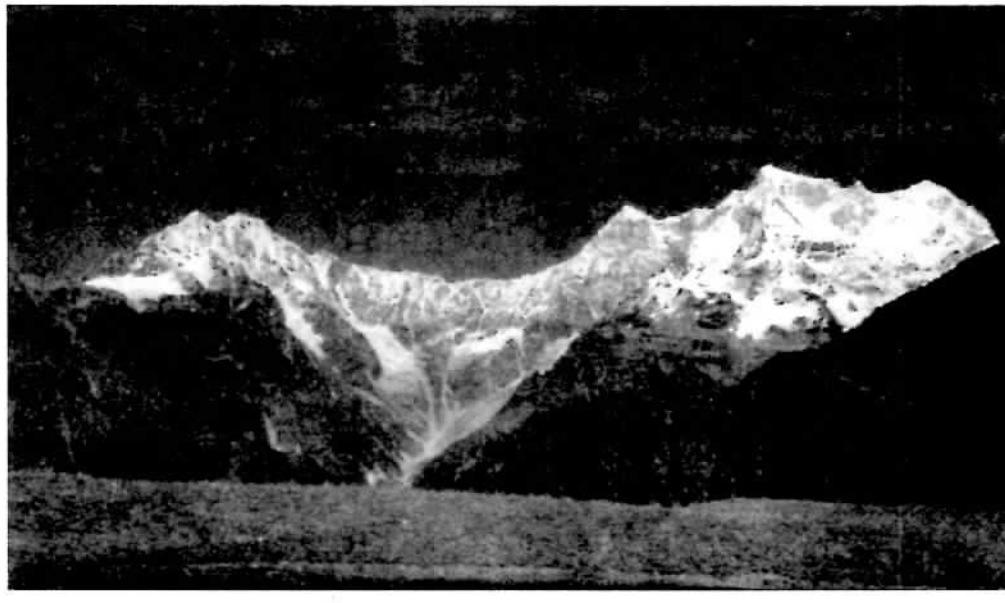

জয় করা তেনজিং-এর অক্ষয় কীর্তি। একটা পাহাড়ি প্রবাদ আছে, কারো মাথায় সাপ উঠলে সে নাকি রাজা হয়। তেনজিং-এর মাথায়ও নাকি একবার সাপ উঠেছিল। তখন সবাই বলেছিল : "তুমি একদিন রাজা হবে।" আশ্চর্য হলেও প্রবাদটা সত্যি হয়েছিল তেনজিং-এর বেলায়। এভারেস্টের চূড়ায় উঠে রাজা না হলেও রাজার চেয়ে বেশি সম্মান অর্জন করেছিলেন। খ্যাতি হয়েছিল দুনিয়াজোড়া।

তেনজিং ছিলেন খুব হাসিখুশি মানুষ। সবসময় মুখে হাসি লেগেই থাকত। এ ছাড়া ছিলেন কর্মঠ। আর ছিলেন ধীরস্থির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত ও দায়িত্বশীল। এতগুলো গুণ একসাথে খুব কম শেরপাদের মধ্যেই দেখা যায়। তাই তিনি ছিলেন বড়মাপের একজন শেরপা। পাহাড়ে চড়ার প্রথম সুযোগ তাঁর আসে ১৯৩৫ সালে। ১৯৩৮ সালে তৃতীয়বারের মতো এভারেস্ট অভিযানে যান টিলম্যানের সাথে। সেবার তিনি 'টাইগার অব দি স্নো' খেতাব পান। তারপর যেদিন এভারেস্টের চূড়ায় উঠলেন তখন এই খেতাব আরো বড় হয়ে হল 'টাইগার অব টাইগারস'। শেরপাদের 'টাইগার' উপাধি পাওয়া পরম পাওয়া। এই খেতাবটি দিয়েছিলেন তখনকার নেপালের রাজা। কারণ তেনজিং-এর জন্মভূমি নেপালে। তাই তো তিনি বলতেন : "আমি নেপাল মাতৃভূমিতে জন্মেছি, আর মানুষ হয়েছি ভারত মায়ের কোলে, তাই আমি একজন ভারতীয়ও।"

তাঁর জন্ম হয়েছিল এক দরিদ্র পরিবারে। ১৮ বছর বয়সে জীবিকার সন্ধানে চলে আসেন দার্জিলিং-এ। তাঁর জীবনে অনেক পাহাড় টপকেছেন। তার মধ্যে এভারেস্টই সাতবার। পাহাড় সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও কম হয়নি এর ফলে। পর্বতারোহণের ব্যাপারে ছাত্রদের তালিম দিতেন উৎসাহের সাথে। এভারেস্ট-বিজয়ের সাফল্য দেখে সারা ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্বে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ভারতের সরকারি মহলেও আলোড়নের ঝড় বয়ে গেল। তেনজিং নোরাগের দুঃসাহসিক অভিযানের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যে এবং তরুণদের পর্বত-আরোহণে উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে ভারতে প্রথম পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র স্থপন করা হয় দার্জিলিং-এ। নাম 'হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট'। কেন্দ্রের পরিচালক করা হয় তেনজিংকে। এভারেস্ট জয়ের তুখোড় নায়ক শেরপা তেনজিং শেষ বয়স পর্যন্ত পর্বতারোহণ, হিমালয় অভিযান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতের উচ্চশিখরে পা রাখা তেনজিং নোরাগে পরপারের পথে পা বাড়ান ১৯৮৬ সালের ৯ মে তারিখে।

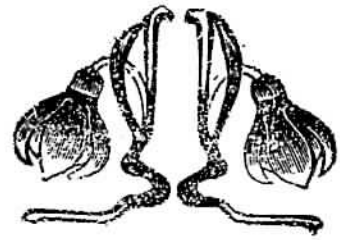

স্ট্যাচু অব লিবার্টি নির্মাণের কাহিনী

গণতান্ত্রিক আমেরিকার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচু অব লিবার্টি। স্বাধীনতার আলোকে বিশ্ব আলোকিত—এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এই অমর মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। ৩০৫ ফুট উঁচু এই মূর্তিটি বিশ্বের অন্যান্য যে-কোনো ভাস্কর্যের চাইতে আলাদা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। স্বমহিমায় স্বতন্ত্র। বিশ্বের সর্বাধিক পরিচিত এই মূর্তিটির নির্মাতা সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই।

উনিশ শতকের প্রতিভাবান ভাস্কর্যশিল্পী ফ্রেদরিক অগাস্তে বার্থেওলদি এই নান্দনিক মূর্তিটির নির্মাতা। উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান শিল্পীর এই অমর সৃষ্টিকর্মের নেপথ্যকাহিনী সাধারণ মানুষের কাছে আজও কৌতূহলের বিষয়। নিউইয়র্ক হারবারে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা লিবার্টি মূর্তিটির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে যে-কোনো দর্শকের এর নির্মাতার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

বার্থেওলদি'র পূর্বপুরুষ ইতালীয়-বংশোদ্ভূত। ১৬০০ শতকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ফ্রান্সে এসে বসতি স্থাপন করেন। ১৮৩৪ সালের ২ আগস্ট জার্মান সীমান্তের কাছে ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কোলমার নামক স্থানে বার্থেওলদি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের তিন বছর পর তাঁর সরকারি চাকুরে পিতা মারা যান। এরপর বার্থেওলদি-পরিবার প্যারিস-নগরীতে চলে আসেন।

বালকবয়সেই বার্থেওলদি'র দুটি জিনিসের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ প্রকাশ পায়। একটি হল শিল্পকলা, অপরটি স্বাধীনতা। বালক বার্থেওলদি স্কুল কামাই করে কাঠ খোদাই করতে বা সে-সময়ের দুই বিখ্যাত ভাস্কর্যশিল্পী এন্থনি ইটেন্স ও এরে স্কেকারের স্টুডিওতে গিয়ে বসে-বসে তাঁদের কাজ দেখতে বেশি পছন্দ করতেন। এই দুই শিল্পী বালক-বার্থেওলদিকে শিল্পচর্চায় উৎসাহ যোগান।

বার্থেওলদি'র বয়স যখন ১৬, সে-সময় ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করেন। নেপোলিয়নের ক্ষমতারোহণের দিন বার্থেওলদি দেখতে পান প্যারিসের পথে-পথে জনগণ ব্যারিকেড সৃষ্টি করছে। যুবক বার্থেওলদির মনে এটি দারুণ প্রভাব বিস্তার করে।

সে-রাতে টর্চ-হাতে অন্ধকার রাস্তা পার হওয়ার সময় একজন যুবতীকে নেপোলিয়নের সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে। এ-দৃশ্য দেখে বার্থেওলদি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

দৃশ্যটি বার্থেওলদির মনে গেঁথে যায়। সে-সময় থেকেই টর্চ-হাতে অচেনা যুবতীকে বার্থেওলদি স্বাধীনতার প্রতীক মনে করে এসেছেন।

১৮৬৫ সালে আইনের অধ্যাপক ও ফ্রান্স ইন্সটিটিউটের সদস্য এডওয়ার্ডো দ্য লাবাউলেই বার্থেওলদিকে বলেন : শিল্পকর্ম ও স্বাধীনতা হল দুটি পরিপূরক জিনিস। একটি ছাড়া অপরটির পূর্ণতা সম্ভব নয়। অধ্যাপক লাবাউলেই আরো বলেন : যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রতীক।

অধ্যাপক লাবাউলেই এই আশাবাদও ব্যক্ত করেন যে, আমেরিকার স্বাধীনতার শতবর্ষ উদ্‌যাপনের বছর অর্থাৎ ১৮৭৬ সালে ফ্রান্সের জনগণ নিশ্চয়ই যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো বিশেষ উপহার দেবে। অধ্যাপক লাবাউলেই বার্থেওলদিকে একটি ভাস্কর্য নির্মাণের অনুরোধ জানান, যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার মুহূর্তটিকে অমর-অক্ষয় করে রাখবে এবং এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ফ্রান্সের উপহার।

বার্থেওলদি কাজে মনোনিবেশ করেন। এতে প্রথম যে-সমস্যাটি দেখা দেয় তা হল মূর্তির জন্য একটি মডেল খুঁজে পাওয়া। আকস্মিকভাবে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে বার্থেওলদি তাঁর মডেলকন্যার সাক্ষাৎ পেয়ে যান। মেয়েটির নাম জেন এমিলি বাহেক্স দ্য পুইসেইক্স। অপূর্ব সুন্দর দেহবল্লবির অধিকারিণী পুইসেইক্স দেখতে অপ্সরীর মতো ছিল। বার্থেওলদি পুইসেইক্সকে মডেল হওয়ার প্রস্তাব দিলে মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অবশ্য বার্থেওলদি পুইসেইক্সকে বিয়ে করেন। 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' মূর্তিটির মুখের আদলে দুজন মহিলার চেহারার ছাপ পাওয়া যায়। একজন বার্থেওলদির স্ত্রী পুইসেইক্স, অপরজন বার্থেওলদির মা।

লিবার্টি-মূর্তিটির অবয়ব বার্থেওলদি'র মানস-চেতনায় তৈরি ছিল। ১৮৬৯ সালে তিনি এর প্রাথমিক নকশাও প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু ১৮৭০ সালের ফ্রান্স-প্রুশিয়ান যুদ্ধের জন্য মূর্তিটির নির্মাণকাজ বন্ধ রাখতে হয়।

বার্থেওলদি দেশের দুঃসময়ে ছেনি-হাতুড়ি ফেলে তরবারি-হাতে যুদ্ধে যান। কিন্তু সে-যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয়। পরাজয়ের গ্লানি ভোলার জন্য লিবার্টি-মূর্তিটি নির্মাণের জন্য বার্থেওলদি আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য বার্থেওলদি এরপর আমেরিকা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৭১ সালের ৮ জুন আমেরিকার উদ্দেশে জাহাজে ওঠেন। সাথে ছিল লাবাউলেই-এর পত্র। ১৩ দিন সমুদ্রযাত্রার পর জাহাজ নিউইয়র্ক হারবারে নোঙর করে। জেটির পাশে মনোমুগ্ধকর বেড লুই আইল্যান্ড দেখে বার্থেওলদি মনে-মনে বলেন : এই সেই জায়গা যেখানে আমার মূর্তিটি স্থাপন করব।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩ মাসেরও বেশি সময় ভ্রমণ করে কাজ করার অদম্য বাসনা নিয়ে প্যারিসে ফিরে এবার তিনি মূর্তিটির নির্মাণব্যয় নিয়ে সমস্যায় পড়েন। অধ্যাপক লাবাউলেই-এর সহযোগিতায় ফ্রান্স-আমেরিকা সমিতি ১৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে মূর্তি-নির্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাতে রাজি হয়। যেহেতু মূর্তিটি যুক্তরাষ্ট্রকে উপহার দেয়া হবে, তাই সমিতি অর্থসংগ্রহের আবেদনে উল্লেখ করে, এই মূর্তিটি দুটি দেশের জনগণের সম্মিলিত প্রয়াস, এই দুটি দেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে।

সমিতির অর্থের ওপর ভরসা না করেই বার্থেওলদি প্যারিসের হিউজ হলে একটি স্টুডিও স্থাপন করেন। তিনি পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মূর্তিটি কোনোরকম ঠেকা ছাড়াই দুই পায়ে ভর দিয়ে

দাঁড়িয়ে থাকবে। তিনি পাথর, লোহা বা ব্রোঞ্জ—এই তিন অত্যধিক ভারী পদার্থ দিয়ে মূর্তিটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর সমস্যা দেখা দেয় সাগরের প্রবল হাওয়ায় উঁচু কাঠামোটি দাঁড় করানো নিয়ে। এই সমস্যাটির সমাধানে এগিয়ে আসেন প্রকৌশলি গুস্তেভ আইফেল। তিনি পরে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের নির্মাতা হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি পান। আইফেল ২৬ ফুট পানির নিচে ৪টি পিলার মাটির ভেতরে গেড়ে লোহার একটি কাঠামো নির্মাণ করেন।

১৮৭৫ সালের মাঝামাঝি কাঠামোটি ধীরে-ধীরে আদল পেতে শুরু করে। ১৮৭৫ সালের নভেম্বরে ফ্রান্স-আমেরিকা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এক ভোজসভায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ও আমেরিকার রাষ্ট্রদূত যোগ দেন। মূর্তিটির একটি ক্ষুদ্র মডেল ভোজসভায় দেখানো হয়। এই ক্ষুদ্র মডেলটি দেখে সবাই এতই মুগ্ধ হয় যে, ফ্রান্স মডেল-নির্মাণের জন্যে টাকাসংগ্রহে সচেষ্ট হয় এবং বছরের শেষ নাগাদ ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার সংগৃহীত হয়।

বার্থেওলদি ১৮৭৬ সালে পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে যান। তাঁর নির্মীয়মাণ শিল্পকর্মটি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে ধারণা দেয়া ও টাকা সংগ্রহ ছিল এবারকার সফরের উদ্দেশ্য। এরপর বার্থেওলদি প্যারিস ফিরে এসে দেখেন আইফেল কাজ শেষ করে এনেছেন। তাঁর স্টুডিওর পাশে খোলা মাঠে সেটি দাঁড়িয়ে আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অর্থসংগ্রহ আশানুরূপ হয়নি। সেখানে মাত্র ১ লাখ ডলার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। পত্রপত্রিকায় মূর্তির পক্ষ ও বিপক্ষদলের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। একটি পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুনে দেখানো হয়, মূর্তিটি একজন মার্কিন নাগরিকের মুখে টর্চের আলো ফেলে জিজ্ঞেস করছে : আপনার কি একটি ম্যাচ কেনার ক্ষমতা আছে? এরপর অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রে মূর্তিটির বিপক্ষদল রণে ভঙ্গ দেয়। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি লিবার্টির পক্ষে প্রচারণায় এগিয়ে আসেন। লিবার্টির ওপর পোস্টার

ছাপা হয়, গান লেখা হয়।

১৮৮৪ সালের ৫ আগস্ট লিবার্টি দাঁড় করানোর স্থান বেডলুই আইল্যান্ডে প্রথম গ্রানাইট ব্লক বসানো হয়। লিবার্টির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে ২৩০ ফুট লম্বা একটি যুদ্ধজাহাজে করে এটিকে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়। জাহাজটির নাম 'ইজেরে'। জাহাজটিতে ফ্রান্স ও আমেরিকার পতাকা পাশাপাশি স্থান পায়।

১৮৮৫ সালের ১ জুন 'ইজেরে' নিউইয়র্ক হারবারে পৌঁছুলে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজগুলো কামানের গোলাবর্ষণ করে তাকে অভিবাদন জানায়। এ-সময় নৌকায় হাজার হাজার দর্শক আনন্দ-উল্লাস করে লিবার্টিকে স্বাগত জানায়।

এরপর জাহাজ থেকে লিবার্টি-কাঠামোকে একশোটি খণ্ডে বিভক্ত করে বেডলুই আইল্যান্ডে ৭৫ জন শ্রমিক ৬ মাসে নিয়ে যায়।

১৮৮৬ সালের ২৮ অক্টোবর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্লেভেল্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে লিবার্টির উদ্বোধনকালে বলেন : এই মূর্তিটি আমাদের উপহার প্রদানের মাধ্যমে আমাদের প্রতি ফ্রান্সের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

এই মূর্তিটির নেপথ্যপুরুষ অধ্যাপক এডয়ার্ডো দ্য লাবাউলেই লিবার্টির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হওয়ার আগেই মারা যান।

'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'র নির্মাতাকে নিউইয়র্কের নাগরিকত্ব প্রদান করে সম্মানিত করা হয়েছিল। ১৯০৯ সালের ৫ অক্টোবর এই অমর শিল্পী প্যারিসে মারা যান।

সংকলিত

কাগজের জাল

প্রতি বছর জাপানে ৭ জুলাই তানাবাটা উৎসব হয়। এই উৎসবের দিন ছেলেমেয়েরা রঙিন কাগজ দিয়ে এক ধরনের জাল তৈরি করে সাজায়। এইভাবে কাগজ কেটে মজার নকশা বানানোকে জাপানিরা কিরিগামি বলে।

কাগজের জাল তৈরি করতে তোমাদের লাগবে একটা চারচৌকো কাগজ। সেটা খবরের কাগজও হতে পারে। আর একটা কাঁচি।

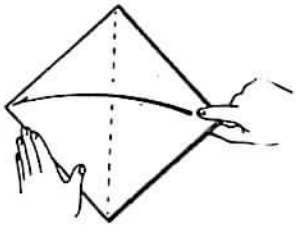

(১) চৌকো কাগজটা টেবিলে পেতে লম্বালম্বিভাবে অর্ধেকটা ভাঁজ করে নাও।

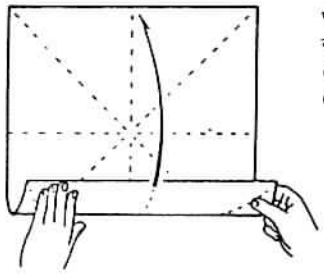

(২) বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এনে আবার অর্ধেকটা ভাঁজ করো।

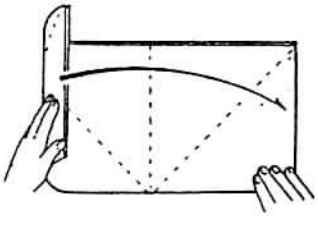

(৩) এবার নীচের ডান দিকের কোণ, উপরের বাঁ দিকের কোণের সঙ্গে মিলিয়ে ভাঁজ করো।

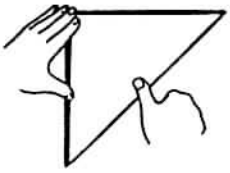

(৪) ত্রিকোণ কাগজটা বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে ভালভাবে ভাঁজ করে নাও।

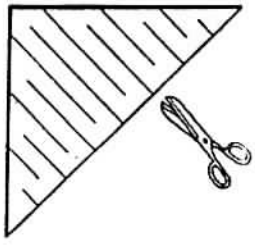

(৫) ত্রিকোণ কাগজটি এবার ২ সেন্টিমিটার অন্তর-অন্তর কাঁচি দিয়ে কেটে ফ্যালো। খেয়াল রাখবে কাগজটা যেন পুরোপুরি না কেটে যায়। এবার ত্রিকোণ কাগজটা ঘুরিয়ে আবার ২ সেন্টিমিটার অন্তর কাটো, আগের কাটা লাইনের মাঝখান দিয়ে। এবারও খেয়াল রাখবে কাগজটা যেন শেষ পর্যন্ত না কেটে যায়।

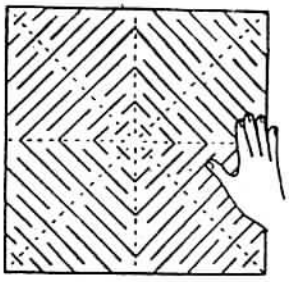

(৬) আস্তে করে পুরো কাগজের ভাঁজ খুলে ফ্যালো।

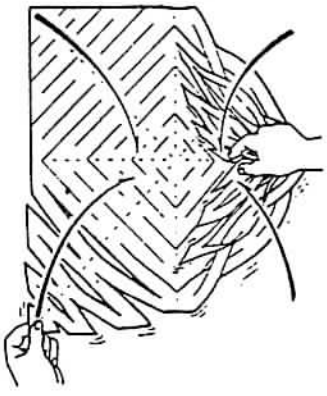

(৭) খুব সাবধানে কাগজের চারটে কোণ এক জায়গায় এনে তুলে ধরো, যাতে খোঁচা লেগে বা জড়িয়ে কাগজটা না ছিঁড়ে যায়। দ্যাখো কী সুন্দর একটা কাগজের জাল তৈরি হয়ে গেল।

লিও টলস্টয়

কতটা জমি দরকার

এক

ছোটবোনের গ্রামের বাড়িতে শহর থেকে বেড়াতে এসেছে বড়বোন। বড়বোনের বিয়ে হয়েছে শহরে এক সওদাগরের সঙ্গে, আর ছোটবোনের হয়েছে গ্রামের এক কৃষকের সঙ্গে। দুজনে চা খেতে-খেতে গল্প করছিল। বড়বোন শহুরে জীবনের সুখ-সুবিধের কথা বলছিল; সেখানে তাদের জীবনযাপন কত আরাম-আয়েশের, ছেলেমেয়েদের নিত্যনতুন কত জামাকাপড় পরাতে পারে, কত রকমের মজার-মজার খাবার খায়, স্কেট করে, যখন যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, থিয়েটারে যায়।...

বড়বোনের শহুরে আদিখ্যেতায় ছোটবোন কিন্তু ভারি বিরক্ত হল। সেও তাই শহুরে জীবনযাত্রার নিন্দে করে নিজের গ্রাম্যজীবনের খুব খানিকটা প্রশংসা করে ফেলল।

সে বলল, "দ্যাখো, যা-ই বলো-না কেন, আমি কিন্তু কিছুতেই তোমার মতো হতে চাই না। অবশ্য তোমার এসব কথা আমি স্বীকার করি যে আমাদের চাষাভুষা জীবন নিতান্ত শাদাসিধে, এখানে তেমন কোনো রং-তামাশা কিংবা উত্তেজনা নেই। কিন্তু তোমাদের জীবনটাকে আরেকটু খুঁটিয়ে দেখ দেখি! তোমরা ভালো খাও, ভালো পরো, আমোদপ্রমোদে পড়ে থাকো বটে, কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যৎটা কী বলতে পারো? ব্যাবসা-বাণিজ্য করে তোমরা হয় খুব বড়লোক হবে নইলে পথের ফকির হয়ে ঘুরে বেড়াবে। একটা প্রবাদ আছে না, লাভ-ক্ষতি দুই ভাই! আজ যারা

ধনী, পথের ভিখারি হতে তাদের কতক্ষণ? তার চেয়ে আমরা বরং বেশ আছি। চাষিদের একগাদা টাকা কোনোদিন হয় না হয়তো, কিন্তু খাওয়া-পরার ভাবনাও তাদের করতে হয় না। কেননা খাওয়ার মতো প্রচুর খাদ্য তাদের সবসময়ই থাকে।"

ছোটবোনের কথা শুনে হেসে উঠল বড়বোন। সঙ্গে-সঙ্গে বলল : "প্রচুর খাদ্য না ছাই? কতকগুলো শুয়োর আর গোরুর বাচ্চা ছাড়া তোমাদের আর আছেটা কী শুনি? না আছে ভালো পোশাক-আশাক, না আছে ভালো একটা সঙ্গীসাথি! তোমাদের চাষা স্বামীরা যতই খাটুক-না কেন, তোমরা আজ যেমন আছ মাটির ঘরে, মরবেও তেমনি সেখানেই। তোমার ছেলেমেয়েদের অবস্থাও ওরকম থাকবে।"

ছোটবোন বলল, "বেশ তো, তাতে হয়েছে কী? আমাদের খুব খাটতে হয় বটে, তবে আমাদের সে-খাটুনি নিজেদের জমিতেই। অন্যের কাছে আমাদের মাথা নোয়াতে হয় না। আর তোমরা শহুরেরা—একটা বন্দি আবহাওয়ার মধ্যে তোমাদের জীবন কাটে। আজ তুমি ভালো আছ, হয়তো কালই তোমার ওপর শনির দৃষ্টি পড়ল আর তোমার স্বামী ঘর-সংসার ভুলে জুয়া-মদে সবকিছু শিকেয় তুলল। কেমন, শহরে এসবই তো হচ্ছে অহরহ?"

ছোটবোনের স্বামী পাখম স্টোভের পাশে বসে দুই বোনের সব কথাই শুনছিল।

সে বলে উঠল, "একেবারে খাঁটি কথা। জমিতে ফসল ফলাতে সেই ছেলেবেলা থেকেই আমাদের মতো চাষাভুষা লোকদের এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে ওসব কুচিন্তা মগজে ঢুকবার সময় পায় না। তবে বড় একটা অভাব আমার আছে, যথেষ্ট জমি নেই আমার। যদি আরেকটু জমি পাই তা হলে স্বয়ং শয়তানকেও আমি ভয় পাই না।"

চা খাওয়া শেষ করে দু-বোন আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল জামাকাপড় নিয়ে, তারপর চায়ের কাপগুলো ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে গেল শুতে।

এদিকে হয়েছে কি, স্টোভের পেছনে শয়তান কিন্তু সারাক্ষণ ঘাপটি মেরে বসে ছিল। শুনছিল সব কথা। চাষীর বউ-এর কথায় তার স্বামী যখন গর্ব করে বলল যে একবার জমি পেলে স্বয়ং শয়তানও তা কেড়ে নিতে পারবে না, শুনে শয়তান খুশিতে নেচে উঠল।

মনে-মনে সে ভাবল : চমৎকার, এবার তোমাকে নিয়েই একটা খেলা খেলব। আগে তোমাকে অনেক জমি দেব—আর কেড়ে নেব তারপর।

দুই

এই কৃষকের বাড়ির পাশেই বাস করতেন এক মহিলা। তাঁর প্রায় দুশো চল্লিশ একর জমি ছিল। গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে বরাবরই তাঁর ভালো সম্পর্ক। কখনো কারোর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেননি। কিছুদিন হল তিনি তাঁর জমির দেখাশোনা করার জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক নিযুক্ত করেছেন। এই লোকটি নানারকম জরিমানা করে আশপাশের কৃষকদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। পাখম এ-ব্যাপারে দারুণ সতর্ক, তবু কখনো কোনো সময়ে তার একটা ঘোড়া হয়তো ঢুকে পড়ল মহিলার ক্ষেতে, কখনো গোরুটা গেল তাঁর বাগানে, নয়তো বাছুরটা বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল, তাঁর ফসল খেয়ে এল—আর এরকম কিছু ত্রুটি ঘটলেই জরিমানা দিতে হত পাখমকে।

এক শীতকালে চারদিকে গুজব রটে গেল যে এই জমিদার মহিলা তাঁর সব জমি বিক্রি করে ফেলবেন। আরো শোনা গেল এই সমস্ত জমি এবং পাশের বড় রাস্তা সবই নাকি ওই মহিলার ওভারশিয়ার কিনবে। কথাটা কৃষকদের কানে গেলে তারা দুশ্চিন্তায় পড়ল। ভাবল এই লোক যদি

এতবড় জমির মালিক হয়, তা হলে তাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবে, বারবার জরিমানা করে চাষিদের নাজেহাল করে ছাড়বে। অথচ ওই জমির চারপাশেই এদের বসবাস। যেমন করেই হোক জমিটা তারা হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

কাজেই গ্রামের সমিতির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল গেল মহিলার সঙ্গে দেখা করতে। তারা বলল, "আপনার জমি ওভারশিয়ারের কাছে বিক্রি না করে আমাদের কাছে করুন, আমরা আপনাকে বেশি মূল্য দেব।" মহিলা এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। তখন চাষিরা সমিতির নামে সমস্ত জমিটা কিনে নেবার চেষ্টা করল। বিরাট সভা ডাকল তারা, কিন্তু কোনো মীমাংসায় পৌঁছুতে পারল না। আসলে হল কী, অলক্ষ্যে শয়তান সকলের মনে এমনই ধোঁকা দিতে লাগল যে সবাই সবার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলল। কাজেই তারা ঠিক করল, প্রত্যেকেই আলাদাভাবে যার যতটুকু ক্ষমতা সেই অনুযায়ী জমি কিনে নেবে। আর জমিদার মহিলাও এ-প্রস্তাবে রাজি হলেন।

একদিন পাখম জানতে পেল, তাদের এক প্রতিবেশী পঞ্চাশ একর জমি কিনছে অর্ধেক দাম দিয়ে। বাকি অর্ধেক টাকা এক বছর পরে নিতে রাজি হয়েছেন মহিলা। শুনে পাখম ঈর্ষায় ফুলতে লাগল। সে ভাবল, অন্যে যদি সব জমি কিনে ফেলে তা হলে আমি কী করব? বউ-এর সঙ্গে সে আলোচনায় বসল; দ্যাখো, সবাই কিছু-না-কিছু জমি কিনছে। আমাদেরও একর বিশেক জমি কিনে নেয়া উচিত। দিনকালের যা অবস্থা, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করাই একদিন অসম্ভব হয়ে উঠবে। ওভারশিয়ার তো জরিমানা হিসাবেই আমাদের সব কেড়ে নিচ্ছে। ফতুর হওয়ার আগে আমাদের কিছু জমি কিনে রাখা দরকার।

শতখানেক রুবল তাদের আগে থেকেই জমানো ছিল। এবার তারা একটা গাধার বাচ্চা আর অর্ধেক মৌমাছি বিক্রি করল। সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেকেও চাকরিতে পাঠিয়ে ওরা কোনোরকমে জমির অর্ধেক টাকা জোগাড় করে ফেলল।

টাকাগুলো একসঙ্গে নিয়ে তিরিশ একর জমি এবং ছোট একটা বাগান পছন্দ করে পাখম মহিলার কাছে গেল জমি কিনতে। দরদস্তুর ঠিক করে মহিলার হাতে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে এল সে। পরে শহরে গিয়ে একটা দলিল লিখে তাতে সই করে সব পাকাপাকি হলে পাখম অর্ধেক টাকা দিল। কথা হল, জমির বাকি অর্ধেক দাম দুবছর শেষ হবার আগেই দিয়ে দেবে।

এবার সে শ্যালকের কাছ থেকে আরো কিছু টাকা ধার করে বীজ কিনল। সময় হলে কেনা জমিতে বীজ বুনল। ফসল হল প্রচুর। কাজেই এক বছরের মধ্যেই সে জমিদার মহিলার টাকা আর শ্যালকের দেনা দুই-ই শোধ করে দিল। ব্যস! পাখম হয়ে উঠল জমির মালিক। এখন সে নিজের জমিতে বীজ বোনে, ফসল কাটে, নিজের জমিতে ঘোড়া-গোরু নিয়ে ঘাস খাওয়ায়। আজকাল চাষ করতে, ফসল তুলতে কিংবা বাগানের অবস্থা দেখতে যখনই সে ঘোড়ায় চড়ে নিজের জমিতে যায়, আনন্দে মন তার ভরে ওঠে। নিজের জমির ঘাসগুলোকে পর্যন্ত মনে হয় অন্য ঘাসের চেয়ে আলাদা; এখানে ফুলগুলোও যেন অন্যভাবে ফোটে। কত দিনই তো পাশ দিয়ে যেতে-যেতে জমি দেখেছে সে, এই জমি; জমির মাটি আজকের মতো ভালো তার কোনোদিনই লাগেনি।

তিন

এভাবে পাখমের দিনকাল বেশ সুখেই কাটছিল। আর কাটতও চিরকাল যদিনা চারদিকের কৃষকেরা তার ওপর উৎপাত শুরু না করত। মেষপালকের মেষের দল ঢুকে পড়ে তার বাগানে, রাতের বেলায় তাদের ঘোড়া ফসলের ক্ষেতে ঢুকে নষ্ট করে পাখমের সোনার ফসল। কতবার সে তাদের শান্তভাবে সাবধান হতে বলেছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! একসময় তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। পাখম

জেলা-আদালতে গিয়ে নালিশ দিয়ে এল। সে জানত, ছোট চাষিরা জমির অভাবেই এ-কাজ করে, তার ক্ষতি করবার জন্য নয়। কিন্তু কতদিন আর এই অবস্থা চলতে দেয়া যায়! মাঠের ফসল খেয়ে ওরা যে সব তছনছ করে দিল! একটা শিক্ষা অন্তত রাখালদের দেয়া উচিত।

এই ভেবে সে প্রথমে তাদের একজনের বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশ দিয়ে এল। জরিমানা হল তার। তারপর আরো একজনের জরিমানা দিতে হল। কিন্তু ফল হল উলটো। সবাই পাখমের ওপর চটে গেল এবং প্রতিবেশীরা এবার ইচ্ছে করেই তার ফসল চুরি করতে আরম্ভ করল। একরাত্রে কে যেন বাগানে ঢুকে প্রায় দশটার মতো লিন্ডেন গাছ গোড়াসুদ্ধ উপড়ে রেখে চলে গেল। পরদিন বাগানের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ব্যাপারটা দেখে কালো হয়ে গেল পাখমের মুখ। আরো কাছে গিয়ে দেখে, একটা ঝোপের সবক'টা গাছ শেকড়সমেত ওপড়ানো, একটা গাছ যদিও-বা খাড়া হয়ে আছে কিন্তু তার সব ডালপালা ছাঁটা। পাখম তো রেগে আগুন। সে মনে-মনে বলল, উহ্! যদি জানতে পারতাম কে এ কাজ করেছে একবার দেখে নিতাম তাকে! সেই থেকে পাখম ভাবতে লাগল, লোকটা কে হতে পারে। একসময় তার মনে পড়ল সাইমনের কথা। সাইমন ছাড়া এ-কাজ কেউ করতে পারে না। তখন সে গেল সাইমনের কাছে—কিন্তু গাছের কোনো চিহ্ন তার বাড়িতে পাওয়া গেল না। বৃথাই ঝগড়া করে পাখম ফিরে এল। ঘরে এসে তার স্পষ্ট ধারণা জন্মাল যে এ-কাজ সাইমনেরই। তার বিরুদ্ধে পাখম মামলা ঠুকে দিল।

বিচার হল। কিন্তু সাইমনের বিরুদ্ধে সঠিক প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে গেল সে। ফলে আরো রেগে গেল পাখম। তার মনে হল সবাই মিলে পাখমের ওপর অবিচার করতে শুরু করেছে। ভয়ানক রেগে সে হাকিমকে বলল, 'বাবুরা, আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই চোরদের যোগসাজশ আছে। নইলে কখখনো এভাবে সাইমনকে ছেড়ে দিতে পারতেন না।

এভাবে হাকিম থেকে শুরু করে আশপাশের সবার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে পাখম একা-একা নিজের জমিতে বাস করতে লাগল। আগে সবাই তাকে ভালোবাসত। এখন সে অনেক জমির মালিক। তবু মানুষ আগের মতো তাকে আর ভালোবাসে না।

সেই সময় চারদিকে শোনা গেল, অনেক চাষি রাশিয়ার এই অঞ্চল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। পাখম ভাবল, জমি ফেলে আমার কোথাও যাবার দরকার নেই। যদি অন্যেরা যায়, ভালোই তো, আমার আরো জমি হবে। তাদের জমিগুলো আমি কিনে নিতে পারব। তখন চারদিকে সবই হবে আমার জমি। আমি আরো আরামে থাকতে পারব। এতটুকু জমির মধ্যে বড় আঁটাআঁটিতে বাস করতে হচ্ছে আমাকে।

বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। পাখম তখন বাড়িতে, এমন সময় একজন পথিক কৃষক এসে হাজির হল। কৃষকটির বাড়ি অন্য গ্রামে। পাখম তাকে রাতের জন্য আশ্রয় দিল, খেতেও দিল। রাত্রে তার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। পাখম জিজ্ঞেস করল, সে কোত্থেকে এসেছে। জবাবে লোকটি বলল, "আমি এসেছি ভলগা নদীর ওপার থেকে। সেখানে আমি কাজ করি।"

লোকটা আবার বলল, "সেখানে নতুন একটি বসতি গড়ে উঠছে। যে-কেউ গিয়ে সমিতিতে নাম লেখালেই তাকে ওরা বিশ একর করে জমি দিচ্ছে। আর সে-জমিও এত ভালো যে ফসল বুনতে-না-বুনতেই তা ঘোড়ার মতো বড় হয়ে ওঠে। একবার এক গরিব চাষি সেখানে গেল, সে এত গরিব যে খেটে খাবার দুখানা হাত ছাড়া তার আর কোনো সম্বল ছিল না। অথচ এবার সে একশো একর জমিতে শুধু গমই ফলিয়েছে। গত এক বছরে একমাত্র গম বেচেই লোকটি পাঁচ হাজার রুবল পেয়েছে!

শুনে পাখমের মন উতলা হয়ে উঠল। ভাবল, এমন আয়-রোজগার যদি সেখানে করতে পারি, তা হলে এখানে এমন গরিবের মতো কুঁকড়ে পড়ে থাকি কেন? জমি-বাড়ি সব বিক্রি করে আমিও সেই দেশে যাব। সেখানে নতুন বাড়ি বানাব, আর চাষের জমি করব অনেক। এখানে তো দুঃখকষ্ট লেগেই আছে। অবশ্য জায়গা-জমি বেচার আগে সেই জায়গাটা দেখে আসতে হবে আমাকে।

একটু-একটু গরম পড়তেই পাখম সেই নতুন দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে জাহাজে চড়ে ভলগা নদী দিয়ে সে পৌঁছুল সামারা অঞ্চলে। তারপর সেখান থেকে তিনশো মাইল পথ পায়ে হেঁটে পাখম পৌঁছুল সেই নতুন দেশে।

লোকটি যা বলেছিল তার সবই সত্যি। সমিতি প্রত্যেককে বিশ একর করে জমি বিলি করছে। সে-জমিও অতি চমৎকার। সমিতি তাকে আরো খবর দিল যে বিশ একর জমি ছাড়াও কেউ ইচ্ছা করলে অল্প দামে যত খুশি জমি কিনতে পারে। জমির দাম একর প্রতি মাত্র তিন রুবল।

সবকিছু জেনে পাখম বাড়ি ফিরে এল হেমন্তকালে। এসেই সব বিক্রি শুরু করল। জমি, বাড়ি, ফসল সবই পাখম ভালো দামে বেচতে পারল। তারপর বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে একদিন সবাইকে নিয়ে নতুন দেশে রওনা হয়ে গেল।

চার

নতুন গ্রামে পৌঁছুলে সঙ্গে-সঙ্গে পাখমকে সেই গ্রামের সমিতির একজন সভ্য করে নেয়া হল। মাথাপিছু হিসেবে প্রায় একশো একর জমি দেয়া হল তাকে। এ ছাড়া গোরু-ঘোড়ার খাওয়াবার জন্য আলাদা ঘাসের জমিও পেল কিছু। মনের খুশিতে নতুন ঘরবাড়ি তৈরি করে ফেলল পাখম। কেননা আগে যা ছিল তার চেয়ে দশগুণ বেশি ধনী সে এখন। চাষের জন্য কিংবা গোরু-ঘোড়া চরাবার জন্য জমির কোনো অভাব নেই। যত ইচ্ছে গরু-ঘোড়া এখন পুষতে পারে সে।

প্রথম-প্রথম পাখমের কাছে সবকিছুই মনে হয়েছিল চমৎকার। পাকা বাড়ি, তকতকে ঝকঝকে ঘর, প্রচুর জমি, ভালো-ভালো ঘোড়া আর গোরু। কিন্তু একটু পা ছড়িয়ে বসবার পরে তার আবার মনে হতে লাগল যে জায়গা বড় কম।

গমচাষের সাধ জাগলেও গমচাষের মতো প্রচুর জমি তার নেই। গম জন্মায় ঘাসজমি, নতুন জমি কিংবা একবার চাষের পর বছর দুএক ফেলে-রাখা জমিতে।

প্রথম বছর পাখম তার জমিতে গম বুনে চমৎকার ফসল পেল। পরের বছরও সে গম বুনতে চাইল। কিন্তু তার এত জমি ছিল না যে গত বছরের ফসলের জমি দুবছর ফেলে রেখে নতুন জমিতে ফসল বুনবে। কাজেই আরো জমি লিজ নিয়ে গম বুনল। গম হল প্রচুর কিন্তু সে-জমি বাড়ি থেকে এত দূরে যে ফসল বয়ে আনতে অনেক কষ্ট হল তার।

এর পরও সে নতুন-নতুন জমি লিজ নিয়ে তাতে গম বুনে পাঁচ বছর কাটিয়ে দিল। ভাগ্য তার খুব ভালো। প্রত্যেকবার সে প্রচুর ফসল পেল। অনেক অর্থ জমল পাখমের।

একবার সে কয়েকজন চাষিকে নিয়ে এক মহাজনের বিশাল জমিতে গম চাষ করল। এদিকে সেই জমি নিয়ে এক মামলায় হেরে গেল মহাজন। ফলে সমস্ত খাটুনিটাই বরবাদ হয়ে গেল। জমিটা নিজের হলে পাখমের এই ক্ষতিটা হত না।

সেই থেকে পাখম আরো জমি কেনার ধান্দা করতে লাগল। এক কৃষকের সঙ্গে এক হাজার একর জমির দামদরও প্রায় ঠিক হয়ে এল। এমন সময় এক বিদেশী তার ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দেবার আশায় এসে উঠল পাখমের বাড়িতে। চা পান করতে-করতে বিদেশী লোকটি বলল, "অনেক-অনেক দূরের বাসকিরদের দেশ থেকে আমি এসেছি। বাসকির হল বেদের জাত—এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। সেখানে আমি এক হাজার রুবল দিয়ে দশ হাজার একর জমি কিনেছি।"

কৌতূহলী হয়ে পাখম তাকে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করল। লোকটি বলল, "তোমাকে শুধু ওদের সর্দারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। তা হলেই তোমাকে আর পায় কে! আমি তো কিছু কাপড়চোপড়, কার্পেট আর এক বাক্স চা মিলিয়ে শতখানেক রুবল উড়িয়েছি, কিছু ভদকা খাইয়েছি। তাতেই ওরা খুশি হয়ে একর প্রতি জমি মাত্র আট কোপেকে দিয়ে দিয়েছে।"

বিদেশী লোকটি তার দলিলপত্র দেখিয়ে আবার বলল, "জমিগুলো সব নদীর ধারে। চারদিক খোলা। এর আগে কেউ কোনোদিন সে-জমিতে চাষ করেনি। আর তা ছাড়া সেখানকার মানুষগুলো একেবারে ভেড়ার মতো সরল। আপনি অনায়াসে যে-কোনো জিনিস তাদের কাছ থেকে বাগিয়ে নিতে পারবেন।"

পাখম ভাবল : সেখানে গিয়ে আমি যদি সহজেই জমিদার হয়ে উঠতে পারি, তা হলে এখানে জমি কিনব কেন?

পাঁচ

বিদেশী লোকটির কাছ থেকে পথঘাট জেনে নিয়ে পাখম যাবার জন্য তৈরি হল। স্ত্রী-পুত্র সব রেখে গেল জমিজমা, ঘরবাড়ি দেখাশোনা করতে। সঙ্গে একজন চাকর নিয়ে পাখম হাজির হল এক শহরে। এখান থেকে এক বাক্স চা, কিছু মদ আর বেশকিছু টুকিটাকি জিনিস কিনল বাসকির সর্দারদের উপহার দেবার জন্য।

সেখান থেকে আবার ওরা যাত্রা শুরু করল, প্রায় তিনশো মাইলের বেশি পথ পার হয়ে সাত দিনের দিন সে বাসকিরদের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হল।

এদের সম্পর্কে যা-কিছু সে কানে শুনেছিল তার সবই ঠিক। খোলা প্রান্তরের ভেতর দিয়ে যে-

নদীটা বয়ে চলেছে, তারই ধারে-ধারে চামড়ার ছাউনি দেয়া তাঁবুতে ওরা বাস করে। জমি তারা চাষ করে না, কোনো ফসলও খায় না। খোলা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে গোরু-মহিষ আর কোসাক ঘোড়ার দল। ঘোড়ার বাচ্চাগুলো বেঁধে রেখেছে তাঁবুর পেছনে। দিনে দুবার করে মা-ঘোড়াকে তাড়িয়ে আনা হয় বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে। বাসকিরদেরও প্রধান খাদ্য এই ঘোড়ার দুধ। লোকগুলো ঘোড়ার দুধ দিয়ে কুমিস নামে একরকমের পানীয় তৈরি করে। কুমিস থেকে আবার তৈরি হয় পনির। তারা কুমিস আর চা পান করে, ভেড়ার মাংস খায় আর মনের আনন্দে বাঁশি বাজায়। লোকগুলোর স্বাস্থ্য খুব ভালো, সবসময় হাসি-তামাশায় মশগুল, বছরের অর্ধেকটা সময় তারা শুয়ে-বসেই কাটায়। লেখাপড়া কেউ জানে বলে মনে হয় না, রুশভাষা তো একজনও বোঝে না। তবে মানুষ হিসেবে তারা খুবই সরল। অন্তরগুলো দয়ায় ভরা।

পাখমকে দেখেই তারা দলে-দলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে তার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। একজন দোভাষী এল পাখমের কথাবার্তা বুঝিয়ে দিতে। ওরা বুঝতে পারল পাখম এসেছে কিছু জমি কেনা যায় কি না তা-ই দেখতে। এ-কথা শুনে লোকগুলো ভারি খুশি হয়ে পাখমকে বুকে জড়িয়ে ধরল। পাখমকে তারা সবচেয়ে বড় তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেল। সবচেয়ে ভালো জায়গায় তাকে বসিয়ে নিজেরা বসল তার চারদিক ঘিরে। চা এল, কুমিস এল, একটা ভেড়াও জবাই হল পাখমের জন্য। পাখম তার উপহারের জিনিসগুলো বের করে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিল। বাসকিরদের সে কী আনন্দ! নিজেদের ভেতর কী যেন বলাবলি করে তারা দোভাষীকে ডাকল।

দোভাষী তখন পাখমকে বুঝিয়ে বলল : এরা বলছে যে তুমি এসেছ বলে বাসকিররা খুব খুশি হয়েছে। এদের রীতি হল কোনো উপহার পেলে তার বিনিময়ে যে-কোনো উপায়ে অতিথির আশা পূরণ করা। তুমি অনেক কিছু এনে এদের উপহার দিয়েছ। এখন এরা জানতে চাইছে, তুমি এদের

কোন জিনিস সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো। তুমি যা চাইবে তা-ই তোমাকে দেয়া হবে।

পাখম বলল, "এখানে এসে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তোমাদের জমি। যেখান থেকে আমি এসেছি, সেখানে জমির বড় অভাব। আর যাও-বা আছে, তাতে ভালো ফসল ফলে না। তোমাদের জমির তুলনা মেলা ভার। এত ভালো জমি এর আগে কখনো দেখিনি আমি।"

দোভাষী তার কথাগুলো বাসকিরদের বুঝিয়ে দিল। বাসকিররা আবার কিছুক্ষণ আলোচনা করল নিজেদের ভেতর। পাখম তাদের কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারছিল না। অবশ্য তাদের হোহো-করা তুমুল হাসি দেখে বোঝা যাচ্ছিল পাখমের ওপর তারা সন্তুষ্ট।

বেশ কিছুক্ষণ পর তাদের আলোচনা থামলে দোভাষী পাখমকে বলল, "তোমার সদয় ব্যবহার আর সুন্দর উপহারের পরিবর্তে এরা তোমাকে জমি দিতে রাজি হয়েছে। তোমার যত জমি দরকার ততটুকুই পাবে।"

এই সময় লোকগুলো আবার যেন কী নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু করে দিল। পাখম দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "ওদের কেউ-কেউ বলছে, তোমাকে জমি দেবার আগে একবার সর্দারকে বলে নেয়া উচিত। তাকে না-জানিয়ে কিছু করা ঠিক হবে না। অন্যেরা বলছে সর্দারকে জানাবার কোনো দরকার নেই।"

ছয়

ওদের তর্কাতর্কির মাঝে শেয়ালের চামড়ার লম্বা টুপি পরা একটা লোক সামনে এসে দাঁড়াল। দোভাষী পাখমকে বলল, "ইনিই হচ্ছেন আমাদের সর্দার।"

সঙ্গে-সঙ্গে পাখম সবচেয়ে সুন্দর একটা জামা আর সের-পাঁচেক ভালো চা সর্দারকে উপহার দিল। সর্দার হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন সেসব। তারপর তিনি তাঁর আসনে বসলে বাসকিররা সমস্ত ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বলল। তাদের কথা শুনে সর্দার হাতের ইশারায় সবাইকে বসতে বললেন। হাসিমুখে তিনি রুশভাষায় পাখমকে বললেন, "বেশ, তুমি যা চাও তা-ই হবে। কোন জমিটা তোমার পছন্দ আমাদের দেখিয়ে দাও। আমাদের জমির কোনো অভাব নেই।"

পাখম মনে-মনে ভাবতে লাগল : যতটা সম্ভব জমি আদায় করে নিতে হবে। আর লেখাপড়া করে পাকাপাকিভাবে নেয়া উচিত। তা না হলে আজ দিচ্ছে, কাল যদি আবার কেড়ে নেয়!

এরকম ভাবনার পর সে সর্দারকে বলল, "আপনার দয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের জমির কোনো অভাব নেই, তার মাঝ থেকে সামান্য একটু মাত্র চাইছি। কোন জমিটুকু আমার হবে সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই। জমি মেপে আমাকে লেখাপড়া করে দেয়া যাবে কি হুজুর? মানুষের মরা-বাঁচা ঈশ্বরের হাতে। আপনারা দয়ালু বলেই আমাকে এ-জমি দিতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু দুদিন পরে আপনাদের ছেলেমেয়েরা আবার সেটা কেড়েও তো নিতে পারে!"

সর্দার সরল মানুষ। তিনি বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। লেখাপড়া করেই তোমাকে দেব।"

পাখম এবার সেই বিদেশী লোকটির কথা তুলে বলল, "তাকেও তো আপনারা শহুরে পাকা দলিল করে জমি দিয়েছেন। দয়া করে আমার বেলায়ও সেরকম করুন।"

এবার সর্দার পাখমের মনের কথাটি ধরতে পারলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। আমাদের এখানে একজন মুনশি থাকেন। সে-ই শহরে গিয়ে তোমার দলিলের ব্যবস্থা করে দেবে।"

"আমাদের এখানে জমির দাম দিন-প্রতি এক হাজার রুবল মাত্র।" 'দিন-প্রতি' কথাটা পাখম বুঝতে পারল না। তাই সে আবার জিজ্ঞেস করল, "'দিন-প্রতি' এটা আবার কেমন মাপ? একদিনে কত একর জমি হবে?"

"জমির মাপজোখ আমরা বাপু তেমন জানি না। তাই দিনের হিসেবে আমরা জমি বিক্রি করি। অর্থাৎ একদিনের মধ্যে তুমি যতটা জমি ঘুরে আসতে পারবে তার সবটাই তোমার। এই হচ্ছে আমাদের জমির মাপ, আর তার দাম হল এক হাজার রুবল।"

পাখম অবাক হয়ে বলল, "বলেন কী! একদিনে তো গোটা একটা জেলা ঘুরে আসা যায়!"

সর্দার হেসে ফেললেন। বললেন, "তা হলে একটা জেলার সমান জমিই তোমার হবে। তবে হ্যাঁ, একটা শর্ত আছে। যেখান থেকে সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তুমি রওনা হবে, সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে যদি ঠিক সেখানে ফিরে আসতে না পারো তবে তোমার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।"

পাখম আবার জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, কতটা আমি গিয়েছি তার চিহ্ন রাখব কেমন করে?"

"কেন, আমরা তোমার সঙ্গেই থাকব! পছন্দমতো তুমি যেখান থেকে যাত্রা শুরু করবে—আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকব আর তুমি হাঁটা শুরু করলে আমার কয়েকটি যুবক ঘোড়ায় চড়ে তোমার পিছে-পিছে যাবে। তুমি যেখানে-যেখানে বলবে সেখানেই তারা একটি করে খুঁটি পুঁতবে। তারপর সেই খুঁটি-বরাবর লাঙল চালিয়ে দাগ দেয়া হবে। শুধু সূর্যাস্তের আগেই তোমাকে যাত্রা শুরুর জায়গায় ফিরে আসতে হবে। যতটা জমি তুমি ঘুরে আসতে পারবে সবটাই হবে তোমার।"

মনের খুশিতে পাখম যেন ফেটে পড়ছিল। ঠিক হল, আগামীকাল খুব ভোরে পাখম যাত্রা শুরু করবে।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে তারা সকলে মিলে পান করল কুমিস, গরম ভেড়ার মাংস আর ধোঁয়া-ওঠা চা। খাওয়াদাওয়ার উৎসবশেষে পাখম শুতে গেল। আহ্! কী সুন্দর নরম পাখির পালকের উষ্ণ বিছানা!

অন্যেরাও শোবার জন্য চলে গেল। কথা হল, আগামীকাল সূর্যাস্তের আগেই নদীর ধারের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সবাই এসে জমায়েত হবে।

সাত

সারারাত পাখমের চোখে ঘুম এল না। সারারাত কেটে গেল কেবল জমির স্বপ্ন দেখে, নতুন জমির ভাবনা ভেবে। শুয়ে শুয়েই ও ভাবতে লাগল : খুব বড় একটা চক্কর দিয়ে ফিরে আসতে হবে। সারাদিনে অন্তত পঁয়ত্রিশ মাইল হেঁটে আসতে পারব। আর পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে জমির পরিমাণ বিশ হাজার একরের কম হবে না। তখন আর আমাকে পায় কে! এর ভেতর যে-জমি একটু খারাপ হবে সে-জমি বিক্রি করে ফেলব, ভালো জমিগুলো অবশ্য নিজেই চাষ করব আমি। এত জমি চাষের জন্য দুটো বলদ কিনতে হবে। আর রাখতে হবে গোটাদুয়েক চাকর। কিছু জমি ফেলে রাখতে হবে ঘাস জন্মাবার জন্য—গোরু-ঘোড়াও তো পালতে হবে!

সারারাত পাখম দুচোখের পাতা এক করতে পারল না। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রামতো এল। সঙ্গে-সঙ্গে সে স্বপ্ন দেখল একটা। সে যেন একটা তাঁবুতে শুয়ে-শুয়ে শুনতে পাচ্ছে বাইরে কে-একজন বেদম হাসছে আর কথা বলছে। কে এমন করে হাসছে দেখবার জন্য সে তাঁবুর বাইরে এসে দেখল, মাটির ওপর বসে আছেন সর্দার। বুকের দুপাশ চেপে ধরে সর্দার এমন করে হাসছেন যেন তাঁর পেট ফেটে যাবে। স্বপ্নের মধ্যেই পাখম হেঁটে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এত হাসছেন কেন?" কিন্তু ভালো করে চেয়ে দেখতেই পাখম বুঝতে পারল, লোকটি সর্দার নয়। এ তো সেই বিদেশী লোক যে তাকে পরামর্শ দিয়ে এখানে এনেছে। পাখম তাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, "কিছুদিন আগে আপনি আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন না?" ঠিক তখনই লোকটির চেহারা আবার বদল হয়ে গেল। পাখম দেখল এ যেন সেই প্রথম লোক যে ভলগা নদীর ওপার থেকে

তার কাছে গিয়েছিল। পাখম আবার জিজ্ঞেস করতে গেল, "কীভাবে সে এখানে এল—কিন্তু লোকটির চেহারা আবার বদলে গেল, পাখম দেখল, এ-লোকটি মানুষ নয়, এ হচ্ছে স্বয়ং শয়তান। মাথায় তার শিং আর পায়ে জন্তুর মতো খুর। মাটিতে বসে হাসতে-হাসতে কিসের দিকে যেন সে একভাবে তাকিয়ে আছে—আর হাসছে। স্বপ্নের ভেতরেই পাখম কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল, একটা লোক। তার পা খালি। পরনে পায়জামা, গায়ে শুধু একটা শার্ট—চিত হয়ে মরে পড়ে আছে। তার মুখ কাগজের মতো শাদা। মরা লোকটিকে ভালো করে দেখতে পাখম এগিয়ে গেল। দেখল মৃত লোকটি আর কেউ নয়—সে নিজেই। স্বপ্নে এইসব দেখে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে পাখম জেগে উঠল। তার মনে হল : কী আজব স্বপ্নই-না মানুষ ঘুমের ঘোরে দেখে! জানালা দিয়ে পুবের দিকে চাইতে সে দেখল ভোরের প্রথম আলো ঘরে উঁকি দিচ্ছে।

না, আর কুঁড়েমি করা চলে না, যাত্রা শুরু করতে হবে এখনই। বলেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। চাকরকে ডেকে জাগাল এবং গাড়িতে ঘোড়া জুড়তে বলে বাসকিরদের কাছে রওনা হয়ে গেল।

বাসকিররাও ঘুম থেকে উঠে একে-একে তৈরি হয়ে নিল। সর্দার এসে হাজির হলেন। সবাই তারা কুমিস দিয়ে সকালের খাবার খেল। তারা পাখমকেও চা খেতে বলল। কিন্তু তার হাতে আর সময় নেই। বলল, "যদি আমাদের যেতে হয় তো এখনই চলুন। সময় হয়ে গেছে।"

আট

আজ পাখমের স্বপ্ন সফল হওয়ার দিন। সকলের সঙ্গে সে যাত্রা শুরু করল। কেউ গেল ঘোড়ায় চড়ে, কেউ গেল গাড়িতে। খোলা প্রান্তরের মাঝে একটা ছোট পাহাড়ের দিকে সবাই এগিয়ে চলল। এখানে সবাই এসে পৌঁছালে সর্দার পাখমের কাছে এসে চারদিকে হাত ঘুরিয়ে বলল, "এই যে, তোমার সামনে যতদূর দেখতে পাচ্ছ সবটা আমাদের জমি। এই জমির যে-কোনো অংশ তুমি

পছন্দ করে নিতে পারো।" পাখমের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সামনে অফুরন্ত জমি। সমস্ত জমি বুকসমান ঘাসে ভরতি, আর হাতের তালুর মতো সমতল। এই জমি কেউ কোনোদিন চাষ করেনি। উহ্, কী চমৎকার জমি!

সর্দার তার মাথার টুপিখানা খুলে পাহাড়ের ঠিক মাঝখানে রেখে বললেন, "এই হল তোমার চিহ্ন। এখান থেকে তুমি যাত্রা শুরু করবে আবার এখানেই ফিরে আসবে। যতটা জমি ঘুরে আসতে পারবে সবটাই তোমার।"

পাখম নোটগুলো বের করে টুপিটার মধ্যে রাখল। গায়ের কোটটা খুলে কোমরের বেল্ট শক্ত করে বেঁধে নিল। রুটিভরা একটা ঝোলা রাখল জামার নিচে আর বেল্টের সঙ্গে বাঁধল একটা পানির বোতল। তারপর জুতোর ফিতে বেঁধে নিল ভালো করে। এসব হয়ে গেলে সে রওনা দেবার আগে দাঁড়িয়ে ভাবল, 'কোন দিকে যাব? সবদিকে ভালো জমি!' আপনমনে আবার বলে উঠল : 'যেদিকেই যাই-না কেন—কিছু যায় আসে না। বরং আমি হাঁটব সূর্যোদয়ের দিকে।' কাজেই সে পূর্বদিকে চেয়ে সূর্য ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

মনে-মনে ভাবল, এতটুকু সময় আমি নষ্ট করব না। বাতাস ঠাণ্ডা থাকতেই আমাকে সবচেয়ে বেশি পথ হেঁটে নিতে হবে।

তখন সর্দারের লোকেরা ঘোড়ার পিঠে বসে পাখমের সামনে এসে দাঁড়াল। পুব আকাশে সূর্য যেই উঁকি দিয়েছে অমনি পাখম এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

প্রথমে সে খুব স্বাভাবিকভাবে চলতে লাগল। প্রায় হাজারখানেক গজ গিয়ে থামল সে। একটা খুঁটি পোঁতা হল। তারপর আবার চলতে লাগল। আস্তে-আস্তে লম্বা পা ফেলে সে হাঁটার গতি দিল বাড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর থেমে আরেকটি খুঁটি পোঁতা হল।

পাখম এবার পেছনের দিকে তাকাল। পাহাড়ের উপর লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের আলোতে তাদের সবাইকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। পাখম অনুমান করল, মাইল তিনেক পথ সে ছাড়িয়ে এসেছে। একটু-একটু গরম লাগছে তার। গায়ের জামাটা খুলে সে বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নিল। আরো মাইল তিনেক হাঁটার পর থামল সে। এখন সূর্যের তেজটা বেশ গায়ে লাগছে। আকাশের দিকে তাকাল আবার। নাশতা খাওয়ার কথা মনে পড়েছে। মনে-মনে হিসেব করে দেখল, এতক্ষণে দিনের মাত্র চারভাগের একভাগ সময় ব্যয় হয়েছে। এখনই মোড় ফেরাবার দরকার নেই। পায়ের জুতোজোড়া খুলে নিলে বোধহয় হাঁটতে সুবিধে হবে। এই ভেবে সে জুতো খুলে বেল্টের সঙ্গে বেঁধে আবার হাঁটতে শুরু করল। ভাবল : আরো মাইল তিনেক পার হয়ে তারপর বাঁদিকে মোড় ফিরব। এই জমিটা খুবই ভালো মনে হচ্ছে। এরকম জমি ছেড়ে যাওয়া বোকামি হবে। কাজেই আরো কিছুক্ষণ এগিয়ে গিয়ে পাখম পেছনে ফিরে তাকাল। দেখল সেই পাহাড়টা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। উপরের লোকগুলোকে দেখাচ্ছে ছোট-ছোট পিঁপড়ের মতো।

এবার পাখমের মনে ফেরার চিন্তা এল। মনে হল বেড়টা বেশ বড়ই হয়েছে—আর নয়। এবার ফিরতে হবে। ঘাম ঝরছে শরীরে। তেষ্টাও পেয়েছে খুব।

সেখানে আরেকটা খুঁটি পোঁতা হল। বোতল থেকে তৃপ্তিমতো পানি খেয়ে বাঁদিকে মোড় ঘুরে চলতে লাগল। এখানে মানুষসমান উঁচু ঘাস, আর সূর্যের তেজও প্রবল। আস্তে-আস্তে পাখমের ক্লান্তি বোধ হতে লাগল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝল, দুপুর হয়ে গেছে। এখন একটু বিশ্রাম নিতে হবে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই পাখম খানিকটা রুটি খেল এখানে, সঙ্গে-সঙ্গে পানি খেয়ে শুকনো মুখটা ভিজিয়ে নিল। পাখম বসল না। তার ভাবনা হল, একবার বসলেই শুতে ইচ্ছে করবে, আর

এই ক্লান্ত শরীরে একটু শুলেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। কাজেই ওভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খানিক বিশ্রামের পর পাখম আবার চলতে শুরু করল। প্রথমদিকে তার হাঁটতে তেমন অসুবিধা হল না, খাবার খেয়ে সে শরীরে কিছুটা হলেও জোর ফিরে পেয়েছিল। অথচ ওদিকে সূর্য আরো প্রখর হয়ে উঠেছে, একটু হেলেও গেছে পশ্চিমের দিকে। গরমে তার শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে, যেন দেহটা এবার অবশ হয়ে যাবে। কিন্তু থামলে চলবে না। এখন একটা ঘণ্টা কষ্ট করলে বাকি জীবনটা সুখ আর ঐশ্বর্যে ভরে উঠবে।

হাঁটার পথটাকে গোলাকার রেখে মাইল-ছয়েক হাঁটার পর বাঁদিকে বাঁক নেবে, গন্তব্যের কাছাকাছি চলে যাবে—ঠিক এমনি সময়ে পাখমের চোখে পড়ল একটু ভেজা-ভেজা সুন্দর এক টুকরো জমি। এটুকু ছেড়ে গেলে সারাজীবন দুঃখ রয়ে যাবে। নাহ্, কখখনো এ জমি ছেড়ে যাওয়া যায় না! কাজেই বেশ অনেকটা পথ হেঁটে সে পুরো জলা জায়গাটা ঘুরে এল। একটা খুঁটি পুঁতে পাহাড়ের দিকে তাকাল লোকগুলো একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, ওই পথ সাত-আট মাইলের কম হবে না।

পাখমের মনে হল; জমির পাশগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন কোনা-বরাবর হেঁটে পথ সংক্ষিপ্ত করতে হবে। কাজেই এবার সে খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগল। সূর্য অনেকখানি হেলে পড়েছে। এদিকে চারকোনা জমির তৃতীয় লাইনের অর্ধেকও সে ছাড়াতে পারেনি। পাহাড় এখনো দশ মাইলের কম হবে না।

নাহ্, জমিটার আকার যদিও তেকোনার মতো হয়ে যাচ্ছে, তবুও এভাবেই হাঁটতে হবে। আমার অনেক জমি হয়ে গেছে। পথে আশপাশের নতুন জমি নেবার আর-কোনো চেষ্টা করব না। তাড়াতাড়ি একটা গর্ত করে পাখম সোজা এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে।

নয়

কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে—কিন্তু হাঁটতে বড় কষ্ট পাচ্ছে সে। একে তো ভীষণ গরম, তারপর খালিপায়ে হাঁটতে গিয়ে নানা জিনিসের সঙ্গে হোঁচট খেতে-খেতে কেটে ছিঁড়ে খুবই যন্ত্রণা করছে। পা দুটো যেন আর দেহের ভার বইতে পারছে না। একটু বিশ্রাম করতে দারুণ ইচ্ছে তার অথচ সামান্য বিশ্রাম নিলেও পাখম সূর্যডোবার আগে পাহাড়ে পৌছাতে পারবে না। সূর্য কারো মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। ডুববার সময় হলে সে ডুবতেই থাকে।

পাখমের মনে হতে লাগল, কে যেন গাড়ির চালকের মতো তাকে চাবুক মেরে-মেরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। টলতে-টলতে সে এগুতে লাগল।

মনে তার ভাবনা এল : তবে কি হিসেবে আমার কোনো ভুল হয়ে গেছে! এখনো কত পথ পড়ে রয়েছে, অথচ শরীর মরে যাচ্ছে। তবে কি আমার সব অর্থ, পরিশ্রম, আকাঙ্ক্ষা বৃথা হবে? হায় ঈশ্বর! বেশি করে জমি নিতে চেয়ে কী ভুলই-না করেছি আমি! এখন পাহাড়ে পৌছাতে দেরি হলে আমার কী উপায় হবে?

পাখম একবার তাকায় সূর্যের দিকে, একবার পাহাড়ের দিকে। এখনো অনেক দূরে পড়ে আছে সে। মনে একটু জোর তৈরি করে সে দৌড়াতে শুরু করল। পা ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে তবু সে দৌড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, প্রাণপণ শক্তিতে সে দৌড়াচ্ছে। গায়ের কোট জামা জুতো খুলে সে ছুড়ে ফেলে দিল। ফেলে দিল পানির বোতল, এবং মাথার টুপি। 'হায়, সবকিছু দেখে আমি কত খুশিই-না হয়েছিলাম! এখন বেশি পেতে চেয়ে সবই যে হারালাম! সূর্যাস্তের আগে কিছুতেই আমি পৌছাতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। হায়, হায় আমার কী উপায় হবে?'

দারুণরকম ভয় পাওয়ার ফলে তার দমও ফুরিয়ে গেল। তবু হাঁপাতে-হাঁপাতে দৌড়াল পাখম।

তার জামা-পাজামা ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেছে। মুখের ভেতরটা গেছে শুকিয়ে। কে যেন বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটাচ্ছে। পা দুটো আর একেবারেই দেহের ভার সইছে না, মনে হচ্ছে ও-দুটো তার নিজের পা নয়। মনে হচ্ছে, মৃত্যু যেন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে এলেও তো পাখমের উপায় নেই! এতদূর এসে থামলে সবাই তাকে বোকা বলবে!

অতএব দৌড়ানো দরকার। পাখম দৌড়াচ্ছে। দৌড়াতে-দৌড়াতে পাখম হঠাৎ বাসকিরদের চিৎকার শুনতে পেল। ওদের চিৎকার শুনে পাখমের শরীর উত্তেজিত হয়ে উঠল। শেষ শক্তিটুকু একত্র করে সে দৌড়াতে লাগল সামনে—আরো সামনে!

সূর্য তখন অনেক নেমে গেছে। আর তার রং হয়েছে টকটকে লাল।

সূর্য যেমন ডুববে-ডুববে করছে—পাহাড়টাও তেমনি অনেক কাছে এসে গেছে। দেখতে পেল পাখম—পাহাড়ের উপর থেকে লোকজন হাত নেড়ে-নেড়ে তাকে ডাকছে। তাকে অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য সবাই উত্তেজিতভাবে আনন্দ প্রকাশ করছে। মাটিতে দেখতে পেল সেই টুপি। টুপির পাশেই সর্দার বসে আছেন। হঠাৎ পাখমের মনে পড়ে গেল সেই স্বপ্নের কথা।

পাখম ভাবল : অন্তত এখন আর আমার জমির অভাব নেই। কিন্তু ঈশ্বর কি আমাকে জমি ভোগ করার সুযোগ দেবেন? আমি যে আর একটুও পারছি না!

পাখম শেষবারের মতো তাকাল সূর্যের দিকে। প্রকাণ্ড বড় সূর্যটা মাটি স্পর্শ করেছে বলে মনে হল। সূর্যের নিচের দিকে অনেকখানি ডুবে গেছে এরই মধ্যে। সে সামনের দিকে ঝুঁকে ছুটতে লাগল। পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছাতেই সব যেন আঁধার হয়ে গেল। সূর্য ডুবে গেছে! পাখম এবার চিৎকার করে উঠল : আহ্ আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল!

গভীর হতাশায় সে থামতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, নিচ থেকে যদিও তার মনে হচ্ছে সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু পাহাড়ের উঁচুতে যারা রয়েছে তাদের কাছে সূর্য হয়তো এখনো অস্ত যায়নি। সে জোরে-জোরে নিশ্বাস নিয়ে পাহাড়টাকে আঁকড়ে ধরে উপরে উঠতেই পাখম দেখতে পেল টুপিটাকে। সর্দার বসে আছেন টুপির সামনে। তিনি কোমরে দুহাত রেখে তেমনই হাসছেন। দেখেই আবার সেই স্বপ্নের কথা পাখমের মনে পড়ল। চিৎকার করে উঠল পাখম। পা দুটো তার একেবারে অবশ হয়ে গেছে। হঠাৎ সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। পড়তে-পড়তেও একবার দুহাত বাড়িয়ে দিল টুপিটার দিকে—টুপিটা সে ছুঁতে পেরেছে!

তখনি সর্দার চিৎকার করে উঠলেন, "শাবাশ ব্যাটা, অনেক জমি তুমি পেয়েছ!" পাখমের চাকর ছেলেটা দৌড়ে এল। মনিবকে তুলতে চেষ্টা করল। পাখমকে কিছুতেই ওঠানো গেল না। সে দেখল পাখমের মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরে পড়ছে। পাখম মরে গেছে!

ভয়ে চিৎকার করে উঠল চাকর ছেলেটা। তখনো সর্দার মাটিতে বসে, দুহাত ঝুলিয়ে আগের মতোই হাসছিলেন। অন্যান্য বাসকিরদের চোখেমুখে বিষাদের ছায়া।

খানিক পরেই সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওকে কবর দাও।' পাখমের চাকর কোদাল তুলে নিয়ে একটা কবর খুঁড়ল। আর তাকে শুইয়ে দেয়া হল সেই কবরে। পাখমের মাথা থেকে পা অবধি কবরে শোয়াতে প্রয়োজন হল মাত্র ছ'ফুট জমি!

ওয়াটারলুর প্রান্তরে

আজকের দিনে ইংরেজিতে একটা প্রবাদই আছে : টু মিট ওয়ানস ওয়াটারলু ইন...। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে, কোনো কাজে অথবা কোনো ঘটনায় নিজের চরম দুর্গতি ডেকে আনা। ওয়াটারলু রণক্ষেত্রেই কিংবদন্তিপ্রায় বীর নেপোলিয়ন শেষ যুদ্ধ করেন। একের পর এক যুদ্ধের দ্বারা যে-নেপোলিয়ন মাত্র বছর-পনেরোর মধ্যে গোটা ইউরোপের মানচিত্র বদলে দিয়েছিলেন সেই তিনি এই ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন। এতবড় পদাতিক এবং অশ্ববাহিনীর সংঘর্ষ ইউরোপের ভূমিতে বড়-একটা হয়নি।

ওয়াটারলুর যুদ্ধ ঠিক দুটো বাহিনীর যুদ্ধ ছিল না। একদিকে প্রবল প্রতাপ ডিউক অব ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী; অন্যদিকে জীবন্ত ইতিহাস নেপোলিয়ন স্বয়ং এবং তাঁর ৭৪,০০০ পরাক্রমশালী ফরাসি সৈন্য। ডিউক অব ওয়েলিংটনের কথাতেই আছে—নেপোলিয়নের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ৪০,০০০ সৈন্যের সমতুল। উপরন্তু নেপোলিয়ন জানতেন যে, এই যুদ্ধে তাঁর না-জিতে উপায় নেই। কারণ ফ্রান্সের সিংহাসনে টিকে থাকতে হলে ইউরোপের এই মিলিত বাহিনীর মেরুদণ্ড চিরকালের মতন ভেঙে দিতে হবে। সেটা অসম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। ছেচল্লিশ বছর বয়সী নেপোলিয়নের জীবনের এটা ছিল ষাট নম্বর যুদ্ধ।

স্থলযুদ্ধে তাঁর উপমা ইতিহাসে সম্ভবত একা তিনিই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, নেপোলিয়ন জানতেন ওয়াটারলুতে পরাস্ত হলে একটি প্রবাদ মিথ্যে হয়ে যাবে। প্রবাদটি হল : নেপোলিয়ন

চাইলে যে-কোনো পরিস্থিতিতে, যে-কোনো বাহিনীর বিরুদ্ধে জিততে পারেন। নেপোলিয়ন নিজেও নিজেকে কিংবদন্তি বলেই মনে করতেন। এবং ওয়াটারলুর যুদ্ধ যে তিনি জিতে উঠতে পারেননি তাও নেহাতই অদৃষ্টের পরিহাস। সেন্ট হেলেনায় বন্দিজীবনে বারংবার এই যুদ্ধ তিনি কল্পনায় লড়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত ওয়াটারলুর পরাজয়কে তিনি যুদ্ধ-পদ্ধতির ভুলের বদলে ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

নেপোলিয়নকেই আমার বারবার মনে পড়েছে ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস শহরের উপকণ্ঠে সবুজ, বিস্তৃত ওয়াটারলু গ্রাম যেন উনবিংশ শতাব্দীর সেই ঐতিহাসিক দিনটিতেই স্তব্ধ হয়ে আছে। গাড়িতে বিশ মিনিটের পথ গেলেই প্রাণোচ্ছল, ঝলমলে, জনাকীর্ণ ব্রাসেলস শহর। অথচ সেই শহরের কোলাহল ওয়াটারলুর ধ্যানভঙ্গ করে না। বেলজিয়াম সরকারও অশেষ যত্নে ওয়াটারলুর সেই আদি, অকৃত্রিম রূপটুকু ধরে রেখেছেন। এমন একটা দিন যায় না, যেদিন কিছু-না-কিছু পর্যটক ওয়াটারলুর ওই সবুজ প্রান্তরে এসে অতীতের নায়কদের উদ্দেশে খানিকটা নীরব প্রার্থনা করে না যান। গ্রীষ্মের মৌসুমে ওয়াটারলু বেলজিয়ানদের আনন্দভ্রমণের উপযুক্ত স্থান। বেড়ানোর আনন্দের সঙ্গে ইতিহাসের এতখানি সান্নিধ্য পাওয়া আর কোথাও সম্ভব কি না জানি না।

খোদ ওয়াটারলুতে পৌঁছানোর বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই বাস থেকে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। একটা সবুজ পাহাড়ের মাথায় একটা অতিকায় সিংহ। সিংহটা লোহার, যে লোহা ওয়াটারলুর যুদ্ধের ভাঙা কামান, গোলা এবং বন্দুকের নল গলিয়ে বানানো। সিংহের এক পায়ের তলায় একটা সত্যিকারের কামানের গোলা। পাহাড়ের চূড়ায় একটা ছ-মিটার উঁচু পাথরের স্তম্ভের ওপর ৪.৪৫ মিটার উঁচু সিংহটিকে মাইল-দুয়েক দূর থেকেও সত্যি রাজকীয় দেখায়। সিংহটির ওজন ২৮ টন। মালিনস শহরের স্থপতি ভ্যান গিলের সৃষ্টি এই সিংহ ইংল্যান্ডে এবং হল্যান্ডে রাজ্যের প্রতিভূ। ২২৮টি সিঁড়ি ভেঙে ৪৯.৫০ মিটার উঁচু পাহাড়টায় উঠে স্তম্ভের গায়ে শুধু একটা তারিখ পড়তে পেলাম। সে-তারিখ ইতিহাস কখনো ভুলবে না—১৮ জুন, ১৮১৫ সন। সে-তারিখে নেপোলিয়নের বিশ্বজয়ী বাহিনীর গৌরব লুপ্ত হয় ওয়াটারলুর প্রান্তরে।

ওয়াটারলুর সিংহকে যে-ছোট্ট পাহাড়ের চূড়ায় বসানো হয়েছে সে-পাহাড়টি কিন্তু আসল পাহাড় নয়। ওয়াটারলুর যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটনের পাশাপাশি যে-ওলন্দাজ রাজকুমার প্রিন্স অব অরেঞ্জ তাঁর ২৮,০০০ বেলজিয়ান এবং ওলন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন তিনি আহত হয়ে যেখানে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান সেখানেই ১৮২৬ সালে এই নকল পাহাড়টি সাজিয়ে তোলা হয়। শোনা যায়, বেলজিয়ামের সিয়েজ নগরের মহিলারা পিঠে করে মাটি এনে-এনে এই পাহাড় বানাতে সাহায্য করেছিলেন। এই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালে আজও ওয়াটারলুকে ঠিক সেইভাবেই দেখা যায় যেমনটি কিনা যুদ্ধের দিনে নিকটের এক চূড়া থেকে দেখছিলেন ডিউক অব ওয়েলিংটন। যুদ্ধে নেপোলিয়নের হেরে যাবার একটা কারণও ছিল মিত্রশক্তির এই সুবিধাজনক অবস্থান। উপরন্তু যুদ্ধের আগের দিনটায় বৃষ্টি হয়ে মাঠ বেশ পিছল হয়ে গিয়েছিল। নেপোলিয়নের রণক্লান্ত সৈন্যরা তাতে রীতিমতো বেগ পেয়েছিল। এবং ভোরের সময়টায় যে প্রথম আঘাত হানলে মিত্রপক্ষ ভয়ঙ্কর কোণঠাসা হয়ে পড়ত সেটাও সম্ভব হয়নি মাঠের ভেজা অবস্থার জন্য। সেন্ট হেলেনায় বসে নেপোলিয়ন নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেননি এই অনিচ্ছাকৃত দেরিটুকুর জন্য। কারণ নেপোলিয়নের অভিধানে 'অসম্ভব' কথাটা নাকি কখনো লেখা ছিল না।

ওয়াটারলুর প্রান্তরের যেটা মুখ্য আকর্ষণ তা হল একটা গম্বুজাকৃতি বাড়ি যার ভেতরে গোলভাবে দেয়াল জুড়ে ছবিতে-ছবিতে ছড়িয়ে রাখা আছে ওয়াটারলুর যুদ্ধের একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত।

বড় জাতের শিল্পীদের দিয়ে আঁকানো ওই দেয়ালচিত্রটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দেখতে হয়। একেবারে সামনের মানুষগুলো প্রমাণ সাইজের। তাদের ঘোড়ার মাপও জ্যান্ত ঘোড়ার মাপের। এবং ছবিটা যেখানে গিয়ে মাটিতে মিশেছে সেখানে বালির আস্তরণের ওপর ছড়ানো আছে ওয়াটারলুর যুদ্ধের প্রকৃত বন্দুক, ছোট কামান, তলোয়ার, ছোরা কিংবা শিরস্ত্রাণ। একটা ভয়াবহ যুদ্ধের পরিবেশ সেই বিশাল গম্বুজাকৃতি ঘরটায়। ভালো করে দেখলে দেখা যায়, দূরে নেপোলিয়ন যুদ্ধ পরিচালনা করছেন তাঁর 'দেজিরে' নামের শাদা ঘোড়ায় চেপে। অন্য প্রান্তে ফরাসি সেনাপতি মার্শাল নে'র অশ্ববাহিনীর তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করতে নির্দেশ দিচ্ছেন ডিউক অব ওয়েলিংটন। এবং অন্য এক অঞ্চলে ফরাসি পদাতিকদের গোলাবর্ষণের মুখে নাজেহাল হয়ে মিত্রপক্ষের একাংশ নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। যুদ্ধের যে-মুহূর্তটুকু ধরা আছে ওই বিশাল ছবিতে তাতে নেপোলিয়নের জয়ের সমস্ত সম্ভাবনাই জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়।

কিন্তু ওয়াটারলুর অন্তিম ফলাফল তো তা নয়। আমাদের এখন উচিত যুদ্ধের ঘটনাগুলোকে পরপর সাজিয়ে নিয়ে দেখা। নেপোলিয়ন তাঁর ৭২,০০০ সৈন্য এবং ২৪৬টি কামান নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে। সে-সময় ওয়েলিংটনের ছিল ৬৮,০০০ সৈন্য এবং ১৫৬টি কামান। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল বিপক্ষের বাঁদিকের ব্যূহ ভেদ করে তাদের দুইভাগে ভেঙে ফেলা। কিন্তু নেপোলিয়নের এই প্রবল আক্রমণের সামনে থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য ওয়েলিংটন তাঁর বাহিনীর একটা বিরাট অংশকে পাহাড়ের পেছনে সাজিয়ে রেখেছিলেন এবং এগিয়ে-আসা ফরাসি বাহিনীর ওপর তারা সমানে গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছিল পাহাড়ের ওপর থেকে। কিন্তু অনেক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ফরাসি বাহিনী অনেকখানি ভেতরে ঢুকে এসেছিল। ওয়াটারলুর আশপাশের বেশ কয়েকটা ঘাঁটি

আস্তে-আস্তে ফরাসিদের হাতে এসে যায়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফরাসিদের অনেক সৈন্যক্ষয়ও হয়েছিল। বেলা সাড়ে ছটা নাগাদ মার্শাল নে একটা দুর্দান্ত আক্রমণ হেনে বিপক্ষের 'লা হারে স্যাৎ' আস্তানাটা দখল করে নেন। নেপোলিয়ন সিদ্ধান্ত নেন যে, পূর্ণোদ্যমে তিনি এবার ওয়েলিংটনের মূলবাহিনীর ওপর আঘাত হানবেন এবং সে-আঘাত প্রতিহত করার ক্ষমতা ওয়েলিংটনের ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু সহসা প্রমাদ গুনলেন নেপোলিয়নই যখন দূর থেকে দেখলেন মার্শাল ব্লুশার তাঁর ৬০,০০০ প্রাশিয়ান সৈন্য নিয়ে মিত্রপক্ষের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এর আগে অবধি ওয়েলিংটন সমানে প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন : হে ভগবান, হয় সন্ধে হোক আর নাহয় ব্লুশার আসুন। এবার তিনি নতুন বল পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ফরাসি বাহিনীর ওপর। যে-ব্লুশারকে মাত্র তিনদিন আগে বিষম পর্যুদস্ত করে ফরাসিরা শার্লরোয়া দখল করেছিল তারা যে এই অল্প সময়ের মধ্যেই মিত্রপক্ষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে এটা নেপোলিয়ন স্বপ্নেও ভাবেননি। তাঁর ভাই জেরোম যুদ্ধের দিন সকালে এই প্রসঙ্গ তুলেও ছিলেন, কিন্তু সম্রাট তাঁর কথায় কোনো আমলই দেননি। এদিকে ফরাসি বাহিনীর একটা অন্য বিভাগ নিয়ে গ্রুশিও সময়মতন ওয়াটারলু পৌঁছতে পারলেন না। একটা মোটামুটি জেতা-যুদ্ধে নিদারুণভাবে হেরে ৪১,০০০ সৈন্য (২৫,০০০ মৃত এবং ১৬,০০০ বন্দি) পেছনে ফেলে ভগ্নমনোরথ নেপোলিয়ন প্যারিসে ফিরে এলেন। অন্যদিকে ওয়েলিংটনের সৈন্যক্ষয় হল ১৬,০০০ এবং প্রাশিয়ানদের ৭,০০০। পরের দিন ওয়েলিংটন ঘোষণা করলেন : ওয়াটারলুর ভয়াবহতা অকল্পনীয়। এবং নেপোলিয়ন? তিনি সত্যিই অবাক হয়ে ভাবতে বসলেন, তাঁর ভুলটা কোথায় ছিল!

ওয়াটারলুর প্রান্তরে বেড়াতে-বেড়াতে ভীষণ ভাবনায় পড়েছিলাম—এত হাজার-হাজার সৈন্য এবং ঘোড়া নিয়ে এই জায়গায় লড়াই হল কী করে? জায়গাটা কি সে-তুলনায় ছোট নয়? পরে বইতে দেখলাম নেপোলিয়নও সেই একই কথা তুলেছিলেন যুদ্ধের আগে। অত অল্প জায়গায় অত বড় বড় বাহিনীকে ইচ্ছেমতন ঘোরানো-ফেরানো মুশকিলের। উপরন্তু যেখানে প্রতিপক্ষ একটা সুবিধের জায়গা দখল করেই আছে। সম্ভবত সেই কারণেও ওয়াটারলুর যুদ্ধে আমরা নেপোলিয়নের সেই রণকৌশল, সেই স্ট্রাটেজি খুঁজে পাই না, যা তাঁকে যুদ্ধশাস্ত্রের শিরোমণি করে রেখেছে।

ওয়াটারলুর প্রান্তরে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে নানান স্মৃতিসৌধ। এককোণে আছে প্রাশিয়ানদের তৈরি-করা একটা গথিক কারুকার্যের চৌকোণ পিরামিড। তার মাথায় একটা পেতলের ক্রুশ বসানো এবং গায়ে সোনার অক্ষরে লেখা : তাঁদের বীরদের স্মরণ করছেন তাঁদের রাজা এবং দেশবাসী। শান্তি পাক তাঁদের আত্মা। বেল আলিয়স। ১৮ জুন, ১৮১৫ সাল।

একটু অন্যরকমের একটা পিরামিড বসিয়ে গেছেন হানোভারবাসীরা। একতাল নীল পাথর কেটে বানানো সেই পিরামিড, যাতে প্রশংসা গাওয়া হয়েছে মিত্রপক্ষের মৃত সৈনিকদের যাঁরা লা হার স্যাঁৎ রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।

এ ছাড়াও একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে লেফটেন্যান্ট-কর্নেল গর্ডনের নামে, যিনি ছিলেন ওয়েলিংটনের পরামর্শদাতা। এই স্তম্ভ ছেড়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে দেখা যায় বেলজিয়ানদের স্মৃতিসৌধ। কিন্তু এদের সকলের চেয়ে মনটাকে নাড়া দেয় ফরাসিদের সৌধটাই। পরাস্ত ফরাসিদের যে-দুটি দল মাটি কামড়ে লড়েছিল, পরাজয়ের অন্ধকার মুহূর্তে তাদের স্মরণে এই সৌধ বানিয়েছিলেন ফরাসি স্থপতি জেরোম। ১৯০৪ সালে তৈরি এই সৌধটিতে একটা মস্ত ঈগলপাখিকে দেখানো হয়েছে, যার একটি ডানা ভেঙে গেছে গুলির আঘাতে। কিন্তু অন্য ডানাটিতে সে তখনও ধরে আছে অস্টারলিৎজ, ইয়েনা এবং ফ্রিডল্যান্ডের পতাকা। নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফরাসি বাহিনীর তিন-তিনটে জয়ের মুহূর্তকে স্মরণ করা হয়েছে ওই পতাকার দ্বারা। কেবলমাত্র স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবেও এই 'লেইল ব্লেসে'

বা 'আহত পাখি' সৌধটি অতুলনীয়। ওয়াটারলুর যুদ্ধের সমস্ত বিয়োগবেদনা, হতাশা এবং কান্না যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ওই পাখির মধ্যে। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকে না-দেখে উপায় নেই।

স্মৃতিময় ওয়াটারলুর কাছেপিঠেই আছে নানান ছোটখাটো বাড়ি যেখানে আস্তানা গেড়েছিলেন হয় নেপোলিয়ন, নয় ওয়েলিংটন, কিংবা ব্লুশার। এরকম একটা ছোট্ট বাড়ি ল্য কাইউ, যেখানে ফেরার পথে বিশ্রাম নিয়েছিলেন নেপোলিয়ন। এখানে তাঁর ধরা পড়ারও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এখনও তাঁর সেই ঘর ঠিক সেইভাবেই যত্ন করে রাখা আছে। যেন এইমাত্র নেপোলিয়ন সেখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। এরকম আরেকটা বাড়িতে যুদ্ধজয়ের পর মিলিত হয়েছিলেন ওয়েলিংটন এবং ব্লুশার। সেই জায়গাটির নাম 'লা বেল আলিঁয়স'।

তবে ওয়াটারলু থেকে ফেরার পথে যা না-করে পারিনি তা হল ওয়াটারলু মিউজিয়ামের দোকান থেকে কিছু স্যুভেনির কিনে নেয়া। পরে ছবিটবি তুলে বসলাম একটা ছোট্ট কাফেতে। কাফের কাচের জানালা দিয়ে দেখা যায় সবুজ মাঠ। খুব নিরীহ, গোবেচারা ভাব নিয়ে শুয়ে আছে আকাশের নিচে। যেন সেই আশ্চর্য দিনটির মায়াজাল থেকে সে এখনও মুক্ত নয়।

আনন্দমেলা থেকে

এক হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারে কচ্ছপ

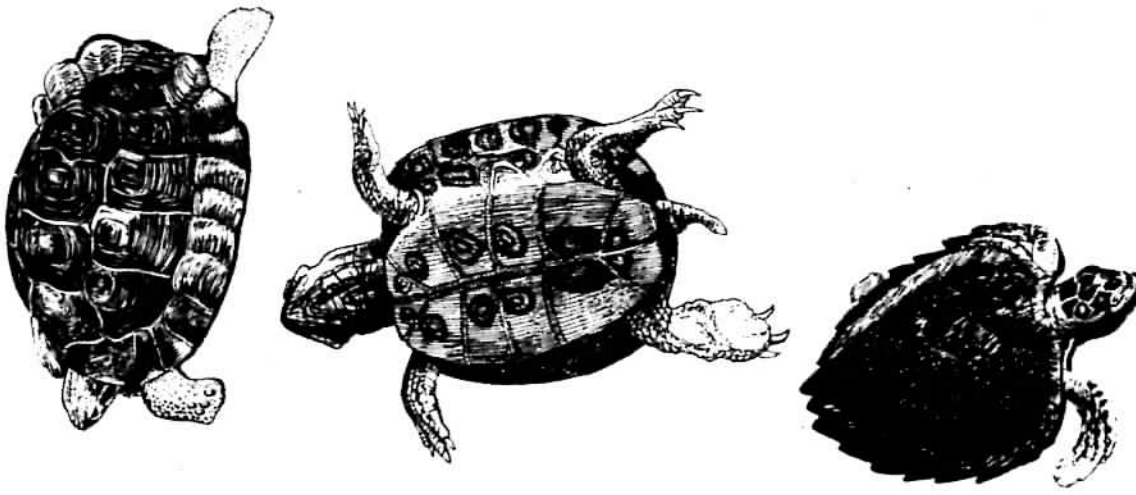

পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘজীবী সরীসৃপ প্রাণীটির নাম কচ্ছপ। পৃথিবীর নানা দেশে যেসব কচ্ছপ পাওয়া গেছে, তাদের বয়স মোটামুটি ১০০ থেকে ১০০০ বছরের মধ্যে। ১০০০ বছর বেঁচে থাকতে পারে কোনো প্রাণী, শুনলেই কেমন যেন আশ্চর্য লাগে। ঠাণ্ডা রক্তের কচ্ছপের চারটি পা। দাঁত নেই। শরীরের ওপরের অংশে আছে শক্ত খোলস। লম্বায় এরা প্রায় চার-পাঁচ ফুট। স্ত্রী-কচ্ছপেরা সাধারণত ছোট বলের মতো ডিম পাড়ে। একসঙ্গে এরা ২ থেকে ১৭টা ডিম পাড়তে পারে। ডিমপাড়া শেষ হলে স্ত্রী-কচ্ছপেরা ডিমগুলিকে বালিচাপা দিয়ে রাখে। স্ত্রী-কচ্ছপেরা সাধারণত ১৫ মিনিটে ন'টা ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার সময় জানুয়ারির মাঝামাঝি ও মার্চের শেষাশেষি। ৫৫ থেকে ৬৫ দিন পরে ডিম ফুটে বের হয় বাচ্চা। জন্মের পর শিশু-কচ্ছপের আকৃতি হয় দেশলাই বাক্সের মতো, ওজন প্রায় ৫০ গ্রাম। কচ্ছপেরা জলজ উদ্ভিদ, সবজি ইত্যাদি খেতেই বেশি পছন্দ করে। তবে কখনো-সখনো এরা ছোট-ছোট কীটপতঙ্গও ধরে খায়। সকাল সাত-আটটা নাগাদ এরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং রোদ পোহাতে বের হয়। শরীর যতক্ষণ না গরম হয়, ততক্ষণ এরা রোদ পোহায়। বাকি সময়টা এরা ঘুরে বেড়ায় ও গাছের কচি-কচি পাতা ছিঁড়ে খায়। এরা প্রধানত কাদা কিংবা পানির ভেতর থাকে। কেউ-কেউ আবার ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এরা যে-খাবার খায় তা হজম করে প্রধানত গরম কিংবা ঠাণ্ডা পরিবেশে। মোটামুটিভাবে যখন তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে নামে, তখন শুরু হয় এদের পরিপাকক্রিয়া।

স্ত্রী-কচ্ছপের চেয়ে পুরুষ-কচ্ছপ আকৃতিতে বড়। একটি পূর্ণবয়স্ক কচ্ছপের ওজন প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ পাউন্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রতট 'ভাঙা নেক', 'লেদারব্যাক' এবং 'লগারহেড'-এ এই

ধরনের কচ্ছপ আছে। এদের ওজন যথাক্রমে ৫০০ এবং ১০০ কিলোগ্রাম। পৃথিবীতে যে সাতরকম সামুদ্রিক কচ্ছপের দেখা মিলেছে, তার মধ্যে পাঁচরকম সামুদ্রিক কচ্ছপই আছে ভারতীয় উপমহাদেশে। যেমন লগারহেড, লেদারব্যাক, হকসবিল, সবুজ কাছিম ও অলিভ রিডলে।

সম্প্রতি তাইপেই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে একটি অদ্ভুত কচ্ছপ উঠেছিল। সচরাচর দেখা যায় না এমন কচ্ছপটির তিনটি মাথা ও ছ'টি পা। বয়স মাত্র পাঁচ মাস। কচ্ছপটির তৃতীয় মাথাটি প্রায় ছ' সেন্টিমিটার লম্বা, যা শক্ত খোলসের মধ্যে লুকনো। মাংস গজিয়ে ওঠার ফলে এই তৃতীয় মাথাটির নড়াচড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

প্রাণিবিজ্ঞানীদের মতে, এই কচ্ছপটি বিরল প্রজাতির। সেজন্য তাঁরা এই কচ্ছপটিকে নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন। আশা করা যায়, তাঁরা হয়তো এই রহস্যের আসল সূত্র খুঁজে পাবেন।

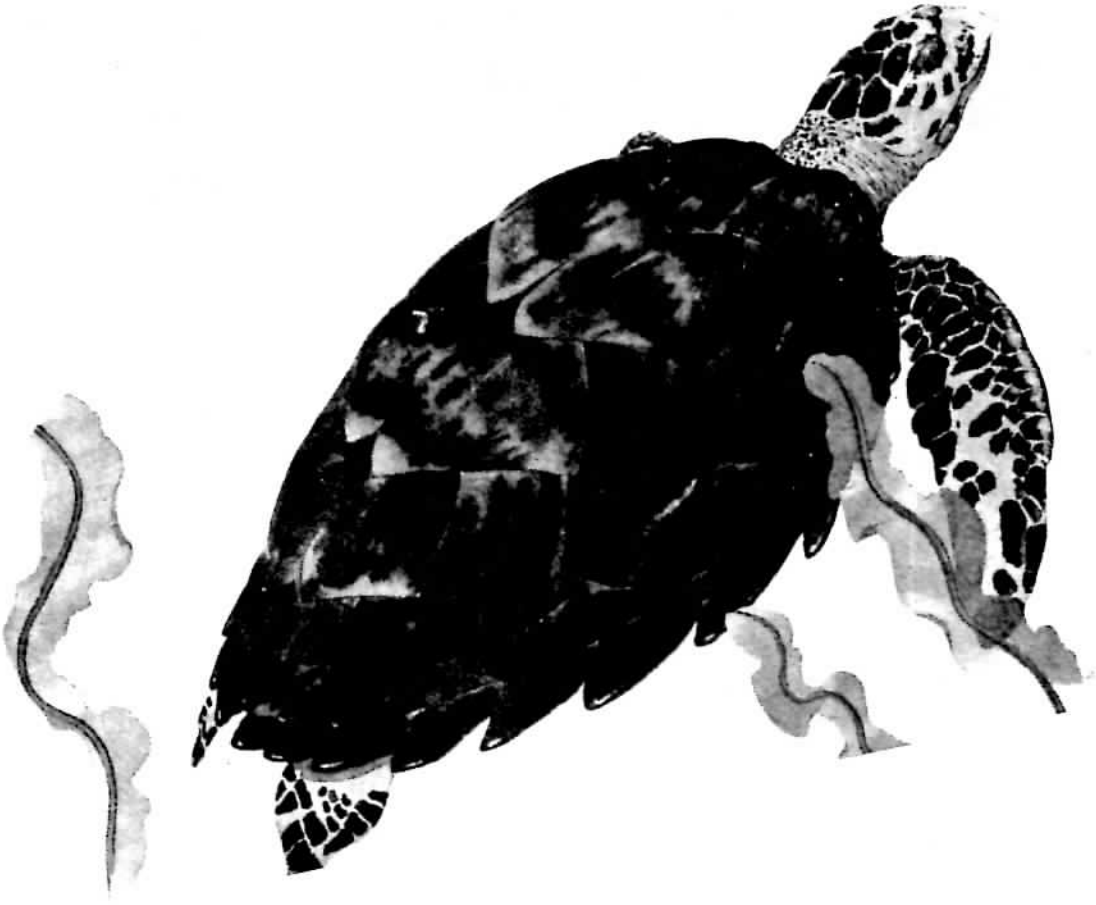

অরূপরতন ভট্টাচার্য

সুপার নোভা

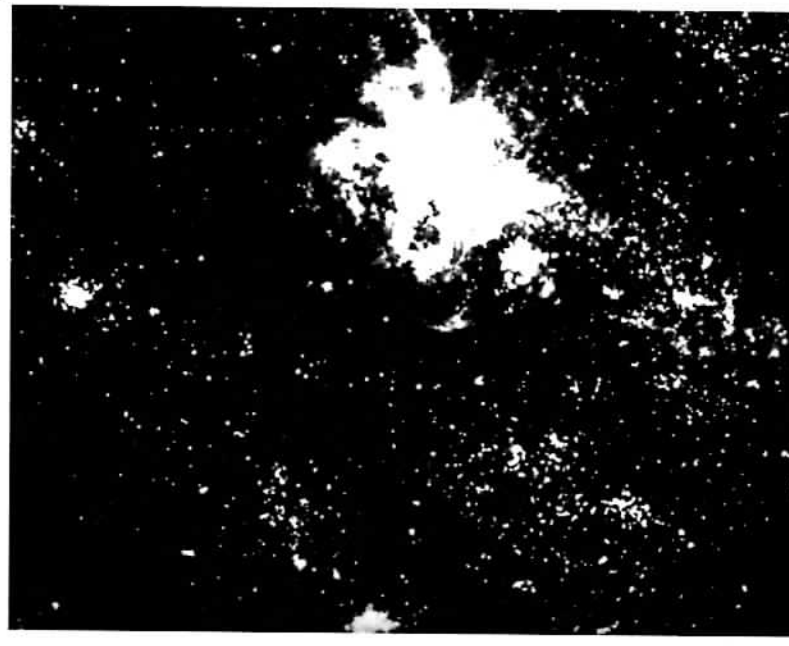

নিজের শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে যা উৎকৃষ্ট, তাকে বলা হয় সর্বোত্তম, ইংরেজিতে সুপার (Super)। সুপার ফাইন চাল আছে, সুপার ফাস্ট ট্রেন আছে; তেমনি ঊর্ধ্বে নক্ষত্রলোকেও পাওয়া যায় সুপার জায়ান্ট (Super giant) তারকা, সুপার নোভা (Super Nova)।

সুপার জায়ান্ট তারকার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্যের আভাস আছে, কিন্তু নোভার বা সুপার নোভার সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় না থাকাই সম্ভব। এই সুপার নোভাকে আমরা বাংলায় বলব অতিনোভা।

নোভা অর্থ নতুন তারকা। কিন্তু সত্যিসত্যিই নোভা তারকা নয়। আকাশ জুড়ে অনুজ্জ্বল ম্লান তারকা কম নেই। এদের মধ্যে কোনো-কোনোটি হঠাৎ ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যা আগে নজরে আসেনি, তা যদি এখন দৃষ্টিগোচর হয়, তা হলে তাকে স্বাভাবিকভাবেই নতুন মনে হতে পারে। এই নতুন মনে হওয়ার জোরেই সে নোভা বা নতুন তারকা।

এই-যে দীন অবস্থা থেকে ঔজ্জ্বল্যের প্রাচুর্যে উঠে-আসা, এর জন্যে কয়েক ঘণ্টা বা দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তারপর আবার সময় ধরে আস্তে-আস্তে পুনর্মূষিকো ভব-এর মতো পুরোনো অবস্থায় ফিরে যায়। মাঝে কেবল কিছু সময়ের জন্যে রাজা হয়ে এই নোভা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে ধরা থাকে।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে, বিস্ফোরণের পরে পুনর্মূষিক না হয়ে সে জীবনের অন্তিমলগ্নের দিকে এগিয়ে চলেছে—প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে জ্বলে ওঠার মতো।

একেবারে সাম্প্রতিককালে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীরা তারকার মৃত্যুর ব্যাপারটা বুঝবার মতো একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন। তারকারা সাধারণভাবে দীর্ঘায়ু—আমাদের জীবনের মতো তা সীমিত, অনির্ভর এবং বিপদসঙ্কুল নয়। কবির ভাষায় বলা যায়, "এই তারারা অবশেষে হামের মতো মিলিয়ে যায়।" কথাটা বেশিরভাগ তারার বেলায় খাটলেও, কিছু তারকা এর ব্যতিক্রম। সেখানে মৃত্যু আসে হঠাৎ এবং অনেকটা নাটকীয়ভাবে। তারকার মৃত্যু যেখানে আকস্মিক সেখানে মৃত্যু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে মাত্র কয়েক মাসের ভেতরে। ওই সময়ে সে জ্বলে উঠবে ও প্রতিবেশী লক্ষ-কোটি তারকাকে ঔজ্জ্বল্যে ছাড়িয়ে যাবে। তারকার জীবন এত দীর্ঘ এবং তার মৃত্যু এত সংক্ষিপ্ত যে একজন মানুষ তার সমস্ত জীবনে এরকম একটা ঘটনা গড়ে একবারই দেখতে পারে।

এই-যে প্রচণ্ড উজ্জ্বল বিস্ফোরণ, যাতেই আসে তারকার মৃত্যুর পরোয়ানা, আমাদের কাছে তা-ই হল সুপার নোভা বা অতিনোভা।

কিন্তু নোভা কাকে বলে?

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত নোভা আর অতিনোভার মূল পার্থক্য আমাদের কাছে জানা ছিল না। যে-তারাদের বাইরের স্তরে অল্প-বিস্তর বিস্ফোরণের ফলে ঔজ্জ্বল্য সাময়িকভাবে বেড়ে যায়, তাদের আমরা নোভা বলি। এতে তারকারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারকাই থেকে যায়, মূল তারার অভ্যন্তরে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু অতিনোভায় বিস্ফোরণ অল্পস্বল্প নয়, তা সমগ্র তারকাটির বিস্ফোরণের পরিণতি। এরকম এক-একটা বিস্ফোরণে তারকারা আর তারকা থাকে না। তাদের গোটা চেহারাটাই বদলে যায়। অতিনোভা নোভার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি উজ্জ্বল।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ একটা কথা বোঝা গিয়েছিল, এরকম জ্বলে-ওঠা তারকারা সুস্পষ্টভাবে দুটো শ্রেণীতে পড়ে। এর একটা অন্যটার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল। যেটা অল্প উজ্জ্বল সেটাই কিন্তু আসলে নোভা। এতে কাছ ঘেঁষে আছে দুটো তারকা। এদের অবস্থান ডাম্বেলের দুটো মাথার মতন। না, লোহার বাঁধনে এরা বাঁধা পড়েনি, কিন্তু যেন কোনো অদৃশ্য সুতোর টানে একে অন্যকে ঘিরে ঘুরে চলেছে। এই যুগ্ম তারকার একটির বিস্ফোরণেই খুব সম্ভব নোভার সৃষ্টি। আর যা অনেক বেশি উজ্জ্বল তাই হল সুপার নোভা বা অতিনোভা।

গত ১০০০ বছরের ইতিহাসে আমাদের ছায়াপথের ১০০ লক্ষ কোটি তারকার মধ্যে সুপার নোভার সংখ্যা মাত্র পাঁচটি। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ১০০৬, ১০৫৪ এবং ১১৮১ খ্রিস্টাব্দে, অন্য দুটি ১৫৭২ এবং ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য আরো তিনটি অতিনোভার খবর পাওয়া যায়।

এখানে একটা মজার কথা উল্লেখ করার মতো। দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হয় ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে। কম সময় নয়, প্রায় ৪০০ বছর হতে চলল। দীর্ঘ এই চার শতাব্দী ধরে দূরবীক্ষণ মহাকাশকে, কোনো সন্দেহ নেই, আমাদের অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমাদের ছায়াপথে আর-কোনো অতিনোভার খোঁজখবর নেই।

তবে তাতে নিরুৎসাহিত হওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। অতিনোভা-সন্ধানকারীরা ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়মিত অনুসন্ধান চালিয়ে আমাদের ছায়াপথের বাইরে অন্যান্য নক্ষত্রলোকে প্রায় ৪০০ অতিনোভার সন্ধান পেয়েছেন।

হিসেব করে দেখা গেছে যে, যদি ১০০টা তারা নেওয়া হয়, তা হলে একটা তারা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ভেতরে তার জীবন শেষ করবে। আমাদের ছায়াপথেই প্রতি ২০ বছরে একটা

অতিনোভার বিস্ফোরণ হওয়া স্বাভাবিক। তা হলে আমরা আরো অতিনোভা দেখতে পাই না কেন? বরং ইতিহাস তো অন্যরকম কথা বলে। সেখানে ২০০০ বছরে নথিভুক্ত অতিনোভা মাত্র আটটি। তা হলে ২৫০ বছরে মাত্র একটি—এই হিসাবে।

আসামি কিন্তু অন্য একজন—অন্তরীক্ষে যে অতিনোভার বিস্ফোরণ থেকে আমাদের দৃষ্টিকে আড়াল করে রেখেছে। ছায়াপথের তলে বিভিন্ন তারকার মাঝে ধূলিকণা আর বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে—তারাই হল ওই আসামি। আর ওইখানেই অতিনোভার সৃষ্টি হয় সবচেয়ে বেশি। আর আমাদের সূর্যও আছে ওখানে। ওই ছায়াপথের তলকে আমরা মুখোমুখি দেখি না, তা আমাদের নজরে আসে তার ধার-বরাবর। একটা খাবার ডিশকে চোখের সামনে পাশ করে রাখলে তার ধারের রেখাটুকু ছাড়া আর কীই-বা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে?

এইসব কারণে আমাদের ছায়াপথে যত অতিনোভার বিস্ফোরণ হবে, তার প্রায় ৪০ ভাগ আমরা দেখতে পাব। তা ছাড়া যে-অতিনোভা আছে সূর্যের খুব কাছে, তাকেই-বা আমরা দেখব কেমন করে? সূর্যের কাছাকাছি মানে দিনের আলোর সঙ্গেই কেবল তার যোগাযোগ। তা হলে এরকম অভিনোভার নজরে আসার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই খুব কম। অবশ্য এমন যদি হয়, এর উজ্জ্বলতা এত বেশি যে দু-এক মাসে তা ম্লান হতে হতে একেবারে হারিয়ে গেলে, বা তখন সূর্য তার বার্ষিক পথ ধরে দূরে সরে গেলে, একে আবার আমরা দেখতে পাব।

আজ পর্যন্ত যত অতিনোভার খবর পাওয়া গেছে, তাতে একটা বিষয় সুস্পষ্ট—নক্ষত্রের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পরিণামই অতিনোভা। এই অতিনোভার বিস্ফোরণ নিয়ে গবেষণা কম হয়নি, কিন্তু বিতর্কও আছে যথেষ্ট। তবে একটা বিষয়ে সবাই একমত। মহাকর্ষ-বলই যে অতিনোভা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তির উৎস তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার শক্তির উৎস থেকে বিস্ফোরণ হয় কেমন করে?

দুটি ছেলের কথা ধরা যাক। এরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে ঠেলছে। যদি দুজনের জোর সমান হয়, তা হলে 'ন যযৌ, ন তস্থৌ'—দুজনের ভেতর একটা স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। কিন্তু একজন যদি অন্যজনের চেয়ে বেশি শক্তিমান হয়, তা হলে ধাক্কার জোরে অন্যকে ঠেলে পিছিয়ে দেবে।

অতিনোভার বিস্ফোরণের বেলাতেও খেলাটা চলে অনেকটা ওইরকমভাবে। সাধারণ তারার ভেতরে নানা বস্তুর বিক্রিয়ার ফলে যে শক্তি ও তেজের চাপ রয়েছে, তা মহাকর্ষের চাপকে প্রতিহত করে তার ভারসাম্য বজায় রাখে। মহাকর্ষ জোর টান দিচ্ছে ভেতরদিকে। শক্তি ও তেজের চাপের মুখ আবার বাইরের দিকে। এখন যদি অবস্থাটা এমন হয় যে ভেতরের জোর ক্রমশ ফুরিয়ে আসে, তা হলে কী হবে? তখন ভারসাম্য বজায় রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়বে আর মহাকর্ষের ভেতরমুখিন চাপই নিজের জোর বজায় রাখবে। শুরু হবে তারকার সঙ্কোচন আর সেইসঙ্গে বিপর্যয়ের পালা। এখানে প্রথমদিকে দুটো ছেলের যেন শক্তি একই রকমের ছিল, তখন তারা পাল্লা দিচ্ছিল সমানে সমানে, পরে একজন নিজের জোর হারিয়ে ফেলতে আরম্ভ করল। বাস্তবে অনেক সময়ে হয়ও এরকম।

কিন্তু এইভাবেই যে সব তারকা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে আসবে তা নয়। জোর কম হতে পারে, কিন্তু তার ভর কত, সেটাও জানা দরকার। দেখা গেছে, যেসব তারকার ভর সূর্যের ভরের দেড়গুণ বা তার চেয়ে বেশি, তাদের এভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে আসা সম্ভব নয়।

প্রত্যেকটি অতিনোভার একটা খোলস আছে। বিস্ফোরণের ফলে সেই খোলস বাড়তে বাড়তে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এটাই হল অতিনোভার অবশিষ্টাংশ। আর কেন্দ্র থাকবে একটা অতি ঘনবস্তু, মৃত তারকার পরিণতি। এ এমনই নিষ্প্রভ যে, এ থেকে বোঝবার মতো কোনো আলোই পাওয়া যাবে না। তবে তার ঘনত্ব এত বেশি যে, একটা দেশলাইয়ের বাক্স তা দিয়ে ভরতি করলে তার ওজন হবে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টন। সহজে ধারণা করার মতো নয় ব্যাপারটা।

আমাদের বিশ্বের ইতিহাসে অতিনোভা আবিষ্কার বিরল ঘটনার মধ্যে পড়ে, কিন্তু ধূমকেতুকে নিয়ে যেমন সংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস মানুষের মনে গেঁথে রয়েছে, অতিনোভাকে নিয়েও তেমনি। দেশ-বিদেশের অনেক উল্লেখযোগ্য ভয়ানক ঘটনার সঙ্গে অতিনোভার আবির্ভাবকাল আশ্চর্যরকমের মিলে যায়। ১০০৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে যে অতিনোভার আবির্ভাব হয়, সেই সময়ে সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেন। ১১৮১ খ্রিস্টাব্দের অতিনোভার আবির্ভাবের সময় আগস্ট মাস। নজরে এসেছিল ১৮৫ দিন অর্থাৎ প্রায় ৬ মাস। আর ওই বছরেই গিয়াসউদ্দীন পাঞ্জাবের ওপর আঘাত হানেন। এর তিন বছর পরে ১৫৭২-এ যে-অতিনোভাটি দেখা দেয়, সেটি প্রথম নজরে আসে নভেম্বরের গোড়ার দিকে। এটি দৃশ্যমান ছিল দেড় বছর। ওই বছরই আকবরের গুজরাট-বিজয়। ১৬০৪-এর অতিনোভার আবির্ভাব নভেম্বরে, ছিল ১ বছর। আকবর মারা যান ওই বছরই।

মহাকাশে এইসব অতিনোভা কোনটি কোথায় দেখা যায়? বৃত্তাকার সমস্ত মহাকাশটি সবসুদ্ধ ৮৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে যেমন লন্ডন, প্যারিস বড় বড় শহরকে অনেক ভাগে ভাগ করা হয়, সেইরকম করে। ৭০০০০১, ৭০০০০২, ৮০০০০৩ বলতে বুঝতে অসুবিধে হয় না, এটা শহরের কোন অংশ। মহাকাশের এক-একটি অংশ ওইভাবেই বিভক্ত। তবে তা সংখ্যায় নয়। এক-একটা অংশ সেই অংশের উজ্জ্বল তারায় তারায় গঠিত এক-একটি প্রাণী বা বস্তুর নামে নির্দিষ্ট। এদের মধ্যে আছে বৃষ, বৃশ্চিক, সপ্তর্ষি, কালপুরুষ, লাপাস, ক্যাসিওপিয়া, স্কর্পিও, হারকিউলিস, কর্কট, ওফিউচাস। ১০০৬ খ্রিস্টাব্দের অতিনোভা দেখা দিয়েছিল লুপাস তারামণ্ডলের কাছে। একেবারে

দক্ষিণ আকাশের তারামণ্ডল এটি। বৃষ অনেকটা বৃষের আকারের একটা উজ্জ্বল তারকামণ্ডল। শীতকালের সন্ধেবেলায় আমাদের মাথার উপরে চোখ তুললে সরাসরি এটির সঙ্গে যোগাযোগ হবে। উজ্জ্বল তারায় তারায়, অনেকটা বৃষের মতো, চিনতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এই মণ্ডলের পটভূমিতেই ছিল ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দের অতিনোভাটি। এইভাবে একেবারে উত্তর-আকাশের ঘ-আকারের ক্যাসিওপিয়াতে ১১৮১ আর ১৫৭২-এর অতিনোভা এবং ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের অতিনোভাটি সামান্য দক্ষিণ-চাপা প্রায় মাঝআকাশের ওফিউচাস মণ্ডলের নজরে এসেছিল।

গত হাজার বছরের মধ্যে দেখা বিভিন্ন অতিনোভার মধ্যে শেষ দুটির অর্থাৎ ১৫৭২ এবং ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের অতিনোভা দুটির সঙ্গে দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম যুক্ত আছে। এঁদের একজন টাইকো ব্রাহে এবং অন্যজন কেপলার। কেপলার বা ব্রাহে দুজনেই যে তাঁদের সময়ের অতিনোভাটিকে প্রথম দেখেন তা নয়। কিন্তু তারকা হিসেবে এটিকে চিনতে তাঁদের ভুল হয়নি। এ হল নবীন আগন্তুক, নতুন তারা।

কিন্তু তারা হিসেবে এটিকে চেনা গেল কেমন করে?

মহাকাশে গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কার দিকে তাকিয়ে দেখলে একটা কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তারকাদের পটভূমিতে এদের অবস্থান একেবারে নির্দিষ্ট। আমাদের জীবদ্দশায় একটা তারকার থেকে আর-একটা তারকার দূরত্বের কোনো পরিবর্তন নেই। শুধু আমাদের জীবনে কেন, আমাদের কয়েক পুরুষের জীবনেও দুটি তারকার পারস্পরিক অবস্থানে কোনো পার্থক্য নজরে আসবে না। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দের এই অতিনোভাটি উত্তর-আকাশের যে ক্যাসিওপিয়া মণ্ডলে দেখা গিয়েছিল, ব্রাহে সেই বিশিষ্ট মণ্ডলটির উজ্জ্বল তারকাগুলির প্রত্যেকটি থেকে অতিনোভাটির দূরত্ব বারবার মাপতে থাকেন। মহাকাশে অতিনোভার দৃশ্যমান কাল কম সময়ের নয়—প্রায় দেড় বছর।

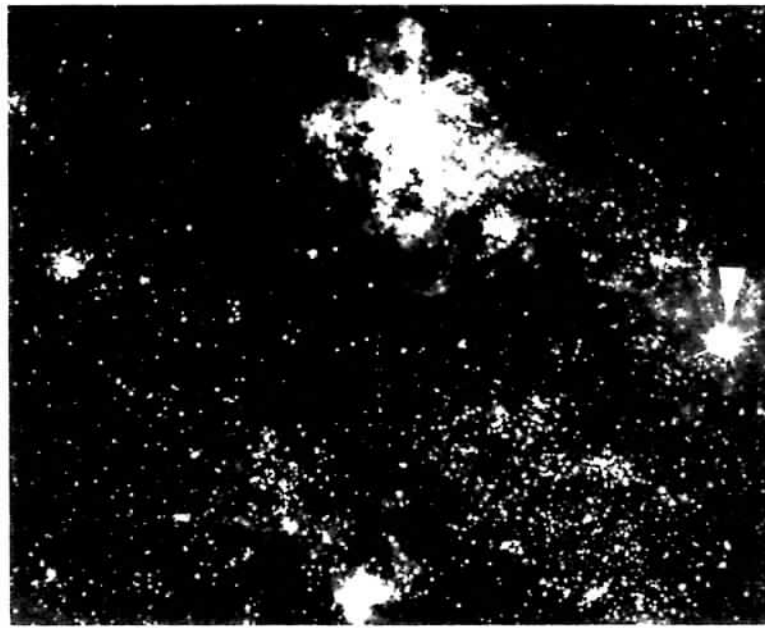

পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে ব্রাহে একটি বিষয়ে নিশ্চিত হলেন। স্থির তারকাদের পটভূমিতে এটিও স্থির এবং নির্দিষ্ট। তা হলে গ্রহ না হয়ে এটির তারা হওয়ারই সম্ভাবনা, কারণ গ্রহেরা তারাদের পটভূমিতে গতিশীল। তা ছাড়া এটি অন্যান্য তারাদের মতো মিটমিটও করে।

টাইকো ব্রাহে মারা গেলেন ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তিনি যে-কাজের সূচনা করেছিলেন তা থেমে রইল না। তাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন তাঁরই গবেষণা-সহায়ক কেপলার। ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৩২ বছর পরে আবার একটি অতিনোভা দেখা দিল ওফিউচাস মণ্ডলে। জ্যোতির্বিদদের চোখ তখন আকাশের ওইদিকেই ছিল। আকাশে তখন এক জ্যোতিলৌকিক সম্মেলন। মঙ্গল আর বৃহস্পতি তখন ওই অঞ্চলে আস্তে-আস্তে পরস্পরের কাছে এসেছিল। ফলে অতিনোভার প্রথম আবির্ভাবেই তা সকলের দৃষ্টিতে পড়ল। তখনো এর ঔজ্জ্বল্য ক্রমাগত বাড়ছে। যে-কোনো নোভার পক্ষে পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে আসার আগে তাকে দেখাটা স্বাভাবিক হয়, কারণ ম্লান চেহারা থেকে সর্বোজ্জ্বল অবস্থায় সে আসে অত্যন্ত দ্রুত। কেপলার এই অতিনোভাটিকে দেখলেন তার সর্বোজ্জ্বল অবস্থায়, তখন সে ঔজ্জ্বল্যে বৃহস্পতির সমান বা তার চেয়েও কিছু বেশি। এই অতিনোভাটি আমাদের ছায়াপথে দেখা সর্বশেষ অতিনোভা।

এ-পর্যন্ত ইতিহাসে ধরা-পড়া প্রত্যেকটি অতিনোভারই বিস্তারিত বিবরণ আছে। সে-বিবরণ যেমনই কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই চমকপ্রদ। কিন্তু গত প্রায় চারশো বছর অতিনোভার আর-কোনো খবর নেই আমাদের ছায়াপথে।

নোভা বা অতিনোভা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা সাধারণভাবে এমন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় যে, শৌখিন জ্যোতির্বিদ ছাড়া আর কারোরই এজন্যে সময় দেওয়া কঠিন। শখের জ্যোতির্বিদেরা এ-খেলায় সময় দিতে পারেন, দূরবীক্ষণ-হাতে খালি-চোখে দেখা পরিমণ্ডলের বাইরের জগৎ আমাদের টেনে নিয়ে যায় অনেক দূরে। সেখানে প্রত্যক্ষ করা যায় অসংখ্য নৈসর্গিক ঘটনা জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে যা নিরন্তর বিপ্লব ঘটাচ্ছে। এক্ষেত্রে শখের জ্যোতির্বিদদের ভূমিকাটাও নেহাত কম নয়।

নোভা-পর্যবেক্ষণকারী শখের জ্যোতির্বিদরা এইভাবে একটানা লেগে থাকার ফলে দূরবীক্ষণ-হাতে এমন অবস্থায় অনেক নোভার সন্ধান পেয়েছেন যেগুলো কোনোভাবেই খালি-চোখে ধরা পড়ার মতো উজ্জ্বল নয়। ফলে কোনোদিন তাঁদের চোখে অতিনোভাও যে ধরা পড়বে না, এমন কথা কে বলতে পারে। আর নিরাশ হওয়ারও কোনো কারণ নেই। আমাদের ছায়াপথ থেকে ইতিমধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটে-যাওয়া প্রায় ৫০০ অতিনোভার আলো আমাদের দিকে ছুটে আসছে। ফলে নতুন করে কোমর বাঁধা যেতে পারে।

এরোপ্লেন পাখি

ছোট ছোট পাখিরা ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে উড়তে পারে। পায়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ মাইল, সুইফট পাখির ২০০ মাইল। কী করে ওড়ে পাখিরা? পাখির শরীর যেন ওড়ার জন্যেই তৈরি। হাড় কম, যা আছে তারও কয়েকটা ফাঁপা, বাতাস ভরতি। কাঁধের হাড় শক্ত, ডানা ঝাপটাতে তাই ক্লান্তি নেই। হালকা পালক দিয়ে ঢাকা শরীরটা জাহাজের খোলের ছাঁচে তৈরি। লেজের গড়ন নৌকার হালের মতো। এই পাখির মডেলেই তৈরি হল এরোপ্লেন।

জসীম উদ্‌দীন

সমানে সমান

ছোট্ট একটা নদী, হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। তার পশ্চিমপারে থাকে এক ট্যাটন, নাম ধূলি। পুব-পারে থাকে আর-এক ট্যাটন, নাম তার বালি। ট্যাটন মানে অতি চালাক। লোক ঠকাইয়া বেড়ানোই তাহার পেশা।

বালি এক ছালা বিচেকলার বীজ মাথায় লইয়া নদীর ওপার দিয়া যাইতেছে। পশ্চিমপারের ট্যাটন ধূলি তেমনি আর-এক ছালা গাবের পাতা মাথায় করিয়া নদীর এপার দিয়া যাইতেছে। কেউ কাহাকে জানে না।

ধূলি বালিকে ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছালায় কী লইয়া যাইতেছ?"

বালি উত্তর করিল, "একবস্তা গোলমরিচ লইয়া চলিয়াছি হাটে। তোমার মাথায় কী লইয়া যাইতেছ ভাই?"

ধূলি বলিল, "এক ছালা তেজপাতা লইয়া চলিয়াছি হাটে।"

দুইজনে নদীর এপার-ওপার পথ ধরিয়া চলিতেছে। আর প্রত্যেকে প্রত্যেকের বুদ্ধিতে শান দিতেছে, কী করিয়া একে অপরকে ঠকাইবে। ধূলি ভাবে, যদি আমার গাবের পাতার বস্তা বদল করিয়া ওর গোলমরিচের বস্তা লইতে পারিতাম! বালি ভাবে, যদি আমার কলার বীজের বস্তা বদল করিয়া ওর তেজপাতার বস্তা লইতে পারিতাম! কিন্তু কেউ কাহাকে কিছু বলে না, কেবল মনে-মনে নানা ফন্দিফিকির আঁটে! আর এ-কথা সে-কথা বলিয়া এ ওর আপন হইতে চায়।

অনেকক্ষণ পর বালি ধূলিকে বলে, "আচ্ছা ভাই! তোমার সঙ্গে যখন এতই খাতির হইল, আইস

আমরা একে অন্যের বোঝা বদলাবদলি করি।" ধূলি তো তাহাই চায়! সে তাহার গাবের পাতার বস্তার বদলে যদি গোলমরিচের বস্তা লইতে পারে তবে তো পোয়াবারো।

একটু কাশিয়া সে জবাব দেয়, "আগেকার দিনে রাজপুত্রেরা বন্ধুত্ব করিতে পাগড়ি-বদল করিত, এসো ভাই আমাদের বন্ধুত্ব হোক ছালা বদল করিয়া।" দুইজনেই দুইজনের কথায় খুশি।

বালি তাহার কলাবীজের বস্তা বদল করিয়া ধূলির গাবের পাতার বস্তা লইল। এ বলে আমি ওকে ঠকাইয়াছি। ও বলে আমি তাকে ঠকাইয়াছি! সেইজন্য কেউ কারো বস্তা পরীক্ষা করিল না।

বাড়িতে লইয়া গিয়া ধূলি দেখে, তার বস্তা ভরিয়া শুধু বিচেকলার বীজ। একটাও গোলমরিচের দানা নাই। বালিও তেমনি দেখিল, তার বস্তা ভরিয়া শুধু গাবের পাতা। প্রত্যেকে মনে-মনে হাসিল, আর এ ওর বুদ্ধির তারিফ করিতে লাগিল। কিন্তু দুইজনেই মনে-মনে ফন্দি আঁটিতে লাগিল কী করিয়া একে অপরকে ঠকাইবে।

পরদিন ভোরবেলায় বালি নদীর ওপারে চুলা জ্বালাইয়া তার উপরে এক হাঁড়ি গরম পানি জ্বাল দিতে লাগিল। নদীর এপার হইতে ধূলি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দোস্ত! কী করিতেছ?" বালি উত্তর করিল, "তোমার সঙ্গে গোলমরিচের বস্তা বদল করিয়া তেজপাতা লইয়া হাটে গিয়াছিলাম। আমার বেশ লাভ হইয়াছে। তাই সকাল-সকাল ভাত রান্না করিতেছি।"

ধূলি বলিল, "আমিও ভাই তোমার গোলমরিচ বেচিয়া বেশকিছু পাইয়াছি। কিন্তু আমার তো চুলা নাই। আমার কাছে কিছু চাউল আছে। তোমার হাঁড়ির মধ্যে ছাড়িয়া দেই। দুইজনে একসঙ্গে ভাত খাইব।"

বালি ভাবিল, "তা মন্দ কী! আমি তো শুধু পানি সিদ্ধ করিতেছি! ও যদি এর মধ্যে কিছু চাউল ছাড়িয়া দেয়, তবে ওর উপর দিয়াই আজিকার সকালের আহারটা সারিয়া লইব।"

প্রকাশ্যে বলিল, "তা বেশ তো, তোমার চাউল লইয়া আইস। আমরা একসঙ্গে রান্না করিয়া খাই।"

নদীতে পানি অল্প। হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। এপার হইতে ধূলি আসিয়া সেই উনানের পাশে বসিল। বালি যেই একটু ওদিকে তাকাইয়াছে, অমনি ধূলি তার কাপড়ের এক কানি একটা পোঁটলার মতো করিয়া ধরিল। যেন বালি বুঝিতে পারে, তার মধ্যে চাউল আছে।

তারপর বালিকে বলিল, "দ্যাখো—দ্যাখো ভাই। আকাশ দিয়া কেমন একটা পাখি যাইতেছে।"

পুবপারের ট্যাটন একটু চাহিয়াছে, অমনি ধূলি তার কাপড়ের পুঁটলি খুলিয়া হাঁড়ির মধ্যে চাউল ঢালিতেছে এরূপ ভান করিয়া কাপড় ঝাড়া দিতে লাগিল। তারপর হাঁড়ির মুখে ঢাকনা দিয়া দুইজনে চুলায় জ্বাল দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চুলায় জ্বাল দিয়া যখন তাহারা ঢাকনি খুলিল, তখন দেখা গেল হাঁড়ির মধ্যে শুধুই গরম পানি সিদ্ধ হইতেছে। একটাও ভাত নাই। একে অপরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া তাহারা সবই বুঝিতে পারিল।

বালি তখন ধূলিকে বলিল, "দ্যাখো ভাই। এখন সত্যই বুঝিতে পারিলাম, আমরা কেহ কাহারো চাইতে বুদ্ধিতে কম না। আমাদের এই মূল্যবান বুদ্ধি একে অপরের উপর ছাড়িয়া শুধুই সময় নষ্ট করিতেছি। এসো আমরা সত্যিকার বন্ধু হই। আমাদের দুইজনের বুদ্ধি একসঙ্গে ব্যবহার করিলে আমরা অনেক লাভ করিতে পারিব।"

ধূলি বলিল, "বেশ ভাই! আমি তাহাতে রাজি আছি।"

তখন দুই বন্ধু অনেক পরামর্শ করিয়া এ-দেশ ছাড়িয়া বহুদূরে আর-এক দেশে চলিয়া গেল। সেখানে যাইয়া শুনিল, এক বিদেশী সওদাগর কিছুদিন হইল মারা গিয়াছে।

তাহার টাকা-পয়সার অন্ত ছিল না। আত্মীয়স্বজনেরা তাহারা ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে।

এক গাছতলায় বসিয়া দুই ট্যাটন নানারকম ফন্দিফিকির করিতে যাইয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তারপর রাত্র হইলে সেই লোকটির কবর খুঁড়িয়া তার মধ্যে ধূলি লুকাইয়া রহিল।

পরদিন সকালবেলায় বালি সেই সওদাগরের বাড়ির সামনে যাইয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্না শুনিয়া পাড়ার সকলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদো কেন?"

সে বলিল, "এ-বাড়ির সওদাগর সাহেব ছিলেন আমার পিতা। তাঁর মরার খবর শুনিয়া আমি অমুক দেশ হইতে আসিয়াছি। কিন্তু আমার পিতার সমস্ত সম্পত্তি অপরে দখল করিয়া লইয়াছে। আমার জন্য কিছুই রাখে নাই।" এই বলিয়া সে আবার কাঁদিতে লাগিল।

বিদেশী লোক বলিয়া সবারই একটু দয়ার ভাব! আর লোকটি অমন ইনাইয়া-বিনাইয়া কাঁদিতেছে! তাহার কান্না শুনিয়া সকলের চোখে পানি আসিল।

কিন্তু সওদাগরের আত্মীয়স্বজনেরা বলিল, "ও যে সওদাগরের ছেলে তার প্রমাণ কী?"

বালি তখন কান্না থামাইয়া বলিল, "আমার পিতা আমাদের দেশে যাইয়া আমার মাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তারপর এদেশে আসিয়া আমাদের খবর লন নাই। আমি বিদেশী লোক। প্রমাণ কোথায় পাইব? মৌলভি সাহেবরা বলেন, মরা ব্যক্তির জান তার কবরের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। আপনজনের ডাকে তাহারা কখনও কখনও গায়েবি আওয়াজ করিয়া থাকেন। আসুন আপনারা আমার সঙ্গে। বাপজানের কবরের কাছে যাইয়া একবার তাহাকে ডাক দেই। যদি তিনি কথা বলেন, তবে প্রমাণ হইবে আমি তাঁহার সত্যিকার ছেলে।"

এ-কথা শুনিয়া সকলেই রাজি হইল। কবরের কাছে আসিয়া বালি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "বাপজান গো! তুমি মরিয়া গিয়াছ। আমাকে কিছু দিয়া যাও নাই। আমি যদি তোমার সত্যিকার ছেলে হই; তবে আমার ডাকে সাড়া দাও।"

গাঁয়ের লোকেরা অবাক হইয়া শুনিল, কবরের ভিতর হইতে গোঁ-গোঁ আওয়াজ হইতেছে। বালি তখন বলিল, "বাপজান গো! তোমার টাকা-পয়সা সকলে ভাগ করিয়া লইয়াছে। আমার কিছুই নাই। আমাকে কিছু দিয়া দাও।"

কবরের ভিতর হইতে ধূলি আওয়াজ করিল, "ও আমার সত্যিকার ছেলে। তোমরা ওকে সাত ছালা টাকা দাও। নতুবা তোমাদের খারাপ হইবে।"

সওদাগরের আত্মীয়স্বজনেরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বালিকে সাত ছালা টাকা দিয়া দিল। সেই টাকা গনিয়া-গাঁথিয়া ছালায় পুরিয়া—একটা গোরুর গাড়িতে বোঝাই করিয়া বালি বাড়ি রওয়ানা হইল।

ধূলি কবরের মধ্যেই পড়িয়া রহিল। একবারও বালি তাহার কথা মনে করিল না। দুপুরবেলায়, যখন কবরের কাছে কোনো জনমানব নাই, সেই সময় ধূলি কবর হইতে উঠিয়া জানিল, বালি আগেভাগেই টাকা লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে তখন শহরের দোকান হইতে খুব দামি একজোড়া জরির জুতা কিনিল; তারপর যে-পথ দিয়া বালি গোরুর গাড়ি লইয়া গিয়াছিল, তাহারই চাকার দাগ দেখিয়া দৌড়াইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সে বালির কাছাকাছি আসিয়া পৌছিল এবং অন্যপথে ঘুরিয়া দৌড়াইয়া তার খানিকটা সামনে যাইয়া একখানা জরির জুতা পথের মধ্যে রাখিয়া দিল।

তারপর আরও মাইলখানেক যাইয়া অপর জুতাখানা পথের আর-এক জায়গায় রাখিয়া দিয়া সে একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

বালি গোরুর গাড়ি লইয়া যাইতে গিয়া দেখে পথের মধ্যে একখানা সুন্দর জুতা পড়িয়া রহিয়াছে।

কিন্তু একখানা জুতা দিয়া কী কাজ হইবে? পরিতে তো পারিবে না। জুতাখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া সে পথের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

তারপর মাইলখানেক দূরে যাইয়া সে আর-একখানা জুতা দেখিতে পাইল। তখন সে ভাবিল, "আগের জুতাখানা যদি সঙ্গে আনিতাম, তবে তো দুইখানা একত্র করিয়া বেশ পায়ে দিতে পারিতাম। আর এই জুতাখানা আমার পায়েও বেশ লাগসই।" তখন সে গাড়ি থামাইয়া আগের জুতাখানা আনিবার জন্য দৌড় দিল।

ইতিমধ্যে ঝোপের আড়াল হইতে ধূলি আসিয়া গোরুর গাড়িতে উঠিয়া টাকাসমেত গাড়িখানা বাড়ির পথে চালাইয়া দিল।

এদিকে বালি দৌড়াইয়া আসিয়া গাড়ির কোনো খোঁজ পাইল না। সে তখন বুঝিতে পারিল, নিশ্চয়ই ইহা ধূলির কাজ। সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ধূলির বাড়ির দিকে ছুটিল।

ধূলি টাকা-পয়সা গনিয়া-গাঁথিয়া মাটির তলে পুঁতিয়া শুইবার আয়োজন করিতেছে; এমন সময় বালি আসিয়া বলিল, "দোস্ত! সবই বুঝিয়াছি। এবার টাকা-পয়সা ভাগ করিবার আয়োজন করো।"

ধূলি বলিল, "দোস্ত রাত অনেক হইয়াছে। কাল সকালে আসিয়া দুইজনে টাকা-পয়সা ভাগ করিয়া লইব।"

সারারাত জাগিয়া ধূলি তার বউয়ের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করিতে লাগিল, কী করিয়া বালিকে ঠকাইয়া সাত বস্তা টাকাই সে নিজে লইবে।

পরদিন সকালে বালি আসিয়া যখন তার দরজায় ঘা দিল, বউ তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "কাল রাত্রে তোমার দোস্ত মারা গিয়াছে। আমি এখন কোথায় যাইব গো!"

বালি জিজ্ঞাসা করিল, "দোস্ত মরিবার আগে টাকা-পয়সার কথা কিছু বলিয়াছে? সাত ছালা টাকা আমরা কাল লোক ঠকাইয়া আনিয়াছি।"

বউ তো যেন আসমান হইতে পড়িল! "কই, না তো, সাত ছালা টাকা? আমাদের ঘরে একটা আধলা পয়সা পর্যন্ত নাই। ওগো, আমি কেমন করিয়া বাঁচিব গো। কে আমাকে খাওয়াইবে গো!"

বালি সবই বুঝিল। সে বলিল, "বউ! তুমি কাঁদিও না। আমি তোমাকে বিপদে-আপদে দেখিব। আমার দোস্ত যখন মরিয়াই গিয়াছে, আমি কবর দিয়া আসি।"

এই বলিয়া সে ধূলির পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। টানিতে টানিতে তাহাকে কাঁটাগাছের মধ্যে দিয়া লইয়া যায়। ইটাখেতের মধ্যে দিয়া লইয়া যায়। কাঁটার খোঁচায়, ইটের ঘষায় তাহার হাতপা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তবু ধূলি কথা বলে না। কথা বলিলেই তো সাত বস্তা টাকার ভাগ দিয়ে হইবে!

এমনি করিয়া টানাটানিতে দুপুর গড়াইয়া সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত হইল। কিন্তু তবুও ধূলি কথা বলে না। তখন তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে এক বনের ভিতর। এখন অন্ধকারে বাড়ি ফিরিবারও উপায় নাই। বালি ধূলিকে এক গাছতলায় রাখিয়া, সে নিজে গাছের ডালে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

সে-পথ দিয়া একদল ডাকাত ডাকাতি করিতে যাইতেছিল। তাহারা দেখিতে পাইল, গাছের তলায় একটি মড়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া ডাকাতের সর্দার বলিল, "আজ বড় শুভযাত্রা রে ভাই! পথে একটি মড়া দেখিতে পাইলাম।" এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; ডাকাতেরা সাত বস্তা টাকা ডাকাতি করিয়া আনিয়াছে।

ফিরিবার সময় তাহারা এই গাছের তলায় আসিয়া টাকা ভাগ করিতে লাগিল। ডাকাতের সর্দার বলিল, "দ্যাখো ভাই! এই মড়াটা দেখিয়াছিলাম বলিয়াই আজ আমরা এত টাকা পাইলাম। এক কাজ

করি, একে আমাদের টাকার একটা ভাগ দেই।" অপর ডাকাত বলিল, "ও তো মরিয়া গিয়াছে, ওকে টাকা দিলে কাল হয়তো অপর কেহ আসিয়া লইয়া যাইবে। ও আর ভোগ করিতে পারিবে না। তার চাইতে এসো ভাই এক কাজ করি, ওকে এখানে কবর খুঁড়িয়া মাটি দিয়া যাই।"

তখন সকল ডাকাত একটি কবর খুঁড়িয়া যেই মড়াটিকে কবরে নামাইয়া দিবে, অমনি ধূলি হাতপা আছড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছে। গাছের উপর হইতে বালি তাদের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়াছে। ভয়ের চোটে টাকা-পয়সা ফেলিয়া সমস্ত ডাকাত দে চম্পট। তখন দুই বন্ধু হাসিতে হাসিতে এ ওর সঙ্গে কোলাকুলি করিল।

তারপর সেই সাত বস্তা টাকা আগের সাত বস্তার সাথে যোগ করিয়া তাহারা সমান-সমান ভাগ করিয়া লইল।

কা র্টু ন

গিয়াসউদ্দীন বুলবুল

র‍্যাফ্লেশিয়া

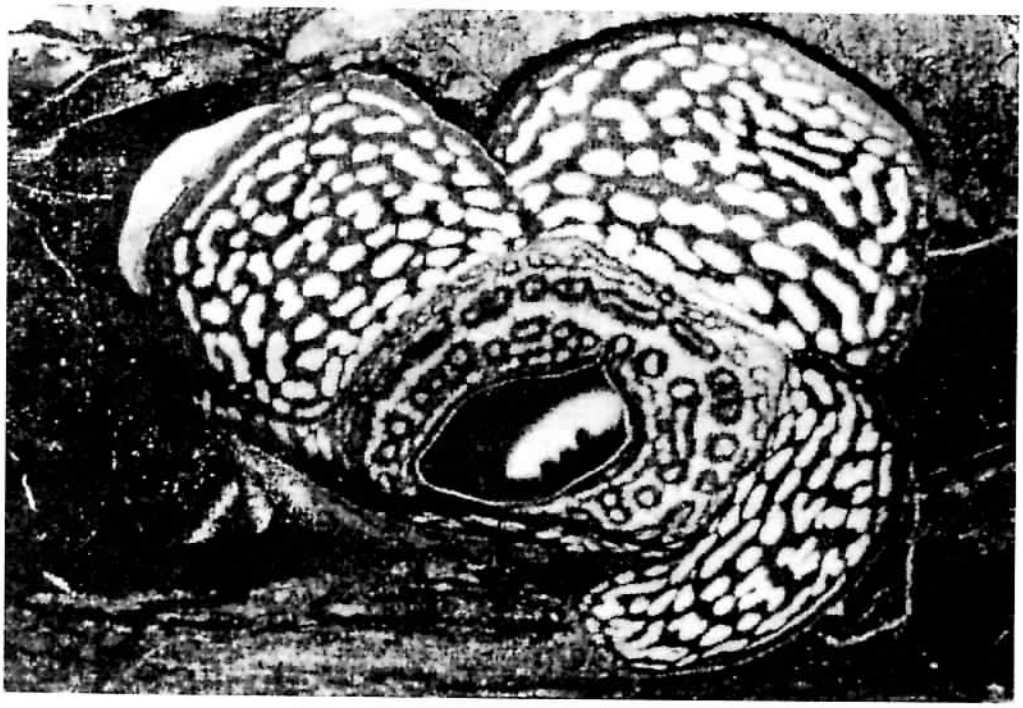

বিচিত্র আমাদের এই পৃথিবী। অসংখ্য ফুল-ফল আর গাছপালা এখানে। তার কোনোটি বিশাল, আবার কোনোটি এত ক্ষুদ্র যে খালিচোখে প্রায় দেখাই যায় না। তবে ফুলের ক্ষেত্রে মোটামুটি আমরা তিনটি ভাগ দেখতে পাই—বড়, মাঝারি ও ছোট। মাঝারি ধরনের ফুলই আমরা সচরাচর দেখতে পাই। শাপলা, গোলাপ, গাঁদা, জবা, কসমস প্রভৃতি মাঝারি ধরনের ফুল। ছোট ফুল বেশি দেখা না গেলেও বড় ফুলও কিন্তু আমরা খুব-একটা দেখি না। এই ফুলগুলো খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। বড় ফুলগুলোর মধ্যে সূর্যমুখী, র‍্যাফ্লেশিয়া উল্লেখযোগ্য।

'র‍্যাফ্লেশিয়া'—অদ্ভুত ধরনের এক ফুল। এর পুরো নাম র‍্যাফ্লেশিয়া আরনোলডি। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই ফুল বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে এ-ফুল বেশি ফোটে। তবে আশ্চর্য যে, এটি কিন্তু একটি পরগাছা-জাতীয় ফুল। একপ্রকার পরগাছায় এই ফুলটি ফোটে।

র‍্যাফ্লেশিয়ার পুরো জীবনটা সত্যিই সৃষ্টিছাড়া। প্রায় এক থেকে দেড় বছর লাগে এর কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুটতে। কিন্তু ফোটার মাত্র দুদিনের মধ্যেই সব শেষ! র‍্যাফ্লেশিয়ার সমস্ত গাছটাই ওর মূল। এই পরগাছাটি যে-গাছে জন্মে তার শিকড়ে হয় র‍্যাফ্লেশিয়া। বিশাল আকৃতির এই ফুল। এতবড় ফুল পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি চোখে নেই। মুকুল থেকে ফোটার সময় এর ব্যাস হয় ৩৪ মিটার এবং ফুল ফোটা সম্পূর্ণ হলে ৯০ মিটার। ওজনটাও নেহাত কম নয়— প্রায় ১০ কেজি। সাধারণত এর পাপড়ি হয় ৫টি। সেগুলো মাটির সাথে সমান্তরালভাবে থাকে। এগুলোর রং সাধারণত ইটের মতো লালচে, কখনো গাঢ়-বেগুনি। এই ফুলের সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার-স্যাপার দেখে জার্মানির এক উদ্ভিদবিদ্যা-বিশারদ একে 'পাগলা গাছ' বলে অভিহিত করেছেন।

১৮১৮ সালে জাভার লে. গভর্নর স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফ্লেশ এবং বিশিষ্ট প্রকৃতিবিজ্ঞানী ড. যোশেফ আরনোলড ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় এই আশ্চর্যজনক ফুলটি আবিষ্কার করেন। তাঁদের নামানুসারেই এই ফুলের নামকরণ হয় 'র‍্যাফ্লেশিয়া আরনোলডি'।

বাস্কেটবল খেলা প্রথম কোথায় হয়েছিল?

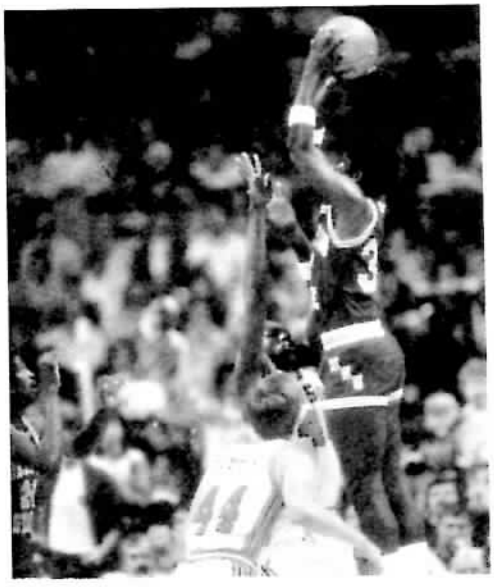

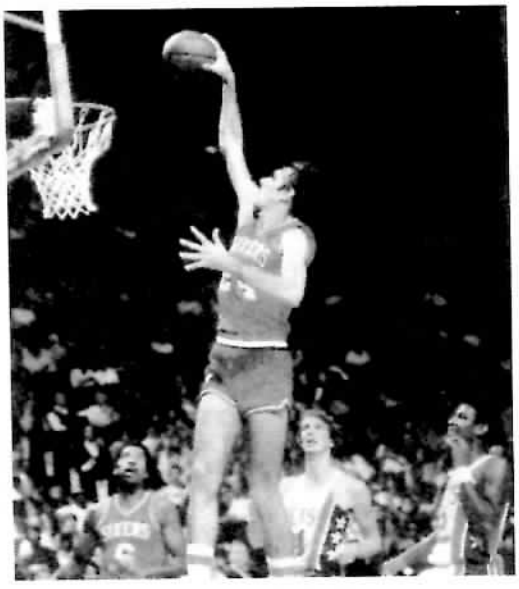

আজ বাস্কেটবল খেলা পৃথিবীব্যাপী এক জনপ্রিয় খেলা। প্রকৃতপক্ষে, এ-খেলার প্রথম সূত্রপাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। খেলাটি ম্যাসাচুসেটসের অন্তর্গত স্প্রিংফিল্ড নামক জায়গায় 'ইন্টারন্যাশনাল ইয়ং মেনস ক্রিশ্চিয়ান' কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। নাইসমিথ ঐ স্কুলের একজন ক্রীড়াশিক্ষক ছিলেন। স্কুলের ছেলেমেয়েরা গতানুগতিক ব্যায়াম বা খেলাধুলায় একঘেয়েমি বোধ করত বলে তারা এর কিছু একটা পরিবর্তন চাচ্ছিল। তাই নাইসমিথ নতুন এমন এক খেলার কথা ভাবতে লাগলেন—যা ছেলেমেয়েদের আগ্রহ জাগাবে। তিনি 'রেড-ইন্ডিয়ান ল্যাক্রেসে' ও 'ব্রিটিশ ফুটবল' খেলার নিয়ম থেকে নানা উপাদান নিয়ে এই নতুন বাস্কেটবল খেলাটি সৃষ্টি করেন।

ল্যাক্রেসে খেলার মতো এই নতুন খেলাটিতে লাঠি স্টিকের দরকার হয় না। ফুটবল খেলার মতো এর বলটিকে পা দিয়ে লাথি মারারও দরকার করে না। এতে শুধু বলটিকে ছুড়ে একটি বাস্কেটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানোর চেষ্টা হয়। আর এইজন্য খেলাটির নাম হয়েছে বাস্কেটবল খেলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীব্যাপী এর জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

দুইটি দলে প্রতিযোগিতাটি হয়। এক-এক দলে ৫ জন করে খেলোয়াড় থাকে। খেলার জায়গাটি আয়তাকার। লম্বায় জায়গাটি ২৬ মিটার আর চওড়ায় ১৪ মিটার। আয়তাকার ক্ষেত্রে উভয়প্রস্থের মাঝামাঝি জায়গায় দুইটি বাস্কেট খুঁটির সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কোনো দল অপরপক্ষের বাস্কেটের মধ্য দিয়ে বলটিকে গলিয়ে দিতে পারলেই একটি গোল করেছে বলা হয়।

প্রথম বাস্কেটবল প্রতিযোগিতাটি খেলা হয় ১৮৮২ সালের ২০ জানুয়ারি। ১৯৩৬ সালে খেলাটি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পর থেকে আমেরিকার দল পরবর্তী ৭টি অলিম্পিকে খেলায় বিজয়ী হয়। ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইংলিশ বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন'।

'খেলাধুলার আইন-কানুন' বই থেকে

ফররুখ আহমদ

শাহজাদা

ছিল এক ফুটফুটে বাদশাজাদা
দুধের মতন তার মনটা সাদা।
একদিন এই কথা শা'জাদা ভাবে
: মাল্লা, সারেঙ নিয়ে সফরে যাবে।

যেই ভাবা সেই কাজ...কিশ্‌তি কিনে
দরিয়ায় চলে ভেসে মেঘলা দিনে।
মাঝ পথে হল তার জাহাজডুবি,
নাকানি চুবানি তাই খেল সে খুব-ই।
লোক-লশকর তার গেল যে ভেসে,
শা'জাদা সাঁতার কেটে বাঁচল শেষে।

অচেনা মুলুকে একা শা'জাদা ভাবে
যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে যাবে।
বহু মাঠ পাড়ি দিয়ে বনের শেষে
অচেনা মহলে এক দাঁড়াল এসে।
ছায়া-ঘেরা থমথমে বাড়িটা যেন,
লোক নাই জন নাই...ভাবে... সে কেন...

বন্ধ দরজা...পাশে দেখে শা'জাদা
বক্‌রি ও বাঘ...দুটো রয়েছে বাঁধা।
বক্‌রির কাছে গোশ্‌ত, বাঘের কাছে
শুকনো বিচালি খড় সাজানো আছে।

তাজ্জব হয়ে ভাবে শা'জাদা একা
এমন কখনো আর যায়নি দেখা!
বক্‌রিকে দিয়ে গোশত, বাঘের মুখে
ঘাস দিয়ে আটকাতে পারে যে সুখে

হয়তো সে লোক হবে কাজের কাজি;
অথবা হতেও পারে হদ্দ পাজি।

খোরাক বদল করে দেয় যখনি
মহলের দরজাটা খোলে তখনি।

তাজ্জব হয়ে ফের সিঁড়ি ডিঙিয়ে
শা'জাদা আপন মনে যায় এগিয়ে।
শিথানে পাথর আর পাথর পায়ে
দেখে এক শাহজাদী আছে ঘুমায়ে,
পাথর বদল করে দেয় যখনি
ঘুম থেকে শাহজাদী জাগে তখনি।

বাদশাজাদার কাছে বলে সে পরে,
"আমার মুলুক দূর দেশান্তরে,
আমাকে রেখেছে দেও বন্দি করে,
মারতে কি পারো তাকে ফন্দি করে?"

শা'জাদা বলেন, "যারা জুলুম করে
নিজেদের জুলুমেই নিজেরা মরে।
ঝটপট যাব আমি মারতে তাকে,
একটা সওয়াল শুধু করি তোমাকে।
জওয়াবটা দাও ঠিক যদি জানো তা—
দেওটা কোথায় থাকে; প্রাণটা কোথা?"

শা'জাদি বলেন, "দেও পাহাড়ে থাকে,
তালাবের মাঝে প্রাণ লুকিয়ে রাখে।
সোনার কৌটা, তাতে ভোমরা কালো
হাতে যদি পাও তবে বুঝবে ভালো,
অতল দীঘির মাঝে তেপান্তরে।
ভোমরাটা মরলেই দেওটা মরে।"

আল্লার নাম নিয়ে যায় শা'জাদা
মানবে না জালিমের কোনো সে বাধা,
দীঘির অতলে ডুবে নেয় সে তুলে
সোনার কৌটা, যেই দেখে সে খুলে
ভোমরা পালায় উড়ে সুর্মা কালো,
শা'জাদা ব্যাপারখানা বুঝল ভালো।

আগু বেড়ে ভোমরাকে ধরল জোরে,
অমনি ছুটল দেও শব্দ করে,
লাখ মণ পাথরের ছুড়ল ঢেলা,
দুপুরটা হল যেন সন্ধ্যা বেলা,
বিষম আওয়াজ আর হট্টগোলে
ঝালাপালা হল কান ঝড়ের রোলে।

হাঁউ মাঁউ খাঁউ বলে বিষম তেড়ে
দেওটা তো এসে গেল মুণ্ড নেড়ে।
হুটোহুটি লুটোপুটি হল যে কত
সাধ্যটা নাই কারো বলবে অত!

শা'জাদা উঠল ঘেমে দীঘির ধারে,
দেও বুঝি এইবার জানেই মারে,
অমনি পড়ল মনে তেপান্তরে
: ভোমরাটা মরলেই দেওটা মরে।

ভোমরার ডানা টেনে ছিঁড়ল যদি
হাত ভাঙা দেও হল রক্ত নদী।
ভোমরার ঠ্যাং টেনে ছিঁড়লে পরে
হাঁটু-ভাঙা সেই দেও চেঁচিয়ে মরে।
ভোমরার মাথা টেনে যখন ছেঁড়ে
শেষ হয়ে যায় দেও মুণ্ডু নেড়ে।

সোনার কৌটা নিয়ে শা'জাদা চলে
যেখানে শা'জাদী জাগে ঘুম-মহলে।

কিস্‌সা কাহিনী বলে রাত্রিশেষে
চলে যায় দুইজন দূরের দেশে,
পরেন্দা ঘোড়া—এক পঙ্খীরাজে
তাদের চলার সুর হাওয়ায় বাজে ॥

খায়রুল আলম সবুজ

উত্তরমেরুর শাদা ভালুক

আদিগন্ত বিস্তৃত শাদা বরফজমানো আর্কটিক অঞ্চল। উত্তরমেরুর সমস্তটা জুড়েই এই একই চেহারা। এর মাঝেই বাস করে শ্বেতভালুক। সারাটা অঞ্চল তারা চষে বেড়ায়। তুষার-জড়ানো কঠিন বরফ, তার মধ্যে শ্বেতভালুকেরা একা-একা ঘুরে বেড়ায়। কখনো আবার ভাসমান বরফের দ্বীপে চড়ে খোলা সমুদ্রে শত শত কিলোমিটার চলে যায়। শ্বেতভালুক সাঁতারেও খুব দক্ষ।

শ্বেতভালুকেরা সারাবছর চলার উপরেই থাকে। এখান থেকে ওখানে। মেয়ে-ভালুকেরা অবশ্য শীতের সময়টা বাচ্চাদের নিয়ে গুহার মধ্যে থাকে। তারা একেবারেই বাইরে আসে না। শীতের দিনগুলো আসার আগে শ্বেতভালুকেরা তুষারস্তরের নিচে বরফ খুঁড়ে গুহা তৈরি করে। এখানে এই গুহাতেই তাদের বাচ্চা জন্মায়। মা ও বাচ্চারা এই গুহার মাঝে জড়াজড়ি করে সারাটা শীত কাটিয়ে দেয়। এই সময় মা আর তেমন কিছুই খায় না। সারাবছর ধরে দেহে জমানো চর্বিতেই তার চলে যায় আর বাচ্চারা শুধু মায়ের দুধ খেয়েই থাকে। মা ও বাচ্চারা যে-সময় এভাবে কাটায় অন্য ভালুকেরা সে-সময় কনকনে ঠাণ্ডা অন্ধকারের মাঝে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। খাদ্য বলতে বিশেষভাবে সিলমাছ। বরফের গায়ে একধরনের গর্ত থাকে। মূলত তারা এই গর্ত খোঁজে। গর্ত দেখলেই তারা বুঝতে পারে কোনটাতে সিল আছে। বরফের নিচে ঠাণ্ডা পানির স্রোত। এই পানিতে সাঁতার কাটতে-কাটতে সিলমাছেরা এই গর্তগুলো তৈরি করে। তারা হঠাৎ-হঠাৎ এই গর্তের ভেতর থেকে মাথা উঠিয়ে বুক ভরে শ্বাস নেয়। এসব খবর শ্বেতভালুকেরা আবার খুব ভালো করে রাখে।

তারা তাই এসব গর্তের পাশে ঘাপটি মেরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে। সিলমাছও শ্বেতভালুকের খবর রাখে, সুতরাং তারা সবকিছু বুঝেসুজেই গর্ত থেকে মাথাটা তোলে। তা হলে কী হবে, প্রকৃতির নিয়মই আলাদা। কোনো একসময় ঘটনাটা ঘটেই যায়। ভালুক আর দেরি করে না। প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে এক ঝটকায় মাছটাকে উপরে তুলে আনে। মেরুপ্রদেশের শ্বেতভালুকেরা প্রধানত মাংসই খায়। তবে গ্রীষ্মের সময় গাছের শিকড়বাকড়, লতাগুল্ম, এসবও খায়।

কিছুকাল আগে থেকে মানুষ উড়োজাহাজ এবং স্পিডবোটে এসে এইসব ভালুক শিকার করতে শুরু করেছে। অল্পদিনেই এত ভালুক মারা পড়েছে যে এদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমতে শুরু করেছে। এখন অবশ্য আইন করে শ্বেতভালুক শিকার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

হাস্যকৌতুক

১. এক লোক মশার জ্বালায় আর থাকতে পারে না। মশারি টাঙিয়ে শোয়। মশারির ভিতরে কটি জোনাকি পোকা ঢুকে যায়। মাঝরাতে লোকটির ঘুম ভাঙে। চোখ খুলে জোনাকি পোকাকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে ওঠে, "আল্লাহ রক্ষা করো"—মশা আমাকে হারিকেন জ্বালিয়ে খুঁজছে।"

২. একটি বিদ্যালয়ের গণিত স্যার ছিলেন খুব রাগী। একজন নতুন ছাত্র ভরতি হল ঐ স্কুলে। প্রথমদিন স্যার তার নাম জিজ্ঞেস করায় ছাত্রটি বলল, "স্যার আমার নাম রনি"।
স্যার খুব রেগে গেলেন। বললেন, "নামের আগেপিছে কিছু বলনি কেন?"
এই বলে স্যার খুব জোরে একটি ধমক দিলেন।
ছাত্রটি ভয়ে পরদিন স্কুলে এল না। স্যার তার বাসায় গেলেন।
রনির মা বললেন রনি মাছ ধরতে গেছে।
স্যার পুকুরের পাশে এসে রনিকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী মাছ ধরছ?"
রনি উত্তর দিল, "মোহাম্মদ টাকি আহমেদ মাছ ধরছি স্যার।"

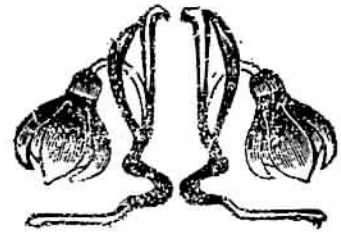

বিলিভ ইট অর নট

সম্রাট শাহজাহানের চিকিৎসক

মোঘল সম্রাজ্যের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য সম্রাট ছিলেন শাহজাহান। তাঁর তৈরি তাজমহল আজও সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা বিস্ময়।

কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের শেষজীবনটা ছিল বড় মর্মান্তিক। শেষ বয়সে তিনি পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক হয়েছিলেন সিংহাসনচ্যুত এবং গৃহবন্দি।

তিনি যখন বন্দি হন তখনকারই ঘটনা এটি।

সম্রাট শাহজাহানের বিশ্বস্ত চিকিৎসক ছিলেন—মুকাররম খান। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর যেমন ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য, তেমনি তিনি ছিলেন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি।

সম্রাট শাহজাহান যখন বন্দি তখনো তিনি ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন বৃদ্ধ সম্রাটের।

তখন দিল্লির সিংহাসনে আসীন ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। সম্রাট একদিন ডেকে পাঠালেন চিকিৎসক মুকাররম খানকে। তারপর দিলেন এক নিষ্ঠুর আদেশ। অতি সঙ্গোপনে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করতে হবে বৃদ্ধ সম্রাটকে।

আদেশ শুনে আঁতকে উঠলেন মুকাররম খান। তাঁর গোটা শরীর কাঁপতে লাগল থরথর করে।

কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না নতুন সম্রাটকে। কারণ তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবকে খুব

ভালো করেই চিনতেন।

আওরঙ্গজেব যাকে শত্রু কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতনে তার পক্ষে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব হত না। সিংহাসন অধিকারের জন্য তিনি হত্যা করেছেন তাঁর সকল ভাইকে এবং বন্দি করেছেন বৃদ্ধ পিতাকে। কেউ তাঁর স্বার্থের কাছে ক্ষমা পায়নি।

এখন এই বন্দি ও ক্ষমতাহীন বৃদ্ধ পিতাও তাঁর কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সম্রাট শাহজাহানের জনপ্রিয়তাকে তখনো ভয় করছিলেন আওরঙ্গজেব। তিনি জানতেন বন্দিশালা থেকে বের হয়ে একবার যদি কোনোরকমে জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন বৃদ্ধ সম্রাট, তখন আওরঙ্গজেবের কোনো শক্তিই পারবে না তাঁকে রোধ করতে।

তাই পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলবারই সিদ্ধান্ত নিলেন আওরঙ্গজেব। সিদ্ধান্ত নিলেন বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করার। আর সেই নিষ্ঠুর কর্ম সমাধা করারই দায়িত্ব পড়ল চিকিৎসক মুকাররমের ওপর।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সামনে কিছু বলতে পারলেন না মুকাররম। মাথা নিচু করে ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

তারপর ভাবতে লাগলেন কী করবেন।

মুকাররম জানতেন, এ-আদেশ পালন না করে তাঁর কোনো উপায় নেই। অবাধ্যতার কী পরিণাম হবে তা তাঁর অজানা নয়। তাঁর সামনে এখন দুটো পথ খোলা--হয় সম্রাটকে হত্যা করা, নাহয় নিজে আত্মহত্যা করে আওরঙ্গজেবের হিংস্রতার নাগালের বাইরে চলে যাওয়া।

কিন্তু নিষ্পাপ এবং বৃদ্ধ সম্রাটকে হত্যা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে তিনি তাঁর রোগী। কোনো চিকিৎসক কখনো কোনো রোগীর অমঙ্গল-চিন্তা করতে পারে না। এটা চিকিৎসা-ধর্মের অপরাধ। এমন পাপকর্ম তিনি করতেই পারেন না।

অতঃপর তাঁর জন্য দ্বিতীয় পথটাই খোলা রইল। যে-বিষ প্রয়োগ করে সম্রাট শাহজাহানকে হত্যা করার কথা ছিল, সেই বিষ নিজেই পান করে আত্মহত্যা করলেন। তবু তাঁর হাত দিয়ে যেন তাঁর রোগীর কোনো ক্ষতি না হয়।

মুকাররমের আত্মহত্যার সংবাদ পেয়েছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। আওঙ্গজেব ছিলেন চতুর মানুষ। কেন মুকাররম আত্মহত্যা করেছেন তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

তারপর অবশ্য আর দ্বিতীয় কাউকে পিতৃঘাতক নিয়োগ করেননি আওঙ্গজেব। এই বন্দি অবস্থাতেই দীর্ঘ ১২ বছর নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে দুঃসহ মানসিক আঘাত সহ্য করতে-করতে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহান।

জাতীয় সংগীতের কথা

স্পেন, বাহরাইন ও কাতারের জাতীয় সংগীতে কোনো শব্দ নেই। জাপান, জর্ডান ও সান মারিনোর জাতীয় সংগীত চার লাইনের। নবম শতাব্দিতে লিখিত জাপানের জাতীয় সংগীত (কিমিগায়ো) সবচেয়ে পুরনো। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত সবচেয়ে দীর্ঘ (১৫৮) পদ। ২৩টি দেশের জাতীয় সংগীতে কোনো শব্দ নেই।

আমীরুল ইসলাম

বিচার নেই

বাদশাহর কঠিন অসুখ। সারাদিন তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন। শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হচ্ছে। মনে কোনো সুখ নেই। কাজকর্ম করতে পারেন না।

বেঁচে থাকার আর-কোনো আশা নেই তাঁর। বাদশাহ বুঝলেন, মৃত্যু তাঁর দুয়ারে এসে হানা দিয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে চিকিৎসকরা এল। নানারকমের ওষুধ দিল। কিন্তু কিছুতেই কোনো উপকার হয় না।

সকলেই খুব চিন্তিত।

চিকিৎসক এলেন ইরান-তুরান থেকে। চিকিৎসক এলেন কাবুল-কান্দাহার থেকে। শেষে এক চিকিৎসক এলেন গ্রিস থেকে।

গ্রিসের চিকিৎসক বেশ কয়েকদিন ধরে সব ধরনের পরীক্ষা করলেন বাদশাহকে। নাড়ি টিপে দেখলেন। শরীরের তাপ নিলেন। তারপর তিনি বললেন : এ বড় কঠিন অসুখ। তবে এর চিকিৎসা আছে। একজন অল্পবয়স্ক বালক প্রয়োজন, যার হৃৎপিণ্ড থেকে ওষুধ তৈরি করতে হবে। সেই ওষুধে বাদশাহ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বাদশাহর অসুখ। প্রয়োজন অল্পবয়স্ক বালক। দিকে-দিকে লোক ছড়িয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে একটা ছেলেকে পাওয়া গেল। ছেলের বাবা টাকার বিনিময়ে খুব অনায়াসে ছেলেটিকে বিক্রি করে

দিল বাদশাহর লোকদের কাছে। টাকাও পেল বিপুল পরিমাণ।

কাজি বিচারসভায় রায় দিলেন : এই ছেলের জীবন বধ করা অন্যায় কোনো কাজ নয়। কারণ এই ছেলের তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে বাদশাহর মূল্যবান জীবন রক্ষা পাবে।

ছেলেটি এইসব ঘটনা দেখে আর সারাক্ষণ মিটিমিটি হাসে। জল্লাদ তাকে হত্যা করার জন্যে ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে বধ্যভূমিতে। তার হৃৎপিণ্ড থেকে তৈরি হবে ওষুধ। ছেলেটি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হাসতে লাগল। বাদশাহ পেছনে ছিলেন। ছেলেটির হাসির শব্দ শুনে তিনি খুব বিচলিত হলেন। একটু পরেই তার মৃত্যু হবে! মাটিতে লুটিয়ে পড়বে তার সুন্দর দেহ। তা হলে ছেলেটি প্রাণ খুলে হাসে কেন? বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠালেন।

—তুমি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এরকমভাবে হাসছ কেন?

ছেলেটি হাসতে-হাসতেই বলল : হায়, আমার জীবন! আমি হাসব না তো কে হাসবে বলুন? পিতামাতার দায়িত্ব সন্তানদের রক্ষা করা। কিন্তু দেখুন, কিছু অর্থের বিনিময়ে আমার বাবা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। কাজির দরবারে মানুষ যায় কেন? সুবিচারের আশা নিয়ে। কিন্তু কাজি সাহেব অন্যায়ভাবে বাদশাহর পক্ষ নিলেন। আমাকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। আর বাদশাহর কর্তব্য কী? বাদশাহ তো গরিব-দুঃখী, অত্যাচারিত, নিপীড়িত প্রজাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু এখন কী ঘটতে যাচ্ছে আমার জীবনে? বাদশাহ নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য অন্যের জীবনকে তুচ্ছ করছেন। কিন্তু অপরের জীবনও যে তার নিজের কাছে অতি মূল্যবান—এই সামান্য কথা তিনি মনেই রাখলেন না। হায়! একটু পরেই আমার মৃত্যু হবে। আমি হাসব না তো কে হাসবে! জগৎ-সংসারের এইসব খেলা দেখে একমাত্র আমিই এখন প্রাণ খুলে হাসতে পারি।

বাদশাহ এই শুনে অবাক হলেন। ছেলেটির প্রতি অসীম মমতায় তিনি কাতর হয়ে উঠলেন। তিনি ছেলেটিকে মুক্ত করে দিলেন।

আর আশ্চর্যের ব্যাপার—

তার কিছুদিন পরেই বাদশাহর অসুখ সেরে গেল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

হেমিংওয়ের ঠিকানা

বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আশায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন। কখন কোথায় থাকতেন তা সহজে জানবার উপায় ছিল না। একবার কিউবা ভ্রমণের সময় তিনি এক ভক্ত-পাঠকের চিঠি পেলেন। চিঠিতে ঠিকানার জায়গায় লেখা : টু আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, গড নোজ হয়ার।

পত্রলেখক অল্পদিনের মধ্যেই হেমিংওয়ের জবাব পেলেন। হেমিংওয়ে লিখেছেন : তুমি ঠিকই লিখেছ। আমি কোথায় থাকি ঈশ্বর জানতেন।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞান

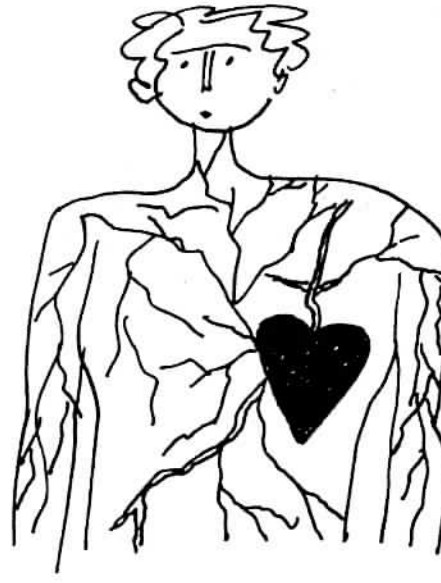

আমরা সকলেই স্বাস্থ্য চাই। রোগকে আমরা চাই এড়িয়ে চলতে। রোগ হলে আমরা কাজে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ি। তখন দুশ্চিন্তা আসে মনে এবং জীবনটা হয়ে পড়ে দুঃখময়।

দেখ যাক বা না-যাক রোগ আমাদের দেহের যে-কোনো জায়গায় হতে পারে। একমাত্র খাদ্যের দোষেই যে আমাদের রোগ হয়, তা ঠিক নয়। অধিকাংশ রোগই অতি ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে, দেহযন্ত্রের গোলযোগে, ভিটামিনের অভাবে এবং আরও অনেক কারণে হয়ে থাকে।

পানি আর বাতাস আমাদের জীবনরক্ষার বড় সহায়। আবার এই পানি-বাতাসের মাধ্যমেই কত রোগজীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে যার শেষ নেই। বাতাসের মধ্যে আছে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অসংখ্য জীবাণু। আমরা যেন চারদিকে অজস্র শত্রু নিয়ে বাস করছি। ট্রেনের কামরায় লেখা থাকে : 'নিজ নিজ মালের প্রতি নজর রাখো। চোর, জুয়াচোর, পকেটমার নিকটেই আছে।' কিন্তু ট্রেনের বাইরে কী করে আমরা এত চোর-জুয়াচোর ও পকেটমার রোগজীবাণুর মধ্যে বেঁচে আছি—ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

কিন্তু ব্যাধিকে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থাও দেহের মধ্যে অনেকগুলি আছে। বাইরের রোগজীবাণুকে দেহের চামড়া বাধা দেয় সর্বপ্রথম। অবশ্য চামড়ায় কোনো ক্ষত থাকলে রোগজীবাণু সেখান দিয়ে সহজে ঢুকতে পারে। ঢুকে পড়ে তারা রক্তকে দূষিত করতে এবং নিজের বংশবৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু রোগজীবাণু শরীরে ঢুকে পড়া মাত্রই দেহ তার সুরক্ষিত সৈন্য শ্বেতরক্তকণিকাগুলিকে কাজে লাগায়। তারা জীবাণুগুলিকে প্রথমে ঘেরাও করে, তারপর চেপে ধরে তাদের সাবাড় করে দেয়। কিন্তু রোগজীবাণুর সংখ্যা যেখানে বেশি, যেখানে তারা অধিক শক্তিমান—সেখানে শ্বেতকণিকাগুলি তাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। দেহকে তখন রোগে কাবু করে ফেলে।

আমাদের দেহ যেন একটি আধুনিক বাড়ি

বাড়িতে যেমন থাকে আড়া-বরগা, দেওয়াল, পলেস্তরা বা বহিরাবরণ, পানির নল, পাম্পকল, বায়ু-চলাচলের যন্ত্র, রান্নাঘর, ভাঁড়ার, পায়খানা; থাকে টেলিফোন, বৈদ্যুতিক তার প্রভৃতি, আমাদের শরীরেও থাকে এমনি অনেক জিনিস। আমাদের শরীরের হাড়গুলোও যেন আড়া-বরগা, পেশি যেন দেওয়াল আর চামড়া যেন চূণ-বালির পলেস্তরা। রক্তনালিগুলিকে পানির নল এবং হৃৎপিণ্ডকে তার পাম্পকল বলা যেতে পারে। ফুসফুসকে বায়ু-চলাচলের যন্ত্র আর পাকস্থলীকে রান্নাঘর বলা যেতে পারে। যকৃৎ যেন ভাঁড়ার; মূত্রাশয় ও বৃহদন্ত্র যেন ড্রেন পায়খানা। আমাদের মস্তিষ্ক টেলিফোন-কেন্দ্র এবং স্নায়ুজালগুলি যেন ওর বৈদ্যুতিক তার। বাড়ির লোহার সিন্দুকে থাকে গৃহস্বামীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস, আমাদের দেহেরও সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হচ্ছে হৃৎপিণ্ড। সেটা থাকে বুকের পাঁজরায় হাড়ের তৈরি শক্ত একটি খাঁচার মধ্যে।

দেহের সঙ্গে আধুনিক বাসগৃহের এই সাদৃশ্যটা সত্যিই বিস্ময়কর। কিন্তু তবু তাদের পার্থক্যও কম নয়। বাড়িটা দেহের মতো আপনা থেকে বৃদ্ধি পায় না, চলে ফিরে বেড়াতে পারে না, তার কোনো সুখ-দুঃখ বোধ বা অনুভূতিও নেই যা শরীরের আছে।

পল্লি-অঞ্চলে চালাঘরই বানাও আর শহরের আধুনিকপদ্ধতির ঘরই বানাও—তাতে লাগে কতকগুলি খুঁটি, আড়া-বরগা অথবা লোহার স্ট্রাকচার। মজ্জা, শিরা প্রভৃতি জিনিস দিয়ে ওটা গঠিত হয়েছে। আমাদের এই সুশ্রী দেহটা থেকে চর্ম, মেদ, শিরা-উপশিরা, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, চোখ, নাক প্রভৃতি তুলে নিলে যেটা থাকে সেটা মোটেই সুশ্রী নয় দেখতে—আঁতকে উঠতে হবে দেখলে সেই নরকঙ্কাল।

তোমরা যখন ফুটবল খ্যালো, তখন একজনই বলটা নিয়ে ছুটাছুটি করো না। এগারোজন প্লেয়ার প্রত্যেকেই নিজের কাজ করো, পরস্পর সহযোগিতা করো; সকলের সমবেত চেষ্টায় তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আমাদের দেহেরও প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নির্দিষ্ট কাজ আছে। এদের একটি অপরকে সাহায্য করে। যেমন খাদ্য হজম করবার কাজে মুখ, দাঁত, জিভ, গলনালি ও পাকস্থলী একযোগে কাজ করে। তেমনি নাক, কণ্ঠনালি ও ফুসফুসের যোগাযোগে শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যে শরীরের দূষিত বায়ু দূরীভূত হয়ে বিশুদ্ধ বায়ু শরীরে যায়।

রোগের প্রতিকার

শরীরটা 'ব্যাধি-মন্দির' হলেও ব্যাধিটা কিন্তু শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। কাজেই রোগটা ধরা পড়লেই তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে আসছে যুগে-যুগে নানাভাবে।

আদিমকালের লোকেরা প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েই চিকিৎসা করতে আরম্ভ করে। এজন্য তারা লতা-পাতা, ধাতু ও ফুল-ফলের মধ্যে মাটি, পানির ধারা ও সূর্যরশ্মিতে রোগ প্রতিকারের পথ খুঁজে পায়। তখনকার লোকে জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করত। রোগনিবৃত্তির জন্য পুরোহিত ডেকে তারা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির ব্যবস্থা নিত। কেউ-কেউ তাবিজ, কবচ, মাদুলি প্রভৃতিও ধারণ করত।

তখন রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্য সহজ সুযোগ ছিল না। সেইজন্য অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তিও চিকিৎসক হয়ে পড়ত। এদের বলত হাতুড়ে-চিকিৎসক।

কিন্তু তাই বলে সবাই তখন হাতুড়ে-চিকিৎসক ছিল তা মনে কোরো না যেন। গ্রিস, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ প্রাচীনকালে চিকিৎসাবিদ্যায় খুব নাম করেছিল। করলে কী হবে, তখন তো আর এখনকার মতো এক দেশের সঙ্গে আর-এক দেশের এত সহজ-যোগাযোগ ছিল না। এখন সংবাদপত্র আছে, রেডিও আছে, টেলিভিশন আছে। প্লেনে যাতায়াতের এবং দেশান্তরে গিয়ে কিছু শিখে আসবার

যথেষ্ট সুযোগ আছে। কেউ নতুন কিছু আবিষ্কার করলে সঙ্গে-সঙ্গে সে-খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা সভ্যজগতে। প্রাচীনকালে কেউ কিছু বড় কাজ করলে, অন্য দেশে তার খবর পৌছত অনেক দেরিতে।

প্রাচীনকালে আমাদের এই উপমহাদেশও চিকিৎসাবিদ্যায় এগিয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। প্রাচীন ভারতের বিশিষ্ট চিকিৎসক—সুশ্রুত। অনেকরকম চিকিৎসার কথা তিনি বলে গেছেন তাঁর বইতে। সাপের কামড়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি কতরকমের সাপ আছে, বিষাক্ত সাপের কোন তিথিতে কীরকম বিষ থাকে, কীভাবে তারা কামড়ায়—সব বলেছেন। চিকিৎসার কথায় তিনি বলেছেন, প্রথমেই বাঁধন দিতে হবে। তারপর সাপে-কামড়ানো জায়গাটা চিরে, চুষে দূষিত রক্ত বের করে দেওয়ার কথা বলেছেন। আরও অনেক কথা বলেছেন তিনি এ-সম্বন্ধে যা আজকালকার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতির সঙ্গে বেশ মিলে যায়। কেবল রোগ-চিকিৎসাই নয়, শল্যচিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলে গিয়েছেন। সুশ্রুত তাঁর 'সংহিতা' বইতে অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে সম্মোহনী দিয়ে অচেতন করে তার উপর অস্ত্রোপচার করতে বলেছেন। তারপর তাকে অন্য ওষুধ দিয়ে সচেতন করে তুলবার ব্যবস্থাও আছে। সুশ্রুত—অর্শ, ভগন্দর, পাথরি, ক্যাটারাক্ট, হার্নিয়া প্রভৃতি রোগে অস্ত্র-ব্যবহারের কথা বলেছেন। তখনকার দিনে অস্ত্রোপচারে প্রায় একশো পঁচিশ রকম ছুরিকাঁচি প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। তিনি বলেছেন, অস্ত্রোপচারকালে চিকিৎসকের সহযোগী থাকতে হবে। অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে উপবাসী রাখতে হবে।

মাছ পোষা

অনেকের শখ, অ্যাকোরিয়ামে মাছ পোষা। রংবেরঙের ছোট ছোট বিভিন্ন জাতের মাছ। এইসব মাছকে যত্ন করে লালনপালন করতে গেলে কিছু নিয়মকানুন জানা প্রয়োজন।

তোমরা যারা মাছ পোষো তাদের জন্যই এই নিবন্ধটি লেখা।

সাধারণত লোকে গভীর সমুদ্রের তলায় নামতে পারে না। কিন্তু ডুবুরিরা পানির তলায় নেমে স্বাভাবিক পরিবেশে মাছ ও অন্যান্য জলজন্তুদের হালচাল দেখতে পারে। লোকে সমুদ্রের তলায় নামতে না-পারলেও প্রায় সকলেরই প্রচুর কৌতূহল আছে এ-ব্যাপারে। লোকে কৌতূহল মেটাতে জলজন্তুদের চিড়িয়াখানা বা মাছ রাখবার বড় বড় কাচের চৌবাচ্চা দেখে আসে। পৃথিবীর নানান শহরে এমন একটি করে জলজন্তুর চিড়িয়াখানা বা অ্যাকোরিয়াম (aquarium) আছে।

অ্যাকোরিয়ামে বড় বড় কাচের চৌবাচ্চায় নানারকম সুন্দর সুন্দর মাছ আছে। রাতে যখন সেগুলোতে আলো জ্বেলে দেওয়া হয় তখন দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। মাছেদের লেজ নাড়া, মুখ হাঁ করা, নিশ্বাস ফেলা, গা নাড়া দেওয়া, পাখনা নাড়া আর ভেসে-ভেসে বেড়ানো দেখতে চমৎকার। যখন তারা গা নাড়া দেয় তখন রঙিন মাছদের গা থেকে যেন রামধনুর রং ঝলসে ওঠে। বহু টাকা খরচ করে এসব অ্যাকোরিয়াম তৈরি করা হয়।

কিন্তু অত টাকা তো সাধারণ লোকের নেই। তাই সাধারণ লোক ছোট ছোট কাচের বোতল বা বয়ামে বা মাটি কিংবা চীনামাটির পাত্রে বা গামলায় মাছ পোষে। কেউ-কেউ বাজারে-তৈরি ছোট ছোট কাচের চৌবাচ্চা কিনে তাতে মাছ পোষে। ঐ কাচের চৌবাচ্চাকেই অ্যাকোরিয়াম বলা হয়।

মাছেদের খুব ছোট জায়গায় রাখলে তাদের পক্ষে নড়াচড়ার কষ্ট হয়। খাঁচার মধ্যে তারা আধমরা হয়ে থাকে—বেশিদিন বাঁচে না।

পুকুরে বা নদীতে মাছ প্রচুর সূর্যের আলো পায়। তা ছাড়া পানির উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায় বলে বাতাস পানির সঙ্গে মিশে পানির তলা পর্যন্ত পৌঁছায়। মাছেরা সেই বাতাস পানি থেকে নিয়ে বেঁচে থাকে। মাছ নদীতে বা পুকুরে মাঝে মাঝে পানির উপরে ভেসে ওঠে উপরের তাজা বাতাসের জন্যে। এজন্যে অ্যাকোরিয়ামের উপরটা বেশ ফাঁকা এবং প্রশস্ত হওয়া দরকার। তা হলে পানির উপর দিয়ে বাতাস বইবার সময়ে পানির মধ্যে অক্সিজেন পৌঁছতে কোনো অসুবিধে হয় না।

জীবজন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিশ্বাসের সঙ্গে বার করে দেয়। মাছও তা-ই করে। এই গ্যাস বিষ। যদি পানির মধ্যে এই গ্যাস বেশি জমে তা হলে মাছ মরে যায়। এজন্যে অ্যাকোরিয়ামে গাছপালা রাখা হয়। গাছপালা এই গ্যাস শুষে নেয়। কিন্তু প্রচুর রোদ না-পেলে পানির গাছপালারা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিতে পারে না। রোদ ও আলো পেলে গাছপালারা এই গ্যাস শুষে নিয়ে অক্সিজেন ছাড়ে। এই অক্সিজেন মাছেদের পক্ষে নিতান্ত দরকার।

অ্যাকোরিয়ামের মাপ

সাধারণত মাছের চৌবাচ্চা ৩ ফুট লম্বা, ১৮ ইঞ্চি চওড়া আর ১৮ ইঞ্চি গভীর হয়। ফ্রেমটি ধাতুর তৈরি হওয়া দরকার। সামনের দিকে শাদা ও স্বচ্ছ একটি কাচ লাগাতে হয়। এই কাচের মধ্য দিয়ে মাছের চলাফেরা দেখা যায়। পাশগুলি সবুজ-রঙ-করা কাচের করাই ভালো। তাতে পাশ থেকে খুব বেশি আলো অ্যাকোরিয়ামে আসতে পারবে না। মাছদের পক্ষে বেশি আলো ভালো নয়। অ্যাকোরিয়ামের তলাটা স্লেট পাথরের বা মোটা কাচের হবে। উপরের ডালাটি পরিষ্কার শাদা কাচের করাই ভালো। উপরে ডালা ও অ্যাকোরিয়ামের মাঝে হাওয়া ঢোকার জন্যে খানিকটা ফাঁক রাখতে হয়।

রঙিন নুড়ি দিয়ে তলাটা ৩ ইঞ্চি ভরতি করে তার উপর ৬ ইঞ্চি পুরু বালি ছড়িয়ে দিতে হয়। বাজারে যে-বালি পাওয়া যায় তাতে কাদা ও ময়লা থাকে। সে-বালি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে অ্যাকোরিয়ামে দিতে হয়। বালি পরিষ্কার থাকলে তার উপরে বাতিল খাদ্যকণাগুলো দেখা যায়। সেগুলো পরিষ্কার করে না দিলে পানি দূষিত হয়ে মাছ মরে যেতে পারে।

পরিষ্কার করার প্রণালী

অ্যাকোরিয়াম পরিষ্কার করার জন্যে বাজারে একরকম ফাঁপা কাচের নল পাওয়া যায়। নলের আগা বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে তলায়-পড়ে-থাকা খাবারের ঠিক উপরে নলের উলটো মুখটা নিয়ে গিয়ে টিপে-থাকা বুড়ো আঙুল তুলে নিলে বাড়তি খাদ্যকণা নলের মধ্যে এসে ঢোকে। তখন আবার বুড়ো আঙুল দিয়ে নলের মুখ বন্ধ করলে বাড়তি খাদ্য নলের মধ্যে থেকে যায়। তখন তাকে তুলে বাইরে ফেলে দিতে হয়।

নানা জাতের মাছ

বিভিন্ন জাতের মাছের বিভিন্ন রকমের অভ্যেস। এক জাতের মাছ বেগবতী নদীতে বাস করে। তারা স্রোতের পানিতে থাকতে ভালোবাসে। অ্যাকোরিয়ামের পানি বের হবার ব্যবস্থা থাকলে তাতে নতুন পানি যোগানো ও পুরাতন পানি বার করার কাজ একসঙ্গে করলে পানিতে স্রোতের সৃষ্টি হয়। তাতে এই জাতের মাছ ভালো থাকে। কতক মাছ লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। তাদের জন্যে পাত্রে বড়

বড় পাথর দিতে হয়। পাথরের আড়ালে এইসব মাছ বেশ আরামে থাকে। অ্যাকোরিয়াম তৈরির কিছুদিনের মধ্যে পাথর ও নুড়ির উপর ছোট ছোট শ্যাওলা জন্মায়। মাছেরা এইসব শ্যাওলা খায়।

অ্যাকোরিয়ামের পানি

অ্যাকোরিয়ামের জন্যে পুকুরের পানি বা বৃষ্টির পানিই ভালো। তার অভাবে কলের পরিষ্কার পানিও দেওয়া চলবে। যে-পানিতে কাপড়ে সাবান দিলে ফেনা হয় না বা ডাল সিদ্ধ হয় না, সেরকম পানি না-দেওয়াই ভালো। অন্য পাত্র থেকে সাইফন (siphon) বা একধরনের বাঁকা নলের সাহায্যে ধীরে ধীরে পানি অ্যাকোরিয়ামে ঢালতে হয়। অ্যাকোরিয়ামে ঘরের উত্তাপের চেয়ে ঠাণ্ডা পানি দিলে মাছ মরে যেতে পারে; তাই পানিতে মাছ ছাড়বার আগে পানির তাপ পরীক্ষা করে দেখা দরকার। অ্যাকোরিয়ামের তলায় পানি বার করবার ফুটো রাখলে ইচ্ছেমতো পানি বার করে দেওয়া যায়। ফুটোর মুখে মিহি ঝাঁঝরি রাখলে পানি বার করবার সময় অ্যাকোরিয়াম থেকে মাছ বেরিয়ে যেতে পারে না।

পানি বদলাবার জন্যে অ্যাকোরিয়ামে ফুটো না-থাকলে মগে করে পানি তুলে অ্যাকোরিয়াম পরিষ্কার করতে হয়। পানি বদলাবার আগে মসলিনের জালতি করে একে একে মাছ তুলে অন্য পাত্রে রাখতে হয়। অন্য পাত্রে বেশিক্ষণ মাছ না-রাখাই ভালো। ছোট ছোট কাচের পাত্রে পানি ভরতি করে জালতি করে মাছ তাতে তুলে রাখতে হয়। পাত্রের মুখ চওড়া না হলে অক্সিজেনের অভাবে মাছ মারা যেতে পারে।

মাছেদের শত্রুতা

সব জাতের মাছ একসঙ্গে থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে শত্রুতা চলে। এসব জেনে তবে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হয়। লড়াকু (fighter) মাছ এক পাত্রে দুটি রাখলে তারা সবসময় শত্রুতা করে এবং একে অন্যকে মেরে ফেলে। 'স্টিকল ব্যাক' (stickle back) এই ধরনের মাছ।

অ্যাকোরিয়ামের গাছপালা

অ্যাকোরিয়ামের পানিতে কিছু গাছপালা রাখতে হয়। এগুলো নিছক সাজাবার জন্যে নয়। এদের উপকারিতা আছে। এরা পানির দূষিত গ্যাস শোষণ করে অক্সিজেন যোগায়। মাছেরা এই অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকে। খুব কড়া রোদে দেখা যায় পানির গাছপালা থেকে বুদবুদের মতো অক্সিজেন বের হচ্ছে। এ দেখেই বোঝা যায়, গাছপালা অক্সিজেন ছাড়ে।

অ্যাকোরিয়ামে যেসব গাছপালা দেওয়া হয় তাদের সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখা দরকার।

ক্যানাডিয়ান ওয়াটার-উইড (Canadian water-weed)—পানিতে ফেলে রাখলে এরা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন অক্সিজেন যোগায়।

ডাকউইড (duckweed)—এরা পানিতে ভেসে থাকে ও প্রচুর বাড়ে। বেশি হয়ে গেলে এদের কাঁচি দিয়ে কেটে ছোট ছোট করে দেওয়া চলে।

ওয়াটার-মিলফয়েল (Water-milfoil)—সুতোর মতো পাতাঅলা গাছ দেখতে খুব সুন্দর।

পন্ডউইডস (pond-weeds)—পুকুরে এইসব শ্যাওলা বা ঝাজিগাছ জন্মায়। এই গাছ প্রত্যেক অ্যাকোরিয়ামে কিছু-কিছু রাখা উচিত।

ওয়াটার-ক্রোফুট (Water-crowfoot)—এদের পাতা কতক ভেসে থাকে, কতক পানিতে ডুবে থাকে। বসন্তকালে এতে ছোট ছোট শাদা ফুল ফোটে।

ভ্যালিসনিরিয়া (Vallisneria)—এই গাছের পাতা দেখতে ফিতের মতো। ব্যবসায়ীদের কাছে প্রচুর পাওয়া যায়। এরা খুব বেশি অক্সিজেন যোগায়।

মাছ ও কীট

এবার দেখা যাক অ্যাকোরিয়ামে কী ধরনের মাছ রাখলে ভালো হয়।

গোল্ড-ফিশ (gold-Fish)—নানারকমের লাল মাছ। এরা অ্যাকোরিয়ামে কৃত্রিম পরিবেশে মানিয়ে থাকতে পারে ও অনেক দিন বাঁচে।

বুলহেড বা মিলারের বুড়ো আঙুল (bullhead or Miller's thumb)—এইসব মাছের মাথা ভোঁতা আর বড়। এরা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। এরা খুব নিরীহ।

ঈল (eel) বা কুঁচে মাছ—কুঁচে মাছ নানা ধরনের। ছোট জাতের কুঁচে মাছই অ্যাকোরিয়ামে পোষা হয়। এদের পাক-খেয়ে-খেয়ে ঘুরে-বেড়ানো দেখতে বেশ ভালো লাগে।

তিন-শিরদাঁড়াঅলা স্টিকলব্যাক (three spined stickle-back)—পিঠের ওপর এদের তিনটি শিরদাঁড়া দেখে চেনা যায়।

এ-ছাড়া চাঁদা মাছের মতো এঞ্জেল (angel), বড় বড় পাখনাঅলা ফাইটার ইত্যাদি অনেক রঙের ও আকৃতির মাছ পাওয়া যায়। টেট্রা, জেব্রা, ব্ল্যাকমলি, গোরামিন, রেনবো, সোর্ডটেল, গাপ্পি ইত্যাদি নানারকম মাছ আছে।

র‍্যামস্‌হর্ন স্নেল (ramshon snail)—একরকম ছোট শামুক। অ্যাকোরিয়ামে এদের ভারি সুন্দর দেখায়।

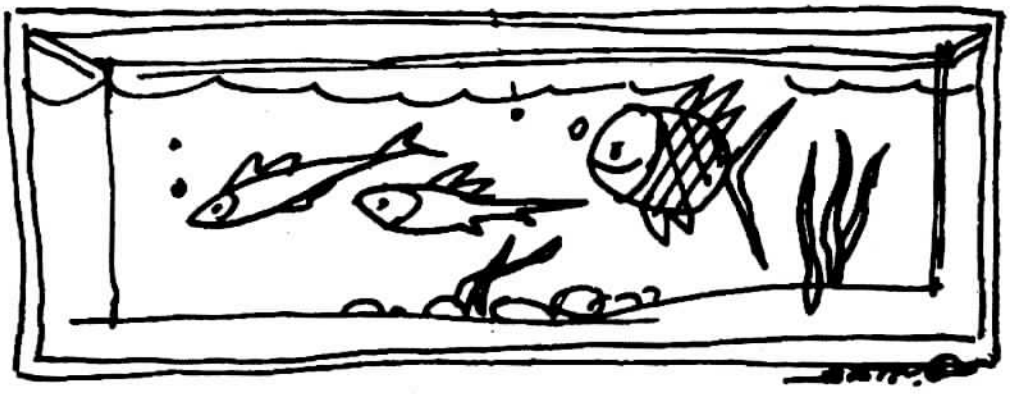

ওয়াটার-বিটল (water-beetle)—একরকম গুবরে পোকা। এরা পানিতে থাকে। এদের শূককীট ভয়ানক হিংস্র। অ্যাকোরিয়ামে ছোট ছোট মাছ থাকলে এরা তাদের খেয়ে ফেলে।

ওয়াটার-বোটম্যান (water-boatman)—এরা একরকম পোকা। পাদুটো দাঁড়ের মতো নেড়ে নেড়ে এরা নৌকার মতো ভেসে চলে।

হুইর্লিগিগ বিটল (whirligig beetle)—এরাও একরকম পানির পোকা। পানির মধ্যে এরা গোল হয়ে বোঁ-বোঁ করে ঘোরে।

মাছেদের আহার

বিস্কুটের গুঁড়ো, ছোট ছোট করে কাটা বা কেটে কুচিকুচি-করা পোকা, পিঁপড়ের ডিম, ছোট ছোট কেঁচোর বাচ্চা ইত্যাদি মাছের আহার।

প্রতিদিন একই সময়ে খাবার দেওয়া উচিত। বেশি খাবার দেওয়া উচিত নয়। বাড়তি খাবার পানি দূষিত করে।

কেঁচোর বাচ্চা কাচের নিপলের তলায় ফুটে থাকে। মাছেরা ফুটো থেকে মুখ দিয়ে কেঁচোর বাচ্চা টেনে বার করে খায়। খাবার দিলে সব মাছ নিপলের তলায় এসে জমে। এদের খাওয়ার ধরন দেখতে ভারি সুন্দর।

বিস্কুটের গুঁড়ো চিমটি করে তুলে পানির উপর ভাসিয়ে দিতে হয়। মাছ ভেসে-ভেসে সেগুলো খায়।

যত্ন নিতে হবে

অ্যাকোরিয়ামের মধ্যেকার মরা গাছপালা, মরা গাছ বা কীট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে ফেলে দিতে হয়। অ্যাকোরিয়াম কড়া রোদে রাখলে পানির মধ্যে নানারকম পোকা জন্মায়। তাই অ্যাকোরিয়াম ছায়ায় রাখতে হয়। যাতে ঘরে রোদ আসে অথচ অ্যাকোরিয়ামে সোজাসুজি রোদ এসে না পড়ে সেরকম জায়গায় অ্যাকোরিয়াম রাখা উচিত। আগেই বলেছি মাছেদের পক্ষে আলোর প্রয়োজন; কিন্তু বেশি আলো মাছেদের পক্ষে ক্ষতিকর। অ্যাকোরিয়ামের যে-ধারটা খোলা জানালার দিকে পড়ে সে ধারটা

কাগজ দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখা উচিত যাতে বেশি আলো কাচের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। পানিতে হাত ডোবাবার আগে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া ভালো। মাছ সহজেই ভয় পায়, এই ভয় থেকে তারা মারাও যায়। কাজেই পানি বদলানো বা সাজানোর সময় সাবধানে হাত নাড়াতে হয়। কাচ লাল হয়ে গেলে নুন বা শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষতে হয়। নতুন মাছ রোগ ছড়ায়। বাজার থেকে নতুন মাছ কিনে এনে ২-৩ দিন অন্য পাত্রে রেখে পরে বড় পাত্রে দিতে হয়।

মাছেদের অসুখ

অনেক সময়ে দেখা যায় যে মাছেদের পাখনার উপর একটা শাদা ছাতা-পড়ার মতো দাগ হয়েছে। একে বলে ফাংগাস (fungus)। এই দাগ ক্রমশ বেড়ে ওঠে। এর ফলে প্রায় ক্ষেত্রে মাছ মরে যায়। রোগের অন্য লক্ষণ হচ্ছে রং ফিকে বা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া। পিঠের পাখনা পানির উপর তুলে মাছ ভাসছে দেখলে বুঝতে হবে যে তার ফাংগাস-রোগ হয়েছে।

সকলের আগে অসুস্থ মাছকে আলাদা করে ফেলতে হবে। অন্য মাছেদের সঙ্গে অসুস্থ মাছ রাখলে সব মাছের এই অসুখ হতে পারে।

অসুস্থ মাছকে আলাদা পাত্রে রেখে তাতে এক গ্যালন পানিতে চায়ের চামচের দু চামচ নুন মিশিয়ে সেই পানিতে মাছটিকে ছেড়ে দিতে হবে। রোজ এ-ব্যবস্থা করতে হবে অর্থাৎ নতুন করে পানি নিয়ে, নতুন করে নুন মিশিয়ে তাতে মাছটিকে রাখতে হবে। এইরকম ব্যবস্থা করলে অসুস্থ মাছের এই সংক্রামক রোগ সেরে যেতে পারে।

'ছোটদের বুক অব নলেজ' বই থেকে

হাঁসের মতো লম্বা গলা

মরাল গ্রীবা বা হাঁসের মতো লম্বা গলা নারীসৌন্দর্যের আর-একটি নিদর্শন। ব্রহ্মদেশ বা বার্মায় পাদায়ুঙ বা কারেন নামে এক উপজাতি বাস করে; ঐ উপজাতির সমাজের মেয়েদের গলা অস্বাভাবিক লম্বা করার জন্যে জন্মের পর থেকেই শিশুকন্যার গলায় সর্বক্ষণ একটি তামার স্প্রিং পরিয়ে রাখা হয়। ঐ স্পিং-এর চাপে ও টানে এক-একটি যুবতীর গলা ১৫.৭৫ বা ৪০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে যায়। পুরুষেরা ইচ্ছে করেই মেয়েদের গলায় ঐ স্প্রিং পরিয়ে রাখে, কারণ ওটা খুললে মেয়েদের ঘাড় মটকে যাওয়ার সম্ভাবনা।

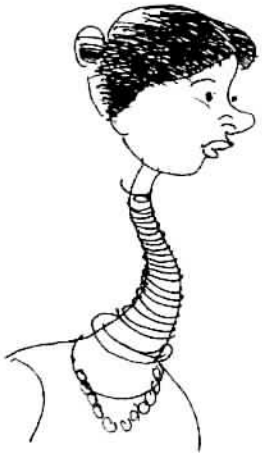

শিবরাম চক্রবর্তী

এক মিনিটের হাসি

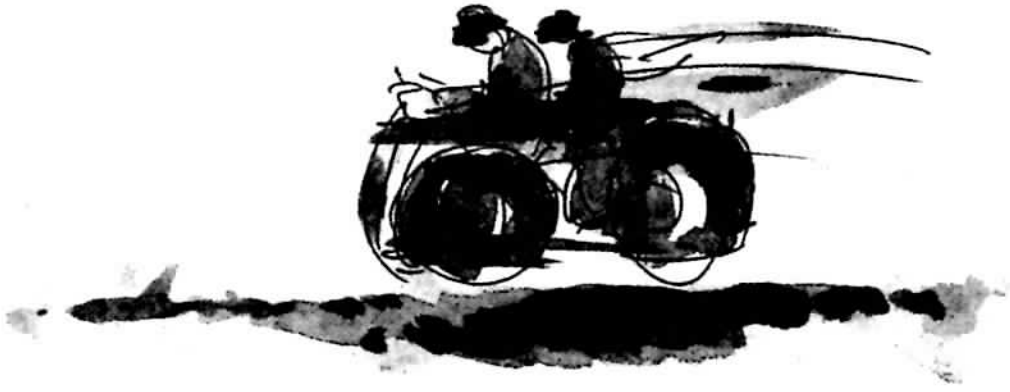

অনিমেষ নতুন মোটরবাইক কিনেই যোগেনকে একদিন নেমন্তন্ন করে বসল বাইকের সহযাত্রী হবার জন্য। পিছনের সিটটা সে যোগেনকে দিতে প্রস্তুত।

এমন জো সহজে মেলে না। আর জো পেলে কে না gain করে? যোগেনরা তো বটেই!

যোগেন উঠে বসল অনিমেষের পেছনে।

ভরর—ভরর—ভরররররর—ভোঁ ভোঁ!

ভোঁ দৌড় মারল সাইকেল!

"কী হে, কেমন লাগছে তোমার?" যেতে-যেতে অনিমেষ জিজ্ঞেস করে।

"লাগছে তো বেশ! কিন্তু হাওয়ার ধাক্কা বড্ড জোর। ধাক্কাটা লাগছে আবার আমার বুকেই!"—যোগেন জানায়।

"লাগবে না! যেমন বাহারি জহরকোট পরা হয়েছে! দাঁড়াও, তোমার কোটটা খুলে পরিয়ে দিই। ঘুরিয়ে পরলেই আর হাওয়ার চোট লাগবে না।"

অনিমেষ বাইক থেকে নেমে যোগেনের কোটটা খুলে উলটো করে পরিয়ে পিঠের দিকের বোতামগুলো এঁটে দেয়, "কোট পরার কায়দা অবিশ্যি এ নয়। ছোটমেয়ের ফ্রকের মতো পরিয়ে দিলাম কিছু মনে কোরো না। তুমি তো আর ছোটমেয়েটি নও—মনে করার কী আছে! মনে করো-না কেন ফ্রক-কোট পরে এসেছ!"

'ফ্রক-কোটের নাম শুনেছি। তার বোতামগুলো বুঝি পিঠের দিকে?'—যোগেন জানতে চায়।

"কে জানে! আমার তো ধারণা, এই কোটই ঘুরিয়ে পরলেই ফ্রক-কোট হয়। যেমন এই বেড়ালই বনে গেলে—"

"বুঝেছি", যোগেন আর জানতে চায় না।

আবার ভোঁ ভোঁ—ভরর ভরর ভরর ভররররর—ভক। মাইলখানেক যাবার পর জিজ্ঞেস করে অনিমেষ—"কী হে, আর কোনো ক্লেশ নেই তো?"

কোনো সাড়া নেই।

পেছনে তাকিয়ে দেখে যোগেনও নাস্তি।

বাইকের মুখ ঘুরিয়ে সে ফিরে চলে।

কিছুদূর গিয়ে একটা দঙ্গল দেখতে পায়।

সেই দঙ্গলের মধ্যে যোগেনও রয়েছে দেখা গেল। ভূমিশয্যায় বিলকুল বেহুঁশ!

"কেমন আছে ও?" অনিমেষ প্রশ্ন করে ব্যাকুল হয়ে।

"আমরা তো মশাই বুঝতে পারছি না। লোকটি একটি মোটরবাইক থেকে মাথা ঘুরে পড়ে গেছল। তারপর আমরা সবাই মিলে চেষ্টা-চরিত্তির কোরে ওর উলটো মাথাটা ধরে সোজা করে দিলাম। কিন্তু তার পর থেকেই আর কোনো হুঁ-হাঁ নেই।"

বিশ্ববিদ্যালয় কবে গড়ে উঠেছিল?

কলেজ শব্দটা এসেছে লাতিন থেকে যার মানে হল কতকগুলো সাধারণ কাজের জন্য কিছু সমস্তরের মানুষের একটি সংস্থা। সাধারণত নির্বাচনের জন্য এই কলেজগুলো ব্যবহৃত হত, যেমন : পোপের নির্বাচন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ইত্যাদি। আবার কলেজের অন্য একটি মানে হল উচ্চশিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। মধ্যযুগে এই সংস্থাগুলো সর্বোচ্চ শিক্ষাদানের জন্য ক্রমে ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত হতে থাকে। গোড়ার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এমন এক জায়গা যার নিজের বাড়িঘর থাকত না, কোনো বাঁধাধরা শিক্ষকও নয়। শুধু শিক্ষাবিদ বা পণ্ডিতজনেরা একটা জায়গায় একত্রিত হতেন। উচ্চশিক্ষা লাভের ইচ্ছা থাকলে কিছু লোক একটা বড় বাড়ি ভাড়া করে সেখানে শিক্ষকের কাছ থেকে বিদ্যালাভ করতেন।

সময় পালটানোর সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি হল, নিয়মকানুন হল। আধুনিক ধরনের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল নবম শতাব্দীতে ইতালির সালেরনো (Salerno) শহরে, ১২৩১ সালে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল ৮৫৯ সালের মরক্কোর কারুইন (Karuin) শহরে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালিতে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। প্যারিসের ইউনিভার্সিটি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয়েছিল। ভারতবর্ষে নালন্দা আর তক্ষশিলা প্রাচীনকালে সভ্যজগতে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতেই ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজ প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটিরূপে গড়ে ওঠে। উত্তরোত্তর পৃথিবীময় বিশ্ববিদ্যালয় দেখা দিতে লাগল।

আজকের যুগের ইউনিভার্সিটি বিগত যুগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বহু কলেজ যুক্ত হয়। অবশ্য শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের। আবার বিশেষ বিশেষ শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

মোহাম্মদ নাসির আলী

শিকারি ডেলমন্টের কাহিনী

কিশোর বয়সে একসময়ে কমবেশি সবাই মনে-মনে বেশ-একটু দুঃসাহসিক বা রোমাঞ্চকর কার্যকলাপ পছন্দ করে। দুঃসাহসী হবার আকাঙ্ক্ষা কেউ-কেউ মেটায় বইপুস্তক পড়ে বা শুধু স্বপ্ন দেখে অর্থাৎ নিজেকে দুঃসাহসী কল্পনা করে। কেউ-কেউ আবার বিপদ-আপদ অগ্রাহ্য করে বাধাবিঘ্ন হেলায় অতিক্রম করে কার্যত দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। এদের বলা যায় জন্ম-দুঃসাহসী। অবিশ্যি সংখ্যা এদের খুবই কম। হাজারো কিশোরের ভেতর দু-একজনের বেশি এরকম বেপরোয়া—বড়রা যাদের বলেন ডানপিটে—পাওয়া যায় না।

অস্ট্রিয়ার জোসেফ ডেলমন্ট নামে যে-দুর্জয়ী কিশোরের কথা তোমাদের আজ বলতে বসেছি, তাকে বলা চলে সে-ধরনের জন্ম-দুঃসাহসী। মাত্র আট বছর তিন মাস বয়সে সে অজানার অচেনার হাতছানিতে এক রাতে বাড়ির সবার অগোচরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তখন তার পথের সম্বল বলতে একখানা বড় রুমালে জড়ানো সামান্য কয়েকখানা রুটি, নিজের প্রিয় কয়েকটি খেলনা আর মাসকয়েক ধরে গোপনে জমানো কয়েকটি শিলিং।

নিজ গ্রামে থাকতে স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে তার ভ্রাম্যমাণ এক সার্কাস পার্টির নানারকম শারীরিক কসরত, দড়ির উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য ইত্যাদি দেখবার সুযোগ হয়েছিল। বাড়ি এসে অনেকদিন অবধি সেও চেষ্টা করেছে ওরকম কসরত করার বিদ্যা আয়ত্ত করতে। কিন্তু তার মতো

বয়সে ওসব আয়ত্ত করতে পারবে কী করে? তবু যতটুকু সে শিখেছিল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে কায়ক্লেশে নিজ পেটের অন্ন জোগাতে সেটুকুই কাজে লেগে গেল। বয়সে নিতান্ত ছোট হলেও তাকে এক ভ্রাম্যমাণ সার্কাসের মালিক দয়া করে দলে ভরতি করে নিল। বাড়ি ছেড়ে প্রথম ছ'মাস তার কেটেছে সেই দলে। সেই দল থেকে পেটের অন্নের জন্য কী নির্যাতনই-না তাকে রাতদিন সহ্য করতে হয়েছে। ডেলমন্ট পরবর্তীকালে অবিশ্যি স্বীকার করেছে এ-নির্যাতনের বেশির ভাগ ঘটেছে অসহ্য খিদের সময় সার্কাস দলের বাবুর্চিখানা থেকে খাবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু নির্যাতন তাকে দমাতে পারেনি। যে-'বিদ্যা' সে শিখতে বেরিয়েছিল, শত নির্যাতন সহ্য করেও সে তা শিখতে থাকে এবং ধীরে ধীরে কিছুটা পারদর্শীও হয়ে ওঠে।

এমনি যখন অবস্থা তখন একবার বুডাপেস্টে খেলা দেখাবার সময় আরেকটি সার্কাসদলের ম্যানেজারের নজর পড়ে তার ওপর। বিচক্ষণ ম্যানেজার আগের দল থেকে কিশোর ডেলমন্টকে ভাগিয়ে নিয়ে এল নিজের দলে। ডেলমন্টের পাঁচটি বছর কাটে এ-দলের সঙ্গে। এ পাঁচবছরে সে নিজ জন্মভূমি অস্ট্রিয়া ছাড়া ইউরোপের প্রায় সবগুলো দেশ—আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, এমনকি অস্ট্রেলিয়া অবধি ঘুরে বেড়ায়। এসব জায়গায় তার খেলা দেখে কেউ যদি তার পরিচয় জিজ্ঞেস করেছে, জানতে চেয়েছে তার আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে, তবে সে উত্তর দিয়েছে আত্মীয়স্বজন বলতে তার কেউ কোথাও নেই; পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া একটি ছেলে সে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে দলের লোকদের কাছেও সে এ-কথাই বলেছে। তার এ-মিথ্যে পরিচয় কস্মিনকালেও হয়তো ধরা পড়ত না, যদিনা দেশ-বিদেশ ঘুরে একসময়ে তাদের বিখ্যাত সার্কাসদল ভিয়েনায় সার্কাস দেখাতে না আসত।

ভিয়েনায় এসে ডেলমন্ট তার সঠিক পরিচয় প্রকাশ করে। তখন তার মা-বাবাকে খবর দেয়া হয়। খবর পেয়েই তাঁরা ডেলমন্টের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে আসেন। সার্কাস দেখতে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ-সময়ে অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড ঘটে যায়। ডেলমন্টের মা দীর্ঘদিন আগে হারিয়ে-যাওয়া তাঁর ছেলেকে বহু উঁচুতে লাফালাফি করতে দেখে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

এ-ঘটনার পর ডেলমন্টকে সার্কাসদল থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হয় এবং কিছুকালের জন্য স্কুলে ভরতি করে দেয়া হয়। কিন্তু শুধু হতাশাজনিত মনোকষ্টের ফলে অল্পদিন না-যেতেই সে ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুখ থেকে কোনোরকমে সেরে উঠলে অগত্যা তার মা-বাবা ইচ্ছেমতো তাকে আবার সার্কাসে যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু শত ইচ্ছে থাকলেও সার্কাসদলে বেশিদিন লেগে থাকার ভাগ্যি তার হয়নি। দলে ফিরে আসবার দিনকয়েক পরেই খেলা দেখাবার সময় একদিন সে উপর থেকে পড়ে যায়। পড়ে এমনভাবে জখম হয় যে, বাকি জীবনের জন্য তার সার্কাসের খেলা দেখানো বন্ধ হয়ে যায়। তখন তার বয়স মাত্র তেরো বছর।

এর পর থেকে এ-কাজে সে-কাজে সুবিধে না-করতে পেরে সে পুনরায় চাকরি নেয় আরেকটি সার্কাসদলে। এবার সে হাতি পোষ মানাতে দক্ষ একজন মাহুতের সহকারীর কাজ নেয়। এ-ধরনের ছোটখাটো কাজ ছাড়া বিকল শরীর নিয়ে কী এমন চাকরিই-বা সে করবে?

কিন্তু ভাগ্য যে তাকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখনো সে তা বুঝতে পারেনি। কিছুদিন পর সার্কাসের দুটি হাতির পায়ে ঘা হয়। হাতিদুটি ক্রমশ অসুস্থ ও সার্কাসের পক্ষে অকেজো হয়ে পড়ে। তখন সে-দুটিকে বিক্রি করে দেয়া হয় লিভারপুলের জন্তু-জানোয়ার আমদানিকারক এক প্রতিষ্ঠানের কাছে। হাতিদুটি লিভারপুলের সেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেবার সময় কিশোর ডেলমন্টের পরিচয় হয় ঐ প্রতিষ্ঠানের ম্যাককাচিয়ন নামে এক বৃদ্ধের সঙ্গে। চিড়িয়াখানার জন্য জ্যান্ত জীব-জানোয়ার ধরতে ম্যাককাচিয়ন ছিল একজন পাকা ওস্তাদ। ভারতবর্ষের জঙ্গল থেকে বিভিন্ন

জানোয়ার পাকড়াও করার অভিযানে বের হবার জন্য বুড়ো তখন তৈরি। বছর-কয়েক লাগবে এ-অভিযান চালানোর পর জন্তু-বোঝাই জাহাজ নিয়ে লিভারপুলে ফিরে আসতে।

কথায় বলে : জহুরিই জহর চেনে। ডেলমন্টের সঙ্গে আলাপ হতেই ম্যাককাচিয়ন বুঝতে পারল এই তুখোড় ছোকরাকে দলে ভেড়াতে পারলে চমৎকার কাজ দেবে। বাপ-মা-ভাই-বোনদের সঙ্গে সম্পর্কহীন এমন ছিন্নমূল কিশোর ওদেশে খুব বেশি পাওয়া যায় না। তা ছাড়া কোনো দেশের মা-বাবাই তো নিজেদের সন্তানকে জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে জঙ্গলে লড়াই করবার জন্য ছেড়ে দিতে রাজি হন না।

ম্যাককাচিয়ন ভারতবর্ষে জানোয়ার ধরবার অভিযানে তার সঙ্গী হবার প্রস্তাব দিতেই জোসেফ ডেলমন্ট এককথায় রাজি হয়ে গেল। পক্ষকাল পরেই লিভারপুল বন্দর থেকে 'সিটি অব ওয়েস্ট মিনিস্টার' জাহাজ নানারকমের ও আকারের খাঁচা এবং ফাঁদ নিয়ে ভারতবর্ষের উদ্দেশে রওনা হল। শুরু হল ডেলমন্টের জীবনে জ্যান্ত জানোয়ারের সন্ধানে প্রথম যাত্রা। ডেলমন্টের বয়স তখন ১৫ বছর মাত্র।

যে-সময়কার কথা বলছি, সে-সময়ে ভারতবর্ষে রেলপথের সংখ্যা এখনকার চেয়ে ছিল অনেক কম। নদীপথের সুবিধাও আজকের মতো ব্যাপক নয়। আধুনিক ব্যবস্থার তখন সবেমাত্র শুরু। ভূবিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা নানা স্থানে রাস্তাঘাট নিয়ে কর্মব্যস্ত। কাজেই সে-সময়কার ভারতের মতো দেশে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি বন-বাদাড় ভেঙে যাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

এই সময়ে একদিন অভিযাত্রী ম্যাককাচিয়নের জাহাজ মাদ্রাজ-উপকূলে এসে ভিড়ল। জন্তু-জানোয়ার পাকড়াও করার কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ জনকয়েক দেশী-বিদেশী লোক নিয়ে তৈরি হল ম্যাককাচিয়নের অভিযাত্রী দল। তিনজন ভারতীয়ও তাদের মধ্যে স্থান পেল। এদের ছাড়া একদঙ্গল

ভারতীয় কুলি-মজুরও সংগ্রহ করা হল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বয়ে নেবার জন্য। শুধু জিনিসপত্রই-বা বলি কেন, জানোয়ার ধরা আরম্ভ হলে খাঁচায় পুরে সেগুলোকেও রেলস্টেশনে বা জাহাজঘাটে বয়ে আনতে হবে; তখন আরও শত শত কুলি-মজুরের দরকার হবে। এখন তাদের সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি তাঁবু, প্রকাণ্ড এক বাক্সবোঝাই ওষুধপত্র—যার ভেতর সের-পাঁচেক রয়েছে কুইনাইনের বড়ি, রান্না-বান্নার জন্য হাঁড়ি-পাতিল-কলসি এবং প্রয়োজনীয় আরও নানারকম টুকিটাকি।

মাদ্রাজ থেকে রওনা হয়ে অভিযাত্রীদল উপকূল ধরে কিছুদূর এগিয়ে দেশের অভ্যন্তরভাগে হায়দ্রাবাদের দিকে চলতে লাগল। সেখান থেকেই তারা আসল জঙ্গলে প্রবেশ করল। প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার প্রথম সুযোগ এল ডেলমন্টের জীবনে। পনেরো বছরের ডেলমন্ট জন্তু-জানোয়ারের এক বিচিত্র জগতে এসে হাজির হল। এ যেন রূপকথার ব্যাপার। সংখ্যায় তারা যেমন অগুনতি, তেমনি অগুনতি রকমের বাঘ, ভালুক, হরিণ, গণ্ডার, মহিষ, বানর, অজগর, পাখি—কোনোকিছুরই কমতি নেই। সেইসঙ্গে সেই জঙ্গলবাসীদের চিৎকারের বিচিত্র ঐকতান, নর্তন কুর্দন।

জ্যান্ত জীবজন্তু পাকড়াও করার কাজে বুড়ো ম্যাককচায়িন ছিল একজন পাকা ওস্তাদ। তার শিক্ষার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই কিশোর ডেলমন্টও এ-কাজে বেশ পটু হয়ে উঠল। তখন থেকে ডেলমন্ট যেন ম্যাককাচিয়নের পুরোপুরি ডানহাত। কিন্তু তবু দুজনে সময়-সময় বেশ ঠোকাঠুকি লেগে যেত।

সারাটা জীবন জানোয়ারের সংস্রবে থেকে বুড়োর মেজাজটা বোধহয় একটু খিটখিটে ধরনের হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া বুড়ো খুব মদ খেত। তখন দলের কেউ একটু এদিক-ওদিক করলেই সে তেড়ে আসত ঘুসি বাগিয়ে। ডেলমন্টকেও কয়েকবার তার মারধোর হজম করতে হয়েছে। কিন্তু একদিন লেগে গেল রীতিমতো সংঘর্ষ। কী যেন একটু দোষের জন্য একটা চাবুক হাতে নিয়ে ম্যাককাচিয়ন তাড়া করল ডেলমন্টকে। ডেলমন্ট সেদিন বেপরোয়া হয়ে রুখে দাঁড়াল। বয়সে কিশোর হলেও শক্তি ও সাহসে সে-ইবা কম কিসে? সার্কাসের দলে থাকতে একবার সে মুষ্টিযোদ্ধা হতে চেষ্টা করেছিল। কিছুদিন অভ্যাসও করেছিল। সেই বিদ্যাটুকু আজ কাজে লেগে গেল। চাবুকটা বুড়োর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে পরপর কয়েকটা ঘুসি মেরে ওস্তাদকে কাবু করে ফেলল। তার পর থেকে ওস্তাদ কিন্তু শিষ্যের প্রতি আর মেজাজ দেখাতে আসেনি।

প্রথমে এই অভিযাত্রীদল ছোট্ট ছিপনৌকায় করে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে-যেতে অনেক জীবজন্তুই তারা ধরে ফেলল। অল্প কয়েকদিনের ভেতরেই এতরকমের জানোয়ার তাদের হাতে ধরা পড়ল যে, সেই সংগ্রহের তুলনা হয় নূহ নবীর কিশতির সংগ্রহের সঙ্গে। সবরকম জানোয়ার—বাঘ, গণ্ডার, হরিণ, বুনো মহিষ, বানর, ভাল্লুক, অজগর সাপ ও পাখির এক-এক জোড়া করে। কিছুদূর এগিয়ে রেলস্টেশন পেলেই সেগুলো তারা পাঠিয়ে দেয় সমুদ্রোপকূলে জাহাজে বোঝাই করতে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পাঠানো হয় কিছু লোকজন যারা জন্তুর খাওয়া ও দেখাশুনার কাজ চালাবে।

এমনি করে যেতে-যেতে কিছুদিন পরে তারা গিয়ে কাশী পৌঁছল। সেখান থেকে পূর্বদিকে রেনার নামক একটা জায়গা ছিল তখন, যাকে বলা হত 'বাঘের মুলুক'। সদলবলে রাতদিন ধরে হেঁটে তেষট্টি দিন পরে তারা গিয়ে পৌঁছল 'বাঘের মুলুকে'। একাদিক্রমে দু-মাস রাতদিন হাঁটা কম কথা নয়। তার ওপর আবার সেখানে তখন দিনের বেলা যেমন অসহ্য গরম, রাতের বেলা তেমনি হাড়কাঁপানো শীত। তবু পরিশ্রম তারা সার্থক মনে করল, জায়গাটায় বাঘের প্রাচুর্য দেখে। বাঘে যেন কিলবিল করছে সারাটা অঞ্চল জুড়ে। বাঘের জন্য খাঁচা তৈরি করতেই যা দেরি, খাঁচা তৈরি হলে বাঘ ধরতে একটুও দেরি বা অসুবিধা হয় না। অসুবিধা কেবল বাঘের আহার যোগাড় করা। ছোট ছোট জীবজন্তু শিকার করে বাঘগুলোকে খাওয়াবার জন্য লোক রাখা হল চারজন। সারাদিন ধরে এ-কাজ করেও বেচারারা কুলিয়ে উঠতে পারে না।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা বাঘ সিংহ প্রভৃতি বড় জানোয়ার ধরল তিনশোর ওপর। আর ছোট জানোয়ার প্রায় হাজারখানেক। মস্তবড় জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা হল তাদের রাখবার জন্য। আর তাদের খাওয়া-পরা অর্থাৎ দেখাশুনার জন্য দূর-দূরাঞ্চল থেকে শত শত লোক রাখা হল মাইনে করে।

এমনি করে দলটি বাড়তে বাড়তে যখন লোকসংখ্যা প্রায় হাজারে দাঁড়াল, তখন দেখা দিল এক ভয়াবহ বিপদ। দূর-গ্রামাঞ্চল থেকে কাজের জন্য যেসব লোক এসে ভরতি হল, তাদের কারো কারো সঙ্গে এল একধরনের মারাত্মক নিউমোনিয়া রোগ। দলে এ-রোগ দেখা দেবার দ্বিতীয় দিনেই মারা গেল ষোলোজন লোক। তার কয়েকদিন আগে থেকেই বুড়ো ম্যাককাচিয়ন শয্যাগত হয়েছিল ম্যালেরিয়া রোগে। তার শুশ্রূষার ভার একমাত্র ডেলমন্টের ওপর। তখন তারা গভীর জঙ্গলে। কাজেই ডাক্তার বলতে কোনো জীবের নামগন্ধও নেই ধারেকাছে।

তারপর তৃতীয় দিনে সেই ভয়াবহ রোগ আক্রমণ করল ম্যাককাচিয়নকে। রোগাক্রমণের মাত্র তিন ঘণ্টার পর ডেলমন্টের কোলে মাথা রেখে বুড়ো শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল। দলের অনেক লোক প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল ভয়ে ও আতঙ্কে। চতুর্থ দিনে গুনে দেখা গেল প্রায় চারশো লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে ক্যাম্পের আশেপাশে।

বুঝতেই পারছ তরুণ জোসেফ ডেলমন্টের জীবনে তখন চরম দুর্দিন। সঙ্গে যেসব ওষুধপত্র এবং পানীয় ছিল, তাই খেয়ে সে নিজের শরীরটা কার্যক্ষম রাখতে লাগল প্রাণপণ চেষ্টায়। এ-সময়ে রাতদিনে তাকে খাটতে হত কম করেও বিশ ঘণ্টা। চার ঘণ্টা শুধু বিশ্রাম।

বিপদের ষষ্ঠ দিনে তিনজন ডাক্তার নিয়ে সেখানে এসে হাজির হল একদল ইংরেজ-সৈন্য। এসেই তারা বাইরের দুনিয়া থেকে ক্যাম্পটাকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলল। কেউ ক্যাম্প ছেড়ে পালাবার চেষ্টা

করলেই তাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করা হত।

এ ভয়াবহ মহামারীর প্রকোপ কমতে কমতে অভিযাত্রীদলের ছয়শো লোকেরও বেশি প্রাণ হারাল। কিছুসংখ্যক সাহসী লোক নিয়ে বেঁচে রইল শুধু ডেলমন্ট আর সৈনিকদের অক্লান্ত চেষ্টায় বেঁচে রইল ধৃত জানোয়ারগুলো।

এরকম দুরবস্থায় পড়ে ডেলমন্ট অগত্যা 'কেবল' করে সমুদয় খবর পাঠাল বিলাতের জানোয়ার-ব্যবসায়ী সেই প্রতিষ্ঠানকে। সৈন্যবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কর্নেল ডেলমন্টের অসীম সাহসের প্রশংসা করে আরেকটি 'কেবল' পাঠাল বিলাতে। উত্তর আসতে একটুও দেরি হল না। বিলাতের কর্তারা ডেলমন্টকে খবর পাঠালেন : তুমি যদি কাজ সমাধা করতে পারবে বলে সাহস করো, তবে এগিয়ে যাও। টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল।

কাজেই মাত্র সতেরো বছর বয়সে জোসেফ ডেলমন্ট বিশাল একপাল হিংস্র জানোয়ার ভারতের জঙ্গল থেকে বহাল তবিয়তে ইউরোপে পৌঁছে দেবার দুঃসাধ্য কাজের ভার পেল। এতদিনে সে অবিশ্যি এ-কাজে আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। এ-বিপর্যয়ের পরও আট মাস কাল ধরে আরও অনেক জানোয়ার সে ধরে ফেলল।

তার পরে শুরু হল জানোয়ারদের গন্তব্যস্থানে চালান দেবার ব্যবস্থা। বুঝতেই পারছ, সংখ্যায় তখন তারা বিপুল। প্রথমে তাদের পাঠানো হল কলকাতায়। সেখান থেকে পুরো একখানা পর্তুগিজ জাহাজ ভাড়া করে জানোয়ারগুলোকে পাঠানো হল মাদ্রাজে।

অবশেষে মাদ্রাজ থেকে জানোয়ার-যাত্রীদের ইউরোপে রওনা করিয়ে দিয়ে দুমাস ডেলমন্ট মাদ্রাজে বিশ্রাম করল।

তার পরে আবার শুরু হল নূতন অভিযান। এভাবে তার জীবনের ছয় বছর কাটল ভারতের দুরধিগম্য বনে-জঙ্গলে। এ-সময়ের ভেতর ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ কোথাও যেতে বাকি রইল না তার। এমনকি নিষিদ্ধ দেশ নেপাল-ভুটানেও সে জানোয়ার ধরবার অনুমতি পেল। তারপর গেল আফগানিস্তান। ঘটনাক্রমে ডেলমন্টকে সেখানে বন্দি করা হল ইংরেজের গুপ্তচর হিসেবে। তারপর দুহাজার পাউন্ড মুক্তিপণস্বরূপ খেসারত দিয়ে তাকে ছাড়ানো হয় আফগানীদের কবল থেকে।

ভারত থেকে ফিরে গিয়েও বিশ বছরকাল ডেলমন্ট কাটিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন বন-জঙ্গলে জ্যান্ত জানোয়ার পাকড়াও করে। শুধু পাকড়াও করা নয়, সেগুলো বাঁচিয়ে রাখাও এক কঠিন কাজ। তারপরে ছোট-বড় অসংখ্য খাঁচা তৈরি করে সেগুলো যথাস্থানে চালান দেয়া জাহাজ বোঝাই করে। জাহাজ বোঝাই করবার আগে দরকার হয় চিড়িয়াখানা তৈরি করে সেগুলোকে আহার জুগিয়ে ও দেখাশুনা করে রাখার। এজন্য মাদ্রাজে ও সিঙ্গাপুরে দুটো চিড়িয়াখানাই তৈরি হয়েছিল।

ধৃত জন্তুদের জাহাজে বোঝাই করেও কি নিশ্চিন্ত হবার উপায় আছে? রাতদিন তাদের মরজি-মেজাজ লক্ষ্য করতে হয়। সবাই থাকে খাঁচায়। শুধু হাতি, গণ্ডার, মহিষ, বুনো ষাঁড় প্রভৃতি রাখতে হয় শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে। আর সমুদ্রযাত্রায় সবচেয়ে বেশি যত্ন করতে হয় বানরদের। মানুষের কথিত জাত-ভাই বানর অতিসহজেই নাকি সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে বাঁদরামো ভুলে চুপচাপ পড়ে থাকে।

একবার ডেলমন্টকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তার মতে সবচেয়ে হিংস্র জানোয়ার কোন্‌টি? ডেলমন্টের মতে বুনো শুয়োর নাকি ভয়ঙ্কর জীব। সে বাঘকেও অনায়াসে ঘায়েল করে দিতে পারে তার ধারালো দাঁত দিয়ে ফুটো করে। একলা কেউ দাঁতাল বুনো শুয়োরের সামনে পড়লে তার আর রক্ষা নেই।

ডেলমন্টের মতে আফ্রিকার মহিষও কম ভয়াবহ নয়। তারাও বাঘ, এমনকি সিংহও মেরে ফেলতে পারে। মহিষে ধাওয়া করলে একমাত্র রক্ষা ধারেকাছে কোনো গাছে উঠতে পারলে। একবার এক

বুনো মোষের পাল্লায় পড়ে ডেলমন্টকে সারারাত মশার কামড় খেয়ে কাটাতে হয়েছিল এক গাছের ডালে বসে। সিংহ পশুরাজ হয়েও কিন্তু একলা থাকলে বুনো মোষের পেছনে লাগতে সাহস পায় না।

ডেলমন্ট তার জীবনে হাজার হাজার জন্তু-জানোয়ার দেশ-বিদেশের জঙ্গল থেকে ধরে বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় চালান দিয়েছে। কিন্তু তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল সামান্য একটি বাদুড়। বাদুড়টিকে সে যত্নে পোষ মানিয়েছিল। সেই বাদুড়টি ডেলমন্টের এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, কোনো-কোনো রাতে বাদুড় একা থাকলে ভয়ানক চিৎকার আরম্ভ করত এবং ডেলমন্টকে কাছে না-পেলে কিছুতেই শান্ত হত না। শেষে বিরক্ত হয়ে ডেলমন্ট তাকে ছেড়ে দিতে মনস্থ করল। ছেড়ে দিতেই বাদুড়টা কিচির-মিচির শব্দ করতে করতে আকাশে উড়ে গেল। কিন্তু রাতে হঠাৎ করে ডেলমন্টের ঘুম ভেঙে গেল। কী যেন নরম একটা জিনিস তার গালে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। চোখ মেলে সে দেখতে পেল বাদুড়টা ফিরে এসে তাকে আদর করে ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে গালে সুড়সুড়ি দিয়ে।

এরপর ডেলমন্ট তাকে আর তাড়ায় কী করে? অবশেষে সেই বাদুড়ের মৃত্যু ঘটল ডেলমন্টের একটা কুকুরের কামড়ে। একদিন ক্যাম্পের ভেতর অভ্যাসমতো বাদুড়টি নিচদিকে মাথা দিয়ে ঝুলছিল। এমন সময় একটা কুকুর এসে তাকে কামড়ে ধরে। তারপর প্রাণপণ ঝাপটাঝাপটি। কিছুক্ষণ পর ডেলমন্ট ক্যাম্পে ফিরে দেখে মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে পড়ে বাদুড়টি হাঁপাচ্ছে। তাকে বাঁচানো আর সম্ভব হল না।

যতদিন অবধি দেশে-বিদেশে চিড়িয়াখানা থাকবে আর সার্কাস থাকবে আর মানুষ জ্যান্ত সব জীবজন্তু ফাঁদ পেতে ধরতে থাকবে, ততদিন অস্ট্রিয়ার বালক ডেলমন্টের কৃতিত্বের কথা কেউই ভুলবে না। জানোয়ারদের সে সত্যি ভালোবাসত এবং শুধু খাদ্যের বা আত্মরক্ষার তাগিদ ছাড়া জীবনে সে কোনো জানোয়ার হত্যা করেনি।

হাস্যকৌতুক

১

নাসিমা আর তার বোন শামিমাকে তার খালাম্মা দুটি পিঠা দিয়েছিলেন। শামিমা বড়টা নেবার জন্যে একটু চালাকি করে বলল : তুই-ই আগে নে নাসিমা। নাসিমা কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে বড়টাই নিয়ে নিল।

রাগে দুঃখে শামিমা বলল : তুই একেবারে অভদ্র রে!

নাসিমা বলল : অভদ্র হলাম কেমন করে? তুমি হলে কোনটা নিতে?

—আমি তো ছোটটাই নিতাম।

—তা হলে ছোটটাই তো পেয়েছ তুমি। এ নিয়ে দুঃখ করছ কেন?

বলল নাসিমা।

২

বাচ্চারা বসার ঘরে যখন টেলিভিশন দেখছিল বাবা-মা তখন রাতের খাবারের জন্য সবকিছু গুছিয়ে রাখছিল। এমন সময় খাবারঘরে কোনো-একটা কাচের জিনিস ভাঙার আওয়াজ বাচ্চাদের কানে এল। শুনে বাচ্চাদের একজন বলল, 'নিশ্চয়ই আম্মার হাত থেকে কিছু পড়েছে।'

অন্যজন : কী করে বুঝলে আম্মার হাত হতে পড়েছে? আব্বার হাত থেকেও তো পড়তে পারে।

প্রথমজন : না, আব্বার হাত থেকে পড়েনি। তা হলে মা এতক্ষণে চেঁচামেচি শুরু করে দিতেন।

বনফুল-এর গল্প

সুলেখার ক্রন্দন

সুলেখা কাঁদিতেছে। গভীর রাত্রি—বাহিরে জোছনায় ফিনিক ফুটিতেছে। এই স্বপ্নময়ী আবেষ্টনীর মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপুড় হইয়া ষোড়শী তন্বী সুলেখা অঝোরে কাঁদিতেছে। একা। ঘরে আর কেহ নাই। চুরি করিয়া একফালি জোছনা জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশ করিয়া এই ব্যথাতুরা অশ্রুমুখী রূপসীকে দেখিয়া সে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেন এ ক্রন্দন?

প্রেম! হইতে পারে বইকি। এই জোছনা-পুলকিত যামিনীতে সুন্দরী ষোড়শীর নয়নপল্লবে অশ্রুসঞ্চারের কারণ, প্রেম হইতে পারে, সুলেখার জীবনে প্রেম একবার আসি-আসি করিয়াছিল তো। তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। অরুণ-দা নামক যুবকটিকে সে মনে-মনে শ্রদ্ধা করিত। অতীব সঙ্গোপনে এবং মনে-মনে। এই শ্রদ্ধাই স্বাভাবিক নিয়মে প্রেমে পরিণত হইতে পারিত; কিন্তু সামাজিক নিয়ম তাহাকে বাধা দিল। সামাজিক নিয়ম অনুসারে অরুণ-দা নয়, বিপিন নামক জনৈক ব্যক্তির লোমশ গলদেশে সুলেখা বরমাল্য অর্পণ করিল।

হয়তো এই গভীর রাত্রিতে জোছনার আবেশে সেই অরুণ-দাকেই তাহার বারবার মনে পড়িতেছে। নির্জন শয্যায় তাহারই স্মরণে হয়তো এই অশ্রুতর্পণ। তবে ইহাও ঠিক যে, তাহার

গোপন হৃদয়ের ভীরু বার্তাটি সে অরুণ-দাকে কখনও জানায় নাই। মনে-মনে তাহার যে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, বিবাহের পর তাহা ধীরে ধীরে কালের অমোঘ নিয়মানুসারে আপনিই নিবিয়া গিয়াছে।

বিপিন যদিও অরুণ-দা নয়, কিন্তু বিপিন—বিপিন। একেবারে খাঁটি বিপিন। এবং আশ্চর্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে, বিপিনের বিপিনত্বকে সুলেখা ভালোও বাসিয়াছিল। ভালোবাসিয়া সুখীও হইয়াছিল। সহসা আজ নিশীথে সেই বিস্মৃত-প্রায় অরুণ-দাকে মনে পড়িয়া আঁখিপল্লব জল হইয়া উঠিবে, সুলেখার মন কি এতটা অতীতপ্রবণ?

হইতে পারে। নারীর মন বিচিত্র। তাহাদের মনস্তত্ত্বও অদ্ভুত। সে-সম্বন্ধে চট করিয়া কোনো মন্তব্য করা উচিত মনে করি না। বস্তুত স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে কোনোকিছু মন্তব্য করাই দুঃসাহসের কার্য। যে রমণীকে দেখিয়া মনে হয়, বয়স বোধহয় উনিশ-কুড়ি—অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে তাহারও বয়স পঁয়ত্রিশ। এতদনুসারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পুনরায় কাহারও বয়স যখন অনুমান করিলাম পঁচিশ—প্রমাণিত হইয়া গেল তাহার বয়ঃক্রম পনেরো বৎসরের এক মিনিটও অধিক নয়।

সুতরাং নারী-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে বেকুবের মতো ফস করিয়া কিছু-একটা বলিয়া বসা ঠিক নয়। সর্বদাই ভদ্রভাবে ইতস্তত করা সঙ্গত। ইহাই সার বুঝিয়াছি এবং সেইজন্যই সুলেখার ক্রন্দন সম্বন্ধে সহসা কিছু বলিব না। কারণ আমি জানি না। এই ক্রন্দনের শোভন ও সঙ্গত কারণ যতগুলি হওয়া সম্ভব, তাহাই বিবৃত করিতেছি।

গভীর রাত্রে একা ঘরে একটি যুবতী শয্যায় শুইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া চলিয়াছে—ইহা একটি ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়ও হইতে পারে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, তাহা নয়। পাঠক-পাঠিকাগণ এ-বিষয়ে অন্তত নিশ্চিন্ত হউন। বিপিন এবং সুলেখাকে যতদূর জানি, তাহাতে তাহাদের ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হইবার মতো যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

অরুণ-দার কথা ছাড়িয়া দিলে সুলেখার ক্রন্দনের আর-একটি সম্ভাবনার কথা মনে হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে সুলেখার একটি সন্তান হইয়াছিল। তাহার প্রথম সন্তান। সেটি হঠাৎ মাস-দুই পূর্বে ডিপথিরিয়াতে মারা গিয়াছে। হইতে পারে সেই শিশুর মুখখানি সুলেখার জননী-হৃদয়কে কাঁদাইতেছে। শিশুটির মৃত্যুর পর সুলেখার দুই-দিন 'ফিট' হয়—ইহা তো আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি। চিরকালের জন্য যাহা হারাইয়া গিয়াছে, তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ফিরিয়া পাইবার আকুলতা কঠোর পুরুষের মনেও মাঝে মাঝে হয়। কোমলহৃদয়া রমণীর অন্তঃকরণে তাহা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ক্রন্দনের কারণ পুত্রশোক হইতে পারে। অবশ্যই হইতে পারে।

কিন্তু হ্যাঁ, আর-একটা কারণও হইতে পারে। পুত্রশোক-প্রসঙ্গের পর এই কথাটি বলিতেছি বলিয়া আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন—কিন্তু ক্রন্দনের এই তুচ্ছ সম্ভাবনাটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। বিগত কয়েক দিবস হইতে একটি নামজাদা ছবি স্থানীয় সিনেমা-হাউসে দেখানো হইতেছে। পাড়ার যাবতীয় নরনারী সদলবলে গিয়া ছবিটি দেখিয়া আসিয়াছেন এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু বিপিন লোকটি এমনই বেরসিক যে, সুলেখার বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সুলেখাকে উক্ত ছবি দেখাইতে লইয়া যায় নাই। প্রাঞ্জল ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুলেখার যাহা ভালো লাগে, প্রায়ই দেখা যায় বিপিনের তাহাতে রাগ হয়। আশ্চর্য লোক এই বিপিন! কিছুক্ষণ আগেই সিনেমায় লাস্ট শো হইয়া গিয়াছে। সুলেখার শয়নঘরের বাতায়নের নীচে দিয়াই সিনেমাতে যাইবার পথ। দর্শকের দল খানিকক্ষণ আগেই এই রাস্তা দিয়া সোল্লাসে হল্লা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিল। হয়তো তাহাতেই সুলেখার শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে একা কেন? বিপিন কোথায়?

সে কি বেগতিক দেখিয়া এই গভীর রাত্রেই কল্যকার জন্য সিট বুক করিতে গিয়াছে?

হইতে পারে। তরুণী-পত্নীকে শান্ত করিবার জন্য মানুষ সব করিতে পারে। হোক না বিপিন লোমশ—সে মানুষ তো! তাছাড়া বিপিন সুলেখাকে সত্যই ভালোবাসিত—ইহাও আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি। কারণ আমরা—লেখকেরা—বিশ্বস্তসূত্রে অবগত থাকি। সুতরাং এই ক্রন্দন সিনেমাঘটিত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

সবই হওয়া সম্ভব। বাস্তবিক যতই ভাবিতেছি ততই আমার বিশ্বাস হইতেছে, সুলেখার ক্রন্দনের হেতু সবই হইতে পারে। এমনকি আজই সন্ধ্যাকালে সামান্য একটা কাপড়ের পাড় পছন্দ-করা প্রসঙ্গে সুলেখার সহিত বিপিনের সাংঘাতিক মতভেদ হইয়া গিয়াছে। রূঢ়ভাষী পুরুষমানুষেরা সাধারণত যাহা করে, বিপিন তাহাই করিয়াছে। গলার জোরে অর্থাৎ চিৎকার করিয়া জিতিয়াছে। মৃদুভাষিণী তরুণীগণ সাধারণত যে-উপায়ে জিতিয়া থাকেন, সুলেখা সম্ভবত তাহাই অবলম্বন করিয়াছে—অর্থাৎ কাঁদিতেছে।

কারণ যাহাই হউক, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে করুণ। রাত্রি গভীর এবং জোছনা মনোহারিণী হওয়াতে আরও করুণ—অর্থাৎ করুণতর। কোনো সহৃদয় পাঠক কিংবা পাঠিকা যদি ইহাকে করুণতমও বলেন, তাহা হইলেও আমার প্রতিবাদ করিবার কিছুই থাকিবে না। কারণ সুলেখা তরুণী। রাত্রি যতই নিবিড় এবং আকাশপ্লাবিনী হউক না কেন, এ-বিষয়ে খুব সম্ভবত আমরা একমত যে, এই রাত-দুপুরে একটা বালক কিংবা একটা বুড়ি কাঁদিলে আমরা এই আর্দ্র হইতাম না। উপরন্তু হয়তো বিরক্তই হইতাম।

সুলেখা কিন্তু তরুণী। মন সুতরাং দ্রব হইয়াছে, এবং এ-কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সুলেখার ক্রন্দনের কারণ না নির্ণয় করা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছি না, এমনকি অরুণ-দাকে জড়াইয়া একটা সস্তাগোছের কাব্য করিতেও মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। মন বলিতেছে, কেন নয়? এমন চাঁদনি-রাতে কৈশোরের সেই অর্ধপ্রস্ফুটিত প্রণয়প্রসূন সহসা পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইতে পারে না কি? ওই তো দূরে 'চোখ গেল' পাখি অশ্রান্ত সুরে ডাকিয়া চলিয়াছে! এমন দুর্লক্ষণে অরুণ-দার কথা মনে হওয়া কি অসম্ভব না অপরাধ? মনের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া কপাটটা হঠাৎ খুলিয়া গেল। ব্যস্তসমস্ত বিপিন প্রবেশ করিল। মুখে শঙ্কার ছায়া। সিনেমার টিকিট পায় নাই সম্ভবত। কিন্তু এ কী!

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, দাঁতের ব্যথাটা কমেছে?

না। বড্ড কনকন করছে।

এই পুরিয়াটা খাও তাহলে। ডাক্তারবাবু কাল সকালে আসবেন বললেন। কেঁদে আর কী হবে! এটা খেলেই সেরে যাবে। খাও লক্ষ্মীটি।

জোছনার টুকরাটি মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

দেখিলেন তো? বলিয়াছিলাম—সবই সম্ভব!

আকাশ তুমি

আহমাদ মাযহার

আকাশ তুমি এমন দূরে থাক
হাত বাড়িয়ে ধরতে পারি নাক
দূরেই যদি থাকলে তবে নীলের গায়ে তুমি
শাদা মেঘের স্বপ্ন কেন এমন করে আঁকো!

আকাশ তুমি এত্ত বড় কেন?
হাত বাড়িয়ে ধরতে পারি যেন
এমন ছোট হলে তোমার দোষ হতো কি বেশি?
তুমিই বল আমার কথা খুব কি যেনতেন?

আকাশ তুমি অনেক ছোট হবে।
এখন বল এখন এবং কবে
আসবে কাছে এত্তটুকু হয়ে আমার মতো
না হলে আর কেমন করে বন্ধু হবে তবে?

শোন আকাশ তোমার গায়ে কারা
জ্বলে এবং নেভে? যাদের বলে সবাই তারা
ওরা কি সব তোমার ছেলে নাকি?
তোমার ডাকে দিচ্ছে রোজই এমন করে সাড়া!

তোমার মেয়ে চাঁদকে দেখে আমি
ডাকলে কাছে বলল হেসে, 'নামি
কেমন করে বল এখন মায়ের কথা ছাড়া।'
তুমি আকাশ নিজকে কেন এমন ভাব দামি?

হতেই যদি ছোট আমার মতো
তোমায় নিয়ে দূরের পাড়া যতো
ঘুরলে বল কী মজাটাই পেতে এখন তুমি!
এখন বল কেইবা দেবে তোমায় মজা অতো?

তবু আমার কথাগুলোর কোনো
হলো না দাম! আচ্ছা তবে শোনো
বড় হয়েই ছোঁয়াব হাত তোমার গায়ে আমি।
যতই তুমি বড় হবার স্বপ্ন মনে বোনো।

শতাব্দীর সেরা খেলা

১৯৬০-৬১ মৌসুমে ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত 'টাই টেস্ট'টিকে বলা হয় সর্বকালের সেরা ক্রিকেট ম্যাচ। এ-মূল্যায়নে খাদ নেই। বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যের পরিমাপ পেয়েই ওই অনুষ্ঠানের কপালে রাজতিলক এঁকে দেয়া হয়েছে।

যে-মূল্যবোধের তাগিদে একটি ক্রিকেট ম্যাচের গলায় আমরা স্বীকৃতির সাতনরি হার ঝুলিয়ে দিতে পারি, সেই মূল্যবোধের প্রেরণায় শতাব্দীর সেরা ফুটবল ম্যাচটিকে বেছে নিতে হলে আমরা কোনদিকে তাকাব?

বেশ কিছুদিন আগে এই প্রশ্ন তোলা হলে হয়তো আমাদের অন্ধের মতো হাতড়াতে হত। ১৯৫৩ সালে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হাঙ্গেরি বনাম ইংল্যান্ডের খেলার দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলত। কারণ, ওয়েম্বলির ওই অনুষ্ঠানটিকে শতাব্দীর সেরা ফুটবল ম্যাচ বলে চালিয়ে দিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষরা রীতিমতো চেষ্টা করেছিলেন, যদিও ওয়েম্বলিতে হাঙ্গেরি জিতেছিল ৬-৩ গোলে।

কিন্তু আজ আর ওয়েম্বলি বা অন্য কোনো ক্রীড়াকেন্দ্রের দিকে পেছন ফিরে তাকাবার দরকার নেই। ১৯৭০ সাল শতাব্দীর সেরা ফুটবল-ম্যাচটিকে বেছে নেবার জন্য যেসব মালমশলা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে তার সাহায্যে ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ নিতান্তই সহজ হয়ে গিয়েছে।

মেক্সিকোতে জুলে রিমে ট্রফি বা বিশ্ব-ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানই বাছাবাছির সহজ সূত্র উপহার দিয়েছে। সেই সূত্র ধরে এগিয়ে গেলেই সমস্ত নির্বাচকের নজরই গিয়ে পড়বে মেক্সিকোর আজটেক স্টেডিয়ামে ১৯৭০ সালের ১৭ জুনের এক সান্ধ্য-আসরের দিকে—যে-আসরে বিশ্বকাপের সেমি-

ফাইনালের ফয়সালা করতে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল পশ্চিম জার্মানি ও ইতালি।

ইউরোপ ফুটবলের দুই সুযোগ্য বাহক ও ধারক মাঠের খেলায় পরস্পরের পরমশত্রু। যুদ্ধে জিতল ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ইতালি। কিন্তু মস্ত বীরত্ব ফলিয়ে মৃত্যুবরণ করল বলেই পশ্চিম জার্মানি এক স্মরণীয় শহীদ বলেই চিহ্নিত হয়ে রইল।

আগের খেলায় কোয়ার্টার-ফাইনালে বাড়তি সময়ে তৃতীয় গোল করে পশ্চিম জার্মানি আগেরবারের বিশ্ববিজয়ী ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিতেই দল-বাঁধা মেক্সিকানরা রাতারাতি পশ্চিম জার্মানির সমর্থক হয়ে গিয়েছিল। কোয়ার্টার-ফাইনালে মেক্সিকোকে হারাতে ইতালি আবার ওই মেক্সিকানদেরই শত্রু বনে গিয়েছিল। কাজেই ইতালির সঙ্গে সেমিফাইনাল খেলায় পশ্চিম জার্মানিকে কলকণ্ঠে মদত যোগাতে হাজার-হাজার মেক্সিকান যে আজটেক স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকবে, তা আর বিচিত্র কী! আজটেক স্টেডিয়ামে সেদিন হাজার-হাজার দর্শক হাজির ছিল। তাদের মধ্যে কতজন যে পশ্চিম জার্মানির সমর্থক ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। নামমাত্র কজনকে বাদ দিলে বোধহয় সবাই।

কিন্তু শুধু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেই কি সমর্থিত দলের জয়ের রাস্তা পাকা হাতে গড়া যায়? ইট-পাথর ছুড়ে রেফারি আর বিপক্ষের খেলোয়াড়দের স্নায়ুর ওপর কয়েকমণি চাপ ছড়াতে পারলে নাহয় খেলার ফলাফল এদিক-ওদিক করা যেত। কিন্তু মেক্সিকো শহরের আজটেক স্টেডিয়াম যেনতেন ফুটবলের আঙিনা নয় যে, গ্যালারি থেকে ইট ছুড়লেই তা মাঠে পৌঁছেই কারুর মাথা ফাটিয়ে দেবে!

না, ইট বা গলাবাজি, কোনোকিছুরই দাম ছিল না সেদিন আজটেক স্টেডিয়ামে। সমর্থকদের সোচ্চার হাঁকাহাঁকি শূন্যেই মিলিয়ে যাচ্ছিল। আর গ্যালারি ও মাঠের মাঝে কয়েকশো গজের ব্যবধান থাকায় ওদেশের দর্শকেরা খেলার কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি। সুতরাং খেলা হল নির্বিঘ্নেই। খেটেখুটে দক্ষতার কড়ি ফেলে খেলোয়াড়রাই সেই ম্যাচের ফয়সালা করে নিলেন।

ফয়সালা! হ্যাঁ, তা-ই। তবে যত সহজে শব্দটি উচ্চারণ করলাম, তত সহজে কিন্তু ব্যাপারটি মিটে যায়নি!

নির্ধারিত নব্বই মিনিটে হার-জিত হল না খেলার। দু-দলই এই ফাঁকে একটি একটি করে গোল করায় খেলা গড়াল বাড়তি সময়ে। ত্রিশ মিনিটের বাড়তি খেলা। কিন্তু কী আশ্চর্য! আগের দেড় ঘণ্টায় গোল হয়েছে মাত্র দুটি। আর পরের আধ-ঘণ্টায় আরও পাঁচটি। সুতরাং নাটক জমল তো ওই পঞ্চমাঙ্কেই।

জমল বলে জমল!

একদল গোল করে তো অন্য দল শোধ দেয়। অন্য দল গোল করে তো বিপক্ষ দল পরপর দুটি গোল করে এগিয়ে যায়। গোলে-গোলে সয়লাব। যত গোল ততই উত্তেজনা এবং তাতেই আকাশ-কাঁপানো চিৎকার। যারা সেদিন ইতালির বিরোধিতায় অন্য দলের সমর্থন করবে বলে আজটেক স্টেডিয়ামে হাজিরা দিয়েছিল, কখন-যে তারা পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন ভুলে খেলা আর গোলের তারিফে সহর্ষ নিনাদে পরিপার্শ্বকে ভরিয়ে তুলেছিল তা তারা নিজেরাই টের পায়নি। শেষ আধঘণ্টায় সমর্থনের অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীক্ষ্ণতর উত্তাপে। আজটেকের ষাট হাজার দর্শকের একজনও তখন বুঝি পশ্চিম জার্মানি বা ইতালির পক্ষে নয়, তারা সবাই তখন ফুটবলের উত্তেজনা-ভরা সমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছে। দল-সমর্থনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে কেই-বা তখন মাথা ঘামায়!

এদিকে মাঝমাঠের অবস্থা আরও অসহনীয়। ঘণ্টা-দেড়েক জান-মান বাজি রেখে তো লড়া হয়েছে। তারপর আরও আধঘণ্টার বাড়তি চ্যালেঞ্জ। প্রথম দেড়ঘণ্টায় কেউই তো মেহনতে ফাঁকি দেননি। অতএব শেষের আধঘণ্টার বাড়তি সঙ্গতি যোগাড়ে সকলকেই হিমশিম খেতে হল।

খাটতে-খাটতে কারুর মুখ ফ্যাকাশে, কারুর-বা রাঙা, কারুর-বা নীল হয়ে গেল। কারুর পা টলতে

লাগল বেসামাল মদ্যপের মতো। এত মেহনত যে মুখে রা-কাড়ার ক্ষমতা গোলরক্ষকেরা ছাড়া সবাই বুঝি হারিয়ে ফেলেছেন। জার্মান তরুণ ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ারের কণ্ঠাস্থি সরে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ব্যান্ডেজ জড়িয়ে নিয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতেই তিনি শেষ আধঘণ্টার খেলা চালিয়ে গেলেন।

চৌত্রিশ বছরের জার্মান ফরোয়ার্ড ইউ সিলারের মাথাভরতি টাক। ঘামে-ঘামে টাক চকচক করছে আর পরিশ্রমভারে দুচোখ যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। বর্ষীয়ান সিলার প্রাণময় পুরুষ বলে স্বীকৃত, কিন্তু তাঁরও অফুরান প্রাণশক্তিতে টান পড়েছে। ওদিকে এঞ্জেলো ডোমেনঘিনিও তেমনি খাটুয়ে খেলোয়াড়। নব্বই মিনিটের খেলায় ডোমেনঘিনির তৎপরতায় ভাটার টান কোনোদিন দেখা যায়নি। কিন্তু আজ তিনিও কাহিল। পরিশ্রমভারে নয়, পায়ের চোটে। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ছুটছেন। লেংচে লেংচে হাঁটছেন। কিন্তু তবু কি হার মানতে চান? হঠাৎ সুযোগ এলেই ওই ফাঁকে চেন-ছেঁড়া গ্রে হাউন্ডের মতো বলের দিকে ঠিকরে যেতে চাইছেন!

প্রথা-প্রকরণ, অধিগত ক্রীড়াকৌশলের জীবন্ত প্রতীকগুলো খেলোয়াড়দের সনিষ্ঠ চেষ্টায় আজটেক স্টেডিয়ামের সবুজ কার্পেটের গায়ে ক্ষণে-ক্ষণে ফুটে উঠেছিল বটে। কিন্তু তবুও দর্শকদের মনে হচ্ছিল, এ বুঝি খেলা নয়, যুদ্ধই। যুদ্ধের আঁচে শুধু খেলোয়াড়রাই নন, দর্শকদের মনও পোড়া মাংসের মতো ঝলসে উঠছে। এ থেকে রেহাই মিলবে কতক্ষণে? কখন হবে খেলা শেষ!

বলতে-বলতে বাঁশি বাজল। খেলা হল সাঙ্গ। সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিম জার্মানির এগারোজন নিশ্চল শবের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁদের যা দেবার ছিল নিঃশেষে তা বিলিয়েছেন। তবু খেলায় জিততে পারেননি। জাতীয় দলের সম্মান ও মর্যাদা তবু ধরে রাখা গেল না। ওদের ভেতরটা ততক্ষণে ডুকরে-ডুকরে কেঁদে উঠছে।

হঠাৎ মনে হল কার যেন খেলা শেষ, কিন্তু তাদের সব কাজ তো এখনও শেষ হয়নি! যেমন মনে-পড়া, অমনি ভূমিশয্যা ছেড়ে টলতে-টলতে এগিয়ে গিয়ে ইতালির খেলোয়াড়দের জনে-জনে জড়িয়ে ধরে অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলে ওঠা—"আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনারাই সার্থক!"

রীতিমতো খেলোয়াড়োচিত আচরণ। দেখে সারা স্টেডিয়াম পশ্চিম জার্মানি দলটির সঙ্গে আর-একবার কৃতজ্ঞতার নিবিড় বাঁধনে জড়িয়ে পড়তে চাইল।

এই জার্মান দল চারবছর আগেকার হারের জবাব দিতে গিয়ে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ঘণ্টাদুয়েক মরণপণ লড়ে দর্শকদের মনে প্রথম কৃতজ্ঞতাবোধের অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়েছিল। তারপর ইতালির মোকাবেলায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিখাদ মূলধন জড়ো করে কৃতজ্ঞতাবোধের তাগিদটি আরও নিবিড় করে তুলেছিল। পরক্ষণেই আবার হেরে গিয়েও বিজয়ী প্রতিপক্ষের দিকে অভিনন্দনের হাত বাড়াতেই জার্মান দলটির প্রতি দর্শকদের কৃতজ্ঞতা যেন উপচেই পড়ল।

খেলায় ইতালির জিত হল বটে, কিন্তু খেলা-ভাঙার লগ্নে পশ্চিম জার্মানির জয়ধ্বনিতে আজটেক স্টেডিয়ামের মাথার ওপরকার আকাশ কেঁপে উঠল। এ-জয়জয়াকার হারা-পার্টি জার্মানির খেলোয়াড়োচিত ভূমিকার স্বীকৃতিতেই। হারকে হার বলে মেনে নেবার সময় যারা হাসতে পারে তারাই তো সত্যিকারের খেলোয়াড়—স্পোর্টসম্যান।

মেক্সিকোর আজটেক স্টেডিয়ামে বিশ্ব-ফুটবল বা জুলে রিমে কাপের সেমিফাইনালে ইতালি বনাম পশ্চিম জার্মানির খেলাটি যে শতাব্দীর সেরা ম্যাচের সংজ্ঞা পাবে, এমন ধারণা কিন্তু খেলার আরম্ভে অথবা নির্ধারিত সময়ের শেষদিকেও মনে হয়নি।

দুপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমবে, এইটিই ছিল সাধারণ প্রত্যাশা। যেহেতু জার্মান দল গতবারে বিশ্ববিজয়ী ইংল্যান্ডকে সবে হারিয়েছে এবং ওই দলের জার্ড মুলার প্রায় প্রতিটি খেলাতেই, ক্ষেত্রবিশেষে তিনটি করেও গোল করার ওস্তাদি দেখাচ্ছেন এসব কারণেই ছিল এ-প্রত্যাশা। আরও কারণ ইতালিই যে ইউরোপীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন।

খেলা আরম্ভের আট মিনিটের মধ্যেই বোনিনসেগনারের শটে ইতালি এক গোলে এগিয়ে যায়। গজ-পঁচিশেক দূর থেকে বোনিনসেগনার শটটি মেরেছিলেন, উড়ন্ত বল ছুটতে-ছুটতে এসে বাঁক ফিরেই জার্মান গোলরক্ষক মেয়ারের নাগাল এড়িয়ে টুক করে গোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

ওই একটিমাত্র গোলে এগিয়ে থেকেই ইতালির বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দেবার মতলব ছিল। কিন্তু বাদ সাধলেন জার্মান ফুলব্যাক কার্ল-হেঞ্জ স্নেলিঞ্জার। ছ-ফুটের ওপর লম্বা, পাতলা, হাল্‌কা চেহারা, একমাথা শাদা চুলওয়ালা এই স্নেলিঞ্জার আত্মরক্ষার সময় ফুলব্যাক আর দলের আক্রমণমুখে পুরোদস্তুর ফরোয়ার্ড। ও-পক্ষের অলক্ষ্যে যেন চুপিসারেই এগিয়ে এসে একফাঁকে গোলটি শোধ করে দিতেই যেন সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গোলদাতার ওপর। গোলদাতা কে? আরে, ইনি-যে ফুলব্যাক স্নেলিঞ্জার! গোলদাতাকে আবিষ্কার করে ওই মুহূর্তে অনেকেই চমকে ওঠে।

আর চমকের হেতু, ঘড়ির কাঁটার অবস্থান। জার্মানি যখন গোল শোধ দেয় তখন ঘড়ির কাঁটা দেড় ঘণ্টার সময়সীমা পেরিয়ে আরও এগিয়ে গিয়েছে। আহত খেলোয়াড়দের শুশ্রূষার প্রয়োজনে সময় কিছু নষ্ট হয়েছিল বলে মেক্সিকান রেফারি আর্থার ইয়ামাসকি কিছু বাড়তি সময়ের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে স্নেলিঞ্জারের পক্ষে গোলটি শোধ করা সম্ভব হয়। নইলে জুলে রিমে কাপে পশ্চিম জার্মানি বনাম ইতালির এবারের খেলাটির ভাগ্যে নিশ্চয়ই শীর্ষসংজ্ঞা জুটত না।

এবারে শুরু অতিরিক্ত সময়ের খেলা। একদিকে লুইগি রিভা ও আজোলার বদলি রিভেরা এবং অন্যদিকে ইউ. সিলার ও জার্ড মুলার, এই যুগল জুটি মিলে আক্রমণের ছক কষতে লাগলেন। পরস্পরের বোঝাপড়া নিখুঁত, অথচ কী আশ্চর্য, কারা যেন রটিয়েছিল যে সিলার ও মুলার পরস্পরকে

দেখতেই পারেন না। তা যদি হবে তো মাঠে নেমে এমন কমরেডসদৃশ আচরণে দুজন দুজনের চিন্তাধারায় জড়িয়ে পড়েনই-বা কী করে! আপেক্ষিক টানে দুজনেই দুজনকে ছুঁয়ে ছিলেন, তাই কাজের হিসেবে একজন আর-একজনের পরিপূরক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন। এই পূর্ণতা ছাড়া কোনো দলই পরীক্ষার মুহূর্তে আশানুরূপ ভালো খেলতে পারে না।

বাড়তি সময়ের খেলার পাঁচ মিনিটও পুরো হয়নি; এমন সময় ভিড়ের ফাঁকে বল পেয়ে জার্ড মুলার যে কেমন করে তা ইতালির গোলে ঠেলে দিলেন তা যেন পরমাশ্চর্য! জার্মান দল এগিয়ে গেল। বিটলসদের অনুকরণে বাবরি-চুলো জার্মান তরুণ জার্ড মুলারকে নিয়ে মাঠের মাঝে কিছুক্ষণ নাচানাচি হল। কিন্তু তার পরই যেন জার্মান খেলোয়াড়দের চোখ ফেটে পানি গড়াবার পালা।

মিনিট-চারেকও কাটেনি, বার্গনিচ গোল পরিশোধ করে দিলেন। বার্গনিচও কার্ল হেঞ্জ স্নেলিঞ্জারের মতো আক্রমণাত্মক ফুলব্যাক। আর পরিশ্রমের ক্ষমতাও ধরেন বটে। সারা মাঠটা ছুটে এসেও তাঁর ক্লান্তি নেই। জার্মান রক্ষণব্যূহের জন্য তিন মহারথী যেই-না একমুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছেন, অমনি বলে ছোঁ মেরেই বার্গনিচ সজোরে পা চালালেন। বলটা ধরার ফুরসতই পেলেন না জার্মান গোলরক্ষক মেয়ার।

আরও চার মিনিট পর ইতালি আরও একটি গোল করে। মাঝমাঠ থেকে এঞ্জেলো ডোমেনঘিনি বল বাড়িয়েছিলেন গড়িয়ে। কোথা থেকে ছুটে এসে ছোঁ মেরে বলটিকে বাগিয়ে ধরলেন পুইগি রিভা। মস্ত খেলোয়াড় এই রিভা। মেক্সিকোয় আসার আগে ফুটবলের বাজারে তাঁর দর চড়েছিল সবচেয়ে বেশি। পেলের চেয়েও বেশি। সেই রিভা এমনভাবে বলটিকে আয়ত্তে আনলেন যে বল ধরার সঙ্গে-সঙ্গেই জার্মান দলের পুরো রক্ষণব্যবস্থাটাই তছনছ হয়ে গেল। সব সতীর্থই বেসামাল। গোলরক্ষক সেপ মেয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলবে ছিলেন, কিন্তু চতুর রিভা তাঁকে সে ফুরসতই দিলেন না। আগেই বাঁ-দিকের পোস্ট ঘেঁষে বলটি জালের ভেতরে ঠেলে দিলেন।

ইতালি এগোল! কিন্তু দু-দলের আগুপিছু করা কি এতেই শেষ হল? তখনও পালা ফুরোয়নি।

ঝাড়ের বাঁশ জার্ড মুলার। বাঁশের গোড়া তখনও কাটা হয়নি। তাই জ্যান্ত বাঁশ চাপে পড়ে নুয়ে গেলেও ভেঙে পড়তে প্রবল অনীহা। এ-ধার ও-ধারে ছুঁক-ছুঁক করছিলেন তিনি। যেই-না সুযোগ এল অমনি স্প্রিঙের মতো শূন্যে লাফিয়ে হেড করে কী যে করে ফেললেন, ইতালির দীর্ঘকায় ফুলব্যাকেরা তার আন্দাজই পেলেন না। যখন বুঝতে পারলেন তখন গোলরক্ষক আলবার্টোসি জালের পাশ থেকে বলটি কুড়িয়ে আনলেন। আবার খেলার ফল একবিন্দুতে এসে আটকা পড়ল।

কিন্তু নাটকের সমাপ্তি এখানেও নয়। দলের জার্ড মুলার তৃতীয় গোল করার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর সতীর্থরা নিবিড় বাহুবন্ধনে আর-একবার এই তরুণকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। স্নেহালিঙ্গনের উষ্ণ রেশটুকু তখনও মিলিয়ে যায়নি, এমন সময় রবার্টো বোনিনসেগনার বাঁদিককার উইং ধরে ছুটছিলেন। মাঝ-মাঠের খেলোয়াড়, হঠাৎ উইঙ্গারের ভূমিকা নিয়েই দৌড় দিলেন চোঁ-চোঁ। উদ্দেশ্য ছিল, ওপক্ষের কয়েকজনকে তাঁর দিকে টেনে আনা। টানলেনও এবং দৌড়শেষে ভেতরের দিকে ছোট্ট পাসটি বাড়িয়ে দিতেই একেবারে ফাঁকায় বল পেয়ে গেলেন বদলি-খেলোয়াড় গিয়ানি রিভেরা।

বল তো নয়, যেন পুরো একটি সাম্রাজ্যই এখন রিভেরার পায়ের তলায়। ওদিকে জার্মান গোলরক্ষক মেয়ারের অবস্থা বলির পাঁঠার মতো। হানাদার রিভেরা যে-সাম্রাজ্য হাতিয়ে নেবার মতলব ফেঁদেছেন সেই সাম্রাজ্য রক্ষা করার দায়িত্ব একমাত্র তাঁরই। কথাটা মনে পড়তেই মেয়ারের সারা শরীর যেন দুলে উঠল।

সেই দুলুনির বাতাস গায়ে না হোক রিভেরার মনেও বুঝি লেগেছিল। তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের ভার তো কম নয়। একচুল এদিক-ওদিক হলে গোটা সাম্রাজ্যই যে বেহাত হয়ে যায়! পলকখানেক সময় নিলেন রিভেরা, চোখে-চোখে দেখা হল রিভেরা ও মেয়ারের। একজন আর-একজনের মতলবের ঠাওর পেতে চান।

চোখে-চোখে লুকোচুরি খেলা। সে-খেলায় রিভেরাই জিতলেন। ভান করলেন, যেন ডানদিকেই বল ঠেলছেন। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ারও ঝাঁপালেন সেইদিকে। কিন্তু পরক্ষণেই মেয়ারের ভুল ভাঙতে দেখা গেল। রিভেরা মেয়ারের বাঁদিক দিয়েই বলটি ঠেলে দিয়েছেন গোলের ভেতর। 'ভুল, ভুল' বলে কঁকিয়ে উঠলেন মেয়ার, দু-হাত দিয়ে মাটি থাপড়ে যেন নিজের কপালই চাপড়াতে লাগলেন। কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটার ঘটেই গিয়েছে। এই গোলেই খেলা শেষ। রিভেরার গোলেই জার্মান দলের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে গেল। পরবর্তী কিছুক্ষণ গোল-পরিশোধে জার্মান খেলোয়াড়েরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু দলের প্রায় সব ক'জন নেমে এসে ইতালির গোলের সামনে এমন পুরু পাঁচিল গড়ে তোলেন যে এই পাঁচিলের গায়ে মুখ থুবড়ে পড়ে জার্মান শটগুলোর গতিরুদ্ধ হয়ে পড়ে। শেষাঙ্কেও জার্মান দল চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রায় ঘণ্টাদুয়েক হাড়ভাঙা খাটুনির পর নতুন উৎসাহে নবতর প্রয়াস পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সেই চেষ্টাকে মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষুর শেষনিশ্বাস ত্যাগের মতো ঠেকছিল।

জুলে রিমে কাপের ওই ঐতিহাসিক সেমিফাইনালে দুপক্ষে খেলেছিলেন :

ইতালি : আলবার্টোসি, বার্গনিচ, রোসাটো, সেরাও ফেচেটিং, বার্টিন ও মাজোলা (রিভেরা), ডি সিন্তি, ডোমেঘিনি, বোননসেগনার ও লুইগি রিভা।

পশ্চিম জার্মানি : সেপ মেয়ার, পাজকে, স্কালজ, স্নেলিঙ্গার ও ভগটস, ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ার ও ওভারথ, গ্রাবাউস্কি, ইউ, সিলার, জার্ড মুলার ও লোহর।

রেফারি : আর্থার ইয়ামাসকি (মেক্সিকো)।

'বিশ্বকাপ ফুটবল' বই থেকে

আফ্রিকার ডোরাকাটা

প্রাণিবিজ্ঞানীরা আফ্রিকাকে বলেন 'প্রকৃতির চিড়িয়াখানা'। সত্যিই এত বিচিত্র পশুপাখি, সরীসৃপ, পতঙ্গের সমাবেশ অন্য কোনো মহাদেশে দেখা যায় না। তবে এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও কিছু পশুপাখি একনজরে তার জন্মভূমিকে চিনিয়ে দেয়। আফ্রিকার এইরকমই সব আশ্চর্য পশুপাখির মধ্যে আছে জিরাফ এবং উটপাখির সঙ্গে জেব্রাও। বিদেশীদের সঙ্গে জেব্রার পরিচয় ঠিক কবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমান, আফ্রিকার তৃণভূমিতে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এই অদ্ভুত সুন্দর প্রাণীটি তাদের চোখে পড়েছিল। এখন আমাদের প্রথম পরিচয় হয় ইংরেজি 'ওয়ার্ডবুক'-এর পাতায়। 'জেড' দিয়ে আরম্ভ, এরকম শব্দ ইংরেজিতে খুবই কম। তাই 'জেডের' সঙ্গে জেব্রার সম্পর্ক ওতপ্রোত।

আমাদের কাছে সব জেব্রাই একরকমের। প্রাণিবিজ্ঞানে কিন্তু জেব্রা আছে তিনরকম—বার্চেলস জেব্রা, গ্রেভিস জেব্রা এবং পাহাড়ি জেব্রা। এই তিন প্রজাতির মধ্যে বার্চেলস জেব্রাকে চোখে পড়ে সবচেয়ে বেশি। হিসেবমতো এখন তিন লাখের কাছাকাছি এই জাতের জেব্রা চরে বেড়ায় পূর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলিতে। পূর্ব আফ্রিকার সেরেঞ্চেটি এবং মারা ন্যাশনাল পার্কেই দুই লাখের মতো জেব্রা আছে।

বার্চেলস জেব্রার এক জ্ঞাতিকেই সাধারণ বা পরিচিত জেব্রা বলা হয়। এর নাম 'চ্যাপম্যানের জেব্রা'।

আফ্রিকার বাইরে এরাই চেনামুখ। দেশ-বিদেশের চিড়িয়াখানায় এদের দেখা মেলে বেশি। আকারে বার্চেলের জেব্রার চেয়ে কিছুটা ছোট আর মেজাজে বেশ শান্ত। চিড়িয়াখানার কর্তাদের কাছে এমন শান্তশিষ্ট নিরীহ সুন্দর প্রাণী খুব পছন্দসই হওয়াই স্বাভাবিক। বলে রাখা ভালো—নামে আলাদা হলেও পরিচিত বা চ্যাপম্যানের জেব্রা আসলে বার্চেলের জেব্রার এক উপপ্রজাতি। এই জাতের প্রাণীর স্বভাবচরিত্র, খাদ্যাভ্যাস কিংবা জীবনযাত্রার মধ্যে গরমিলের চেয়ে মিলই বেশি।

দ্বিতীয় প্রজাতির জেব্রা, গ্রেভির জেব্রা—তিন জাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট। বলতে কি, বন্য অশ্বজাতীয় প্রাণীর মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড়। একটা পরিণত জেব্রা কাঁধের কাছে প্রায় দেড় মিটার খাড়াই হতে পারে। বার্চেল এবং পরিচিত জেব্রার মতো এরা দল বেঁধে থাকে না, নিঃসঙ্গ থাকাটাই পছন্দ করে বেশি। তবে, ঘর-সংসার করার সময়ে কিছুদিন বাবা-মা-বাচ্চার সঙ্গে থাকতে পারে। এখন এই জাতের জেব্রা শুধু চোখে পড়বে কেনিয়া এবং ইথিওপিয়া আর সোমালিয়ার কেনিয়া-সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। মেজাজে এরা কিন্তু পরিচিত জেব্রার মতো মোটেই শান্তশিষ্ট নয়, বরং উগ্র আর বদমেজাজি। কাছাকাছি গিয়ে পড়লে এরা তেড়ে আসে। এখন এই জাতের জেব্রা কত আছে, তার বিশদ খবর মেলেনি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সাতের দশক থেকেই এদের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি কমতে থাকে। এখন এই জাতের জেব্রা আছে খুব বেশি হলে ১০ থেকে ১৫ হাজার।

তৃতীয় জাতটি, অর্থাৎ পাহাড়ি জেব্রার আবার দুটি উপপ্রজাতি—'কেপ মাউন্টেন' আর 'হার্টমান্‌স মাউন্টেন' জেব্রা। দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া আর কেপ প্রভিন্সের পাহাড়ি তৃণক্ষেত্রেই শুধু এদের দেখা যাবে। এখন মোটামুটি ১৫ হাজারের কাছাকাছি টিকে আছে এরা। তবে ঠিকঠাক হিসেবে হার্টমান্‌স মাউন্টেন জেব্রার, কেপ মাউন্টেন জাতের ইতিহাস অতি করুণ।

ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে ৩০০ বছরের আগেও কেপ মাউন্টেন জেব্রার সংখ্যা এতই কমে গিয়েছিল যে, তাদের সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রামাণ্য তথ্য অনুযায়ী সংরক্ষণব্যবস্থা কার্যকর হয়েছিল ১৬৫৬ সালে। ১৮০৬ সালে কেপ মাউন্টেন ইংরেজশাসনাধীন হলে জেব্রাদের সংরক্ষণব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়। ওই সময়েই জানা যায় যে, পাহাড়ি জেব্রার জাতটি অন্য দু-জাতের সমতলবাসী জেব্রার চেয়ে একেবারেই আলাদা। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের এটাই সম্ভবত প্রাচীনতম নজির। এখন 'ক্র্যাডক'-এর কাছে 'মাউন্টেন জেব্রা ন্যাশনাল পার্ক'-এ এই জাতের জেব্রা আছে ৭০-৮০টা। আর খুব অল্প সংখ্যায় এদের দেখা মিলবে সোয়েলেনড্র্যামের কাছে গেম রিজার্ভ-এ। সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা ১০০-র গণ্ডি পেরোবে না।

তিন জাতের জেব্রা সহজে আলাদা করে নেওয়া একটু শক্ত। বার্চেলের জেব্রার ডোরাগুলো অন্য দু-জাতের চেয়ে অনেক বেশি চওড়া। পাহাড়ি জেব্রার গায়ের ডোরাগুলো সরু হলেও পেছনের পায়ের কাছটা চওড়া ডোরায় চিত্রিত। সামনের সরু ডোরাগুলো বেশ ঘন সন্নিবিষ্ট। গ্রেভির জেব্রার শরীর জুড়ে সরু সরু ডোরা এত ঘেঁষাঘেঁষি করে যে, মাঝের রুপোলি-শাদা অংশ প্রায় চোখেই পড়ে না।

শুধু এইটুকু নয়, তিন জাতের মধ্যে অন্য তফাতও চোখে পড়ে। বার্চেলের জেব্রা লম্বায় দুই থেকে আড়াই মিটার এবং কাঁধের কাছে দেড় মিটারের কিছু কম (১০-১৫ সেমি) খাড়াই হয়ে থাকে। ওজনে এরা সাড়ে ৩০০ কেজির কাছাকাছি। সাধারণ জাতের জেব্রার ওজন কিছু কম, ১৭৫ থেকে ২০০ কেজির মতো। লেজের দৈর্ঘ্য ৫০ সেমি। পাহাড়ি জেব্রার গড়ন কিছুটা ছিমছাম আর লম্বাটে। লম্বায় এরা আড়াই মিটার বা কিছু বেশি হতে পারে, ঝুলন্ত লেজটিও মাপে ৮০ সেমির মতো। কাঁধের উচ্চতায় পাহাড়ি জেব্রা গ্রেভির জেব্রার মতোই, কম-বেশি দেড় মিটার। লম্বায় এই দু-জাতের জেব্রা প্রায় সমান। তবে, ওজনে গ্রেভির জেব্রা যেখানে সওয়া ৪০০ কেজির ওপরেও যেতে পারে, পাহাড়ি জেব্রা সেই তুলনায় নেহাতই হালকা, বড়জোর ৩৩৬ কেজি। লেজের মাপ দু-জাতেরই সমান, ৭৫ থেকে ৮০ সেমি।

পাহাড়ি জেব্রার অন্য বৈশিষ্ট্য তার খুরের আকৃতিতে। সমতলভূমির জেব্রার চেয়ে এদের পায়ের খুর কিছুটা ছড়ানো। এজন্যই এরা পাহাড়ি ঢালে বেশ স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে। ঘাড়ের নিচের দিকে একটা চামড়ার ভাঁজ বা 'ডিউল্যাপ' এদের আর-এক বৈশিষ্ট্য।

প্রাণিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জেব্রা ঘোড়ার নিকটাত্মীয়। কবে এরা পৃথিবীতে এল, এই নিয়ে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তবে, কমপক্ষে ১০ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকার প্রাগৈতিহাসিক প্রান্তরে এখনকার জেব্রার পূর্বপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, এমন ধারণা করেন বিজ্ঞানীরা।

বুনো ঘোড়ার মতোই জেব্রার দৈহিক গঠন বেশ মজবুত। মাথা, ঘাড়, শরীর এবং পা চারটের গড়নেও ঘোড়ার আদল স্পষ্ট। তবে গৃহপালিত এবং উন্নত জাতের ঘোড়ার মতো এদের পেট এবং কোমরের কাছটা সরু নয়। বরং বুনো গাধা বা ঘোড়ার মতো বেশ মোটাসোটা। লেজের গড়ন কিন্তু একেবারেই ঘোড়ার মতো নয়। গাধার মতো এদের লেজও সরু এবং লম্বা, একেবারে শেষপ্রান্তে আছে একগুচ্ছ শক্ত লোম। ঘাড়ের কেশর আবার ঘোড়ার মতো লেপটে পড়ে থাকে না। উঁচিয়ে থাকে চুড়োর মতো। অবশ্য বুনো ঘোড়া কিংবা গাধার কেশর ঠিক এরকমই।

জেব্রা তৃণভোজী প্রাণী। আফ্রিকার খোলা প্রান্তরে, যেখানে বড় গাছ বিশেষ নেই কিন্তু ঘাসের সঙ্গে অল্পকিছু ছোট ঝোপঝাড় আছে, তেমন জায়গাই এদের পছন্দ। গ্রেভির জেব্রা ছাড়া বাকি দু-জাতের জেব্রাই দলবদ্ধ জীব। বার্চেলের জেব্রার এক-একটা পালে ১৬টা পর্যন্ত সদস্য থাকতে পারে। দলের সর্দার এক শক্তসমর্থ পুরুষ, অন্য সদস্যের মধ্যে পাঁচ কিংবা ছ'টি স্ত্রী-জেব্রা আর তাদের বাচ্চা।

বেশিরভাগ জেব্রার পালকে অ্যান্টিলোপ, অরিক্স কিংবা ন্যু-এর (অন্য নাম ওয়াইল্ড বিস্ট) দলের সঙ্গে মিলেমিশে ঘুরে বেড়াতে এবং জল খেতে দেখা যায়। বিশেষ করে ন্যু-এর দলের সঙ্গে এদের

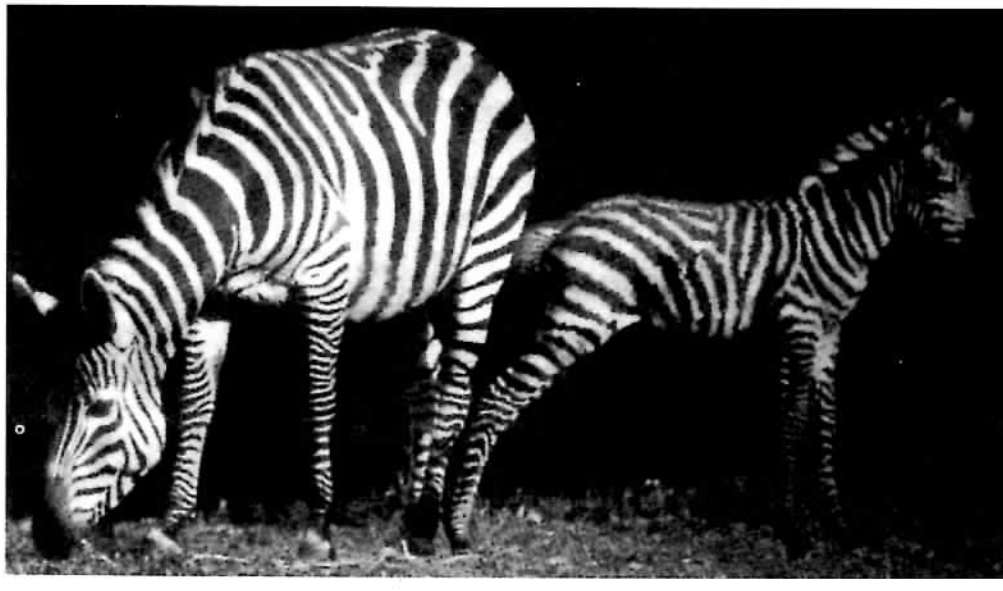

বন্ধুত্ব চোখে পড়ার মতো। জেব্রার মতো এরাও তৃণভোজী। কিন্তু জেব্রা খায় শক্ত ধারালো পাতার ঘাস, অন্যদের পছন্দ নরম রসালো ঘাসপাতা। কাজেই একসঙ্গে ঘুরে বেড়ালেও খাবারের ভাগ নিয়ে বিরোধ বাধে না। তবে, আফ্রিকার প্রান্তরে এমনিতেই খাবার জোটে কম। খাবার আর জলের খোঁজে জেব্রার দলকে ২৫০ বর্গকিলোমিটার প্রায় তন্নতন্ন করে ঘুরে বেড়াতে হয়।

একগুঁয়ে গ্রেভির জেব্রা নিজের এলাকায় কোনো অনুপ্রবেশকারীকে, তা সে অন্য কোনো জেব্রা হোক অথবা অন্য কোনো প্রাণী, ঢুকতে দিতে নারাজ। এদের এলাকা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বড় কম নয়। খাওয়ার জল ঠিকমতো মিললে এই এলাকা আড়াই বর্গকিলোমিটার হতে পারে, আবার খাদ্যের ভাঁড়ারে টান পড়লে একটা জেব্রার নিজস্ব এলাকা ১০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। নিজের এলাকায় অন্য জেব্রা এসে পড়লে কিছুক্ষণ দৌড়োদৌড়ি এবং একে অপরকে তাড়া করার মধ্যেই লড়াইয়ের পর্ব শেষ হয়।

স্ত্রী-জেব্রার মাত্র দু-বছর বয়সেই বাচ্চা হয়। একবারে একটা বাচ্চাই জন্মায়। জন্মের পরই বাচ্চা উঠে দাঁড়াতে এবং দু-একদিনের মধ্যে দলের সঙ্গে ঘুরেফিরে বেড়াতেও পারে। ছ-মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চার প্রধান খাদ্য মায়ের দুধ। ঘাস খেতে শেখে এরা দু সপ্তাহের মধ্যে। জন্মের সময়ে জেব্রার বাচ্চার আকার এবং ওজন হয় একটা গাধার বাচ্চার মতো। ঘোড়া-গাধার দুধের মতো জেব্রার দুধও বেশ ঘন। বিজ্ঞানীরা এর মধ্যে গোলাপি রঙের একটি পদার্থ খুঁজে পেয়েছেন। 'কলোস্ট্রাম' নামের পদার্থটির গুণ একাধিক। বাচ্চা-জেব্রার শরীরে এটি রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

জেব্রাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধনটি বেশ জোরালো। একদলের সদস্যরা একে অন্যকে বেশ ভালোই চেনে। মানুষের মধ্যে যেমন দুজনের আঙুলের ছাপ (ফিঙ্গার প্রিন্ট) কখনো এক হয় না, এদের গায়ের ডোরা দাগগুলোও তেমনই। একটি জেব্রার থেকে অন্যটির ডোরার প্যাটার্ন কিছুটা আলাদা হবেই। আমাদের চোখে না-পড়লেও জেব্রারা এই পার্থক্য ঠিক বুঝতে পারে। ঘোড়ার মতো জেব্রার গায়েও এক বিশেষ গন্ধ থাকে। সেই গন্ধ শুঁকে একটি জেব্রা আর-একটি জেব্রার পরিচয় পেয়ে যায়। আফ্রিকার দুর্দান্ত গরম এবং বর্ষার সময় স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া কীটপতঙ্গের খুব প্রিয়। জেব্রার গায়েও বসে একাধিক বহিঃপরজীবী পোকামাকড়। অস্থির করে তোলে তাকে। অথচ ছোট লেজ দিয়ে পোকামাকড় তাড়ানোর তেমন সুবিধে হয় না। আবার হাতি-গণ্ডারের মতো কাদায় গড়াগড়ি দেওয়ার অভ্যেসও জেব্রার নেই। অগত্যা ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে গা চুলকে নেয় এরা। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে একে অন্যদের গা দাঁতের সাহায্যেও চুলকে দেয়।

জেব্রার প্রধান শত্রু মানুষ। আজ পর্যন্ত কত জেব্রা শিকারিদের অস্ত্রে মারা গেছে তার হিসেব করতে যন্ত্রগণকের সাহায্য দরকার। আর আছে দুই হিংস্র শ্বাপদ—সিংহ আর হায়েনা। সূর্য পশ্চিমদিকে সরতে আরম্ভ করলেই বেরিয়ে পড়ে শ্বাপদের দল। জেব্রার পিছু ধাওয়া করে সিংহ—কখনো একা, কখনো দল বেঁধে। সন্ধ্যায় বা রাত্রে জেব্রার পাল দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ করে। মাঝে-মাঝে আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তারা। সিংহ কিংবা হায়েনার গন্ধ পেলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে তাদের শক্তিশালী চারটে পা। রাত্রির অন্ধকারে মুখর হয়ে ওঠে তাদের খুরের শব্দ। প্রতি রাতে এভাবেই চলে তাদের বাঁচার লড়াই। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া। ঘণ্টায় কমপক্ষে ৬০ কিলোমিটার বেগে না ছুটতে পারলে ঘাড়ের ওপর নেমে আসে শত্রুর করাল থাবা এবং তীক্ষ্ণ দুই শ্ব-দন্ত। জেব্রার মাংস হায়েনারও বড় প্রিয়। চতুর হায়েনার দলবদ্ধ আক্রমণে কত শিশু-জেব্রার যে জীবন যায়, তার হিসেব নেই। জন্মের পর শত্রুর আক্রমণ এড়িয়ে মাত্র অর্ধেক বাচ্চা বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। খাদ্যের অভাবে আর শত্রুর মুখে জীবন যায় বাকি অর্ধেকের। গ্রেভির জেব্রা আবার খাদ্য-জলের সন্ধানে দেশ-বিদেশে পাড়ি দেওয়ার সময়ে বাচ্চাদের সঙ্গে নেয় না। পথ হারিয়ে

খেতে না-পেয়ে মারা যায় তাদের বাচ্চা। অন্য জাতে অবশ্য স্বজনপ্রীতির ঘাটতি নেই। যদিবা দলের একজন হারিয়ে যায়, অন্যরা তার জন্য অপেক্ষা করে দিনের পর দিন।

বন্য জেব্রারা কতদিন বেঁচে থাকে জানা যায়নি, কিন্তু চিড়িয়াখানার জেব্রা বাঁচে মোটামুটি ৩০ বছর। চারপাশে এত শত্রু থাকলেও জেব্রার কিছু বন্ধুও আছে। এদের মধ্যে একনম্বরে আছে ন্যু। জেব্রার ঘ্রাণ এবং শ্রবণশক্তি খুব উন্নত। দৃষ্টিশক্তি তেমন ভালো নয়। অথচ ন্যুয়ের চোখের জোর খুব। কিন্তু নাক, কান তত তীক্ষ্ণ নয়। সেজন্য রাতের অন্ধকারে জেব্রা আর ন্যুয়ের দল যতটা সম্ভব একসঙ্গে থাকতে চেষ্টা করে। সিংহের গন্ধ পেলেই জেব্রা ন্যু-কে সতর্ক করে, আবার ন্যুর সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লেই জেব্রাকে সেটা বুঝিয়ে দেয় পা ঠুকে শব্দ করে। জেব্রার অন্য এক বন্ধু 'অক্সপেকার' নামের ছোট্ট পাখির দল। এরা জেব্রার পিঠে জাঁকিয়ে বসে দিব্বি দেশ-বিদেশ টহল দেয়। গায়ের লোম থেকে খুঁটে খায় পরজীবী পোকামাকড়। কোনো শত্রু চোখে পড়লে জেব্রাকে সতর্কও করে দেয়। উড়ে গিয়ে জানিয়ে দেয় বিপদ আসছে কোন পথে।

আফ্রিকার ডোরাকাটাদের ডোরা নিয়ে বিতর্কের এখনো শেষ হয়নি। কেন যে এদের গায়ে এমন অদ্ভুত চোখধাঁধানো ডোরার বাহার, তার উত্তরও মেলেনি।

দিনের পর দিন জেব্রার সংখ্যা যে-হারে কমছে, তাতে ন্যু আর অক্সপেকারের বন্ধুত্ব আর কতদিন এদের বাঁচাতে পারবে, তা বলা মুশকিল। তবে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষের বন্ধুত্ব নিশ্চিতভাবে তা পারে।

আবদুল হক খন্দকার

ডিম্ব নৃত্য

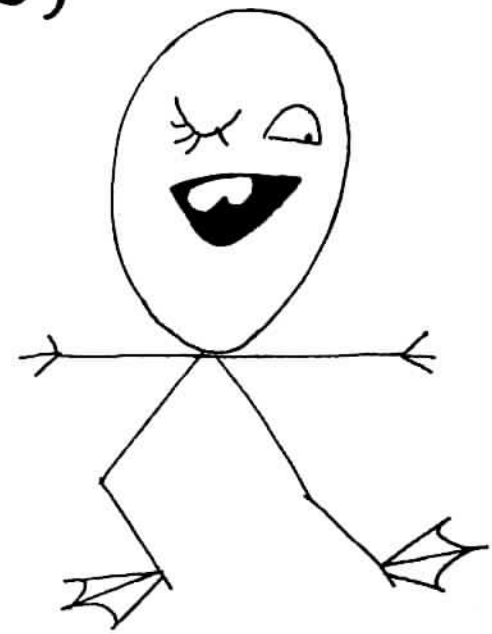

ডিম্ব নৃত্য! ঘোড়া কখনো ডিম পাড়ে না অথচ ঘোড়ার ডিম কথাটা যেমন বহুলপ্রচলিত, তেমনি সত্যিকারের কোনো ডিম আপনা থেকে কখনো নাচে না—অথচ আশ্চর্য, আস্ত একটি হাঁসের ডিমকে টিটুল একদিন নাচিয়ে ছেড়েছিল আমাদের বিজ্ঞানের বৈঠকে। কী করে? বলছি শোনো।

সাধারণত ন্যাপথলিনের বল ব্যবহার করে এই ধরনের যে-একটি খেলা দেখানো হয়ে থাকে, তার সাথে এই খেলাটির অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। কাজেই সেই খেলাটির কথাই আগে একটু বলে নিই। কেননা তার সূত্র ধরেই এই খেলাটির কথা বলা বা বোঝানো যেমন সুবিধে হবে, তেমনি যারা ন্যাপথলিন বলের নাচের খেলাটি দেখোনি—তারা এই খেলাদুটিকে একই সঙ্গে রপ্ত করে নিতে পারবে।

রঙিন নয়, এমন একটি কাচের গেলাশে বা লম্বা কোনো কাচের পাত্রে প্রথমে পানি নিয়ে সেই পানিতে কয়েক ফোঁটা অ্যাসিড (সালফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড—নিদেনপক্ষে সির্কা) মিশিয়ে কয়েকটি ন্যাপথলিন বল তাতে ছেড়ে দিলে—বলগুলো পাত্রের তলায় পড়ে থাকবে, কোনো নড়াচড়া বা নাচের লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যাবে না। কিন্তু সেই অ্যাসিড-পানিতে যদি কিছু কাপড়-কাচা বা খাওয়ার সোডার জলীয় দ্রবণ মেশানো যায়—তবে দেখবে এক অদ্ভুত কাণ্ড! কিছুক্ষণের মধ্যে বলগুলো নড়াচড়া শুরু করবে। তারপর শুরু হবে পাত্রের মধ্যে বারবার তাদের ওঠা এবং পড়া—যেন বেপরোয়া কোনো নৃত্যে মত্ত হয়ে তারা কেবলই উঠছে এবং ধপাস করে পড়ছে। তাই এক-একবার, এক বা একাধিক বলের এমনি ওঠা এবং পড়া দেখতে বেশ মজার। কিন্তু কারণটা কী?

কারণ হল, কাপড়-কাচা সোডা (রাসায়নিক নাম সোডিয়াম কার্বনেট) বা খাওয়ার সোডা

(সোডিয়াম বাই কার্বনেট) কোনো অ্যাসিডের সাথে মেশানো হলে—সঠিকভাবে বলতে গেলে তাদের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটালে—তৈরি হবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। এই গ্যাস পানির মধ্যে বুদবুদের আকারে উঠতে থাকবে ওপরের দিকে। কাজেই গেলাশে বা কাচের পাত্রে যে অ্যাসিড-পানি রয়েছে তার মধ্যে সোডার দ্রবণ ঢাললে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি হবে এবং গ্যাস বুদবুদের সৃষ্টি করে ওপরের দিকে উঠতে থাকবে। এমনিভাবে ওঠার সময় কিছু-কিছু গ্যাসের বুদবুদ ন্যাপথলিন বলগুলোতে আটকা পড়ে বলগুলো তেমন ভারী নয় বলে—বলের গায়ে আটকানো সব বুদবুদ সকলে মিলে বলগুলোকে ঠেলে ওপরে তুলে পানির ওপর ভাসিয়ে দেবে। কিন্তু বলগুলো যখন ভেসে উঠবে তখন তাদের গায়ে আটকানো বেশকিছু বুদবুদ বাতাসে মিলিয়ে যাবে—ফলে বাকি বুদবুদগুলো বলগুলোকে আর ঠেলে ভাসিয়ে রাখতে পারবে না ; নিজের ভারে সেগুলো তখন আবার নেমে আসবে পাত্রের তলায়। কিন্তু নেমে এসেও নিস্তার নেই—নতুন করে তাদের গায়ে জমতে থাকবে আবার ঐ গ্যাসের বুদবুদ এবং আগের মতোই বলগুলোকে তারা ঠেলে তুলবে ওপরে, আর এমনিভাবে পাত্রের মধ্যে চলতে থাকবে বলগুলোর একবার ওঠা এবং পরক্ষণে পড়া!

কিন্তু কতক্ষণ? যতক্ষণ পর্যন্ত পানির মধ্যে অ্যাসিড আর কার্বনেটের বিক্রিয়া—অর্থাৎ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি শেষ হবে না।

যাহোক, ন্যাপথলিনের বল ব্যবহার করে সচরাচর এই খেলাটি দেখানো হয় বলে খেলাটিকে কিছুটা বৈচিত্র্যময় ও তাকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য টিটুল ন্যাপথলিন বলের বদলে হাঁসের ডিম ব্যবহার করেছিল। ন্যাপথলিন বলের চেয়ে হাঁসের ডিম অনেক বড় ও ভারী—তাই মোটা মানুষের নাচের মতো হাঁসের ডিমের নাচটা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

আগেই বলেছি, ন্যাপথলিন বলের নাচের সঙ্গে টিটুলের এই 'ডিম্ব নৃত্য'-নামীয় খেলাটির বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। বস্তুত খেলাদুটির মধ্যে রয়েছে একই মূল সূত্র বা তথ্য—যেটকু অসুবিধের, তা হল ন্যাপথলিন বলের চেয়ে হাঁসের ডিম অনেক ভারী বলে। আর সেজন্য, বেশ পরিমাণ বুদবুদ ডিমের গায়ে জমলেও, ডিমটিকে ওপরের দিকে ঠেলে তোলা তাদের সাধ্যে কুলোয় না।

এই সমস্যার সমাধান অবশ্য টিটুল সহজেই করেছিল এবং সত্যিকথা বলতে কি—এখানেই ছিল তার যা-কিছু কেরামতি বা বাহাদুরি।

ডিমের গায়ে ছোট্ট একটু ফুটো করে, তার ভেতরের কিছুটা তরল অংশ ফেলে দিয়ে—সেই ফুটোটিকে সে গলানো মোম দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। অবশ্য ডিমটিকে এভাবে কাজের উপযোগী করে নেয়াটাই যা-কিছু একটু কঠিন। কেননা, ডিমের ভেতর থেকে এমন পরিমাণ তরল অংশ বের করে নিতে হবে—যাতে করে সেটি পানিতে না ভেসে, গেলাশের তলায় পড়ে থাকে, আবার যেন তেমন ভারীও না হয়—যাতে সেই ডিমের গায়ে কিছু-পরিমাণ বুদবুদ জমলেই সেটিকে ঠেলে তুলতে সক্ষম হয়। কাজেই একবারের চেষ্টায় এমনি উপযুক্ত না হলে একাধিকবার ডিমের ভেতরের অংশ অল্প-অল্প করে ফেলে দিয়ে তা ঠিক করে নিতে হবে।

যাহোক, টিটুলের এই নতুন খেলায়—ন্যাপথলিনের বদলে ডিম ব্যবহার করায়—এদিক থেকে কিছুটা অসুবিধে বা হাঙ্গামা থাকলেও অন্যদিকে আবার সুবিধাও রয়েছে। ন্যাপথলিন বলকে নাচাতে হলে গেলাশ বা লম্বা কোনো কাচের পাত্রের পানিতে যেমন অ্যাসিড থাকতে হবে তার মধ্যে সেরকম সোডার পানি ঢালার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু অ্যাসিড-মেশানো পাত্রের পানিতে ডিমটিকে ছেড়ে দিলেই হল! কেননা, ডিমের খোসার মধ্যে একধরনের কার্বনেট রয়েছে যার নাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট। সেটিই তখন অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হবে দেবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কারণ আগেই বলেছি, যে-কোনো কার্বনেটের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হয় ঐ কার্বন-

ডাই-অক্সাইড—তা বুদবুদের আকারে জমতে থাকবে ডিমের গায়ে এবং একসময়ে সেটিকে ঠেলে তুলবে ওপরে।

তারপর ন্যাপথলিনের বলের ব্যাপারে যা ঘটেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে এখানেও। ওপর থেকে ঝুপ করে গেলাশের তলায় পড়বে ডিমটি, কিছুক্ষণ পর তা আবার উঠবে ওপরে আর এমনিভাবে ডিমটির ওঠানামা অর্থাৎ তার নাচ চলতে থাকবে যতক্ষণ-না তার খোসাটি অ্যাসিডে গলে গিয়ে তার ভেতরের পাতলা পরদাটি বেরিয়ে পড়ছে। অ্যাসিডের পরিমাণ কম হলে সম্পূর্ণ খোসাটি অবশ্য গলবে না—এবং কিছুক্ষণ পর ডিমের নাচনও বন্ধ হবে। এ-অবস্থায় পানিতে আবার কয়েক ফোঁটা অ্যাসিড মেশালে আগের মতো শুরু হবে 'ডিম্ব নৃত্য'!

কাজেই দেখেছ, টিটুল নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে একটি বহুলপ্রচলিত খেলার মধ্যে সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে কেমন আকর্ষণীয় উপভোগ্য করে তুলেছিল এবং একটি জিনিসকে একেবারে ব্যবহার না-করেও কাজ হাসিল করেছিল।

তোমরা হয়তো ভাবতে পারো—এতে টিটুলের কীইবা এমন কৃতিত্ব! সে তো তেমন কোনো নতুন খেলা দেখায়নি! ন্যাপথলিন বলের বদলে ডিম ব্যবহার করে খেলাটিকে একটু আকর্ষণীয় করা বইতো বেশি কিছু নয়!

কিন্তু তোমরা যা-ই ভাবো বা বলো-না কেন—আমি বলব এটাও কম কিছু নয়। নতুন কোনো আবিষ্কারই যে কেবল মূল্যবান তা নয়, সময়ে তার উন্নতিসাধন বা তার কোনো নতুন প্রয়োগও কম মূল্যবান নয়। মার্কনি বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু সে-যন্ত্র দিয়ে কত দূরে খবর পাঠানো যেত? যদি অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তাঁর সেই আবিষ্কৃত বেতারের প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের উন্নতিসাধন না করতেন—তবে ঘরে-ঘরে তোমরা কি আর কোনো বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতে পেতে, না চন্দ্রচারীদের সঙ্গে কথার আদানপ্রদান করা সম্ভব হত কখনো? কিংবা চাঁদের বুকে তাঁদের চলাফেরা কি দেখতে পেতে তোমরা টেলিভিশনের পর্দায়? অথবা রাইট ব্রাদার্সের 'কিটি হক'-এ চড়ে কখনো কি কল্পনা করতে পারো—ক্ষণিকে দেশ-দেশান্তর পাড়ি দিতে চলেছ তোমরা আকাশপথে?

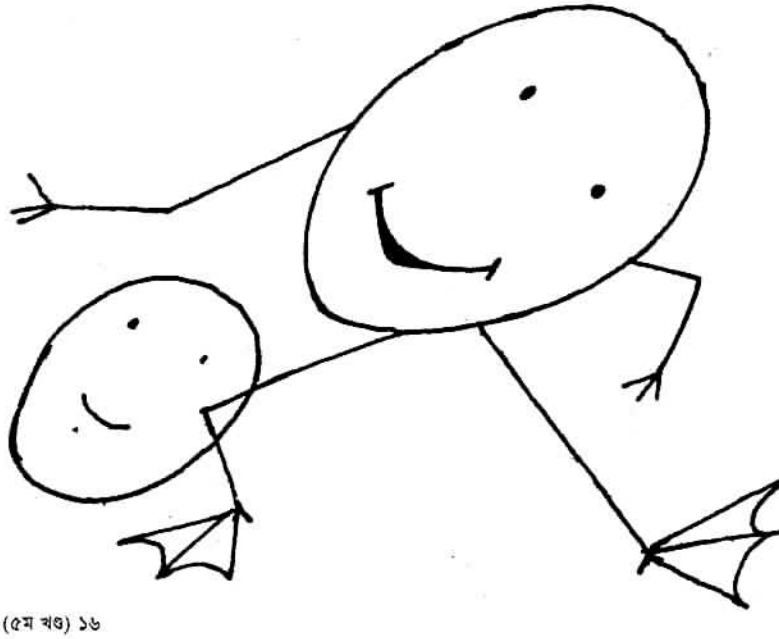

কৃষণ চন্দর

জামগাছ

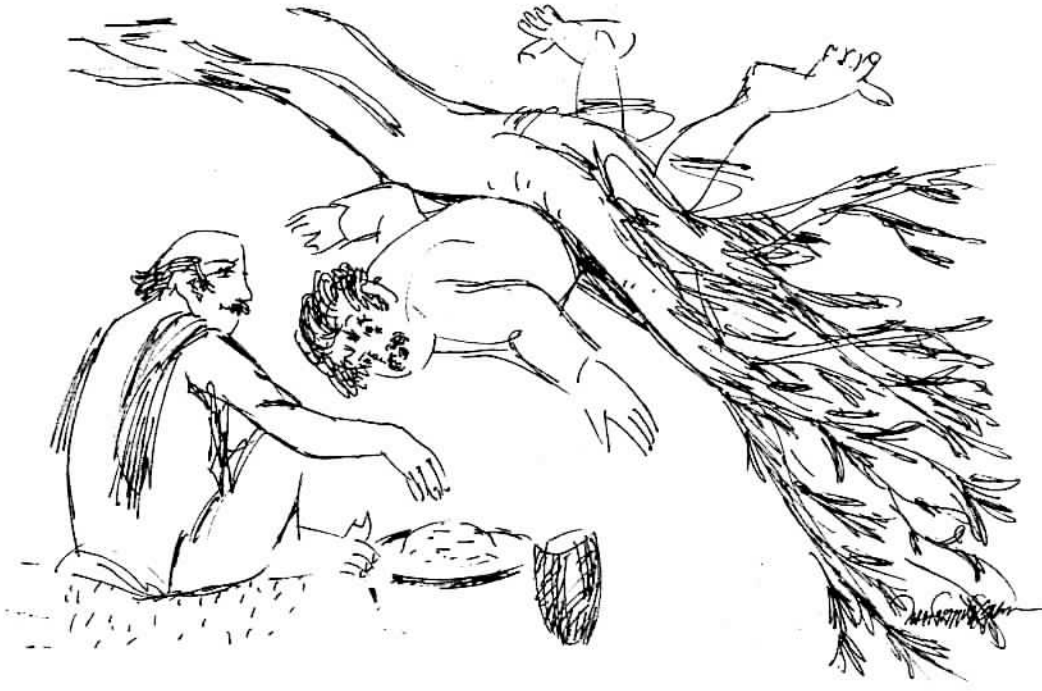

রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেছে। সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর লনের জামগাছটা উপড়ে পড়েছে সেই ঝড়ে। ভোরে মালী দেখতে পেল গাছটার নিচে একজন মানুষ চাপা পড়ে আছে।

মালী ছুটতে-ছুটতে চাপরাশির কাছে গেল--চাপরাশি ছুটতে-ছুটতে গেল ক্লার্কের কাছে--ক্লার্ক ছুটতে-ছুটতে গেল সুপারিনটেনডেন্টের কাছে।

সুপারিনটেনডেন্ট ছুটতে-ছুটতে বাইরে লনে এলেন। দেখলেন ঝড়ে উপড়ে-পড়া গাছের নিচে যে-মানুষটি চাপা পড়ে আছে তার চারদিকে বেশ ভিড় জমেছে।

একজন ক্লার্ক আক্ষেপ করে বলল, "আহা, এই জামগাছে কতই-না ফল ধরত!" আর-একজন ক্লার্ক তাকে মনে করিয়ে দিল, "আর এর জাম কী রসেই-না ভরপুর ছিল!"

তৃতীয় ক্লার্কটি বলল, "ফলের মরসুমে আমি ঝোলা ভরতি করে এই ফল নিয়ে যেতাম। আর আমার বাচ্চারা কত আনন্দেই-না এই জাম খেত!"

মালী গাছের নিচে চাপা-পড়া মানুষটির দিকে ইশারা করে বলল, "আর এই মানুষ?"

"হ্যাঁ, এই মানুষ...।" সুপারিনটেনডেন্ট খুব চিন্তায় পড়লেন। একজন চাপরাশি বলল, "জানি না এ বেঁচে আছে, না মরে গেছে।"

অন্য একজন চাররাশি বলল, "বোধহয় মারা গেছে, এতবড় গাছ কোমরের ওপর পড়লে কি মানুষ বাঁচতে পারে?"

গাছের নিচে চাপা-পড়া মানুষটি বেশ রুক্ষ স্বরেই বলল, "না, আমি বেঁচে আছি।"

একজন বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "আরে, বেঁচে আছে!"

মালী প্রত্যেকের উদ্দেশে বলল, "গাছটিকে সরিয়ে মানুষটিকে এর নিচ থেকে তাড়াতাড়ি বের করতে হবে।"

একজন ফাঁকিবাজ হৃষ্টপুষ্ট চাপরাশি ভারিক্কিচালে বলল, "মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। গাছের গুঁড়িটি বেশ ভারীই হবে।"

মালী জিজ্ঞেস করল, "সোজা নয় কেন? সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব যদি হুকুম দেন, তবে আমরা পনেরো-বিশজন মালী-চাপরাশি আর ক্লার্ক মিলে মিলে গাছের নিচ থেকে মানুষটিকে অনায়াসে বের করে আনতে পারি।"

বেশকিছু ক্লার্ক মালীকে সমর্থন করে একসঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মালী ঠিক বলেছে। আমরা তৈরি, হাত লাগাও।"

অনেকে গাছটিকে সরানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল।

সুপারিনটেনডেন্ট হঠাৎ বাধা দিয়ে বললেন, "দাঁড়াও, আমি আন্ডার-সেক্রেটারির কাছে একবার জিজ্ঞেস করে আসি।"

সুপারিনটেনডেন্ট আন্ডার-সেক্রেটারির কাছে গেলেন। আন্ডার-সেক্রেটারি গেলেন ডেপুটি সেক্রেটারির কাছে। ডেপুটি সেক্রেটারি গেলেন জয়েন্ট সেক্রেটারির কাছে। জয়েন্ট সেক্রেটারি চিফ সেক্রেটারির কাছে গেলেন। চিফ সেক্রেটারি মিনিস্টারের কাছে। মিনিস্টার চিফ সেক্রেটারিকে কিছু বললেন। একইভাবে জয়েন্ট সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারিকে এবং ডেপুটি সেক্রেটারি আন্ডার-সেক্রেটারিকে কিছু বললেন।

ফাইল চলতে লাগল--এর মধ্যে পার হল অর্ধেক দিন।

দুপুরের লাঞ্চের পর সেই চাপা-পড়া মানুষের চারদিকে আরো ভিড় বেড়ে গেল। নানা মানুষ নানা ধরনের কথা বলতে লাগল। কয়েকজন বিজ্ঞ ক্লার্ক সমস্যার সমাধান বের করে ফেলল নিজেরাই। বিনা হুকুমেই তারা যখন গাছ সরানোর পরিকল্পনা করছে ঠিক তখনই সুপারিনটেনডেন্ট ফাইল নিয়ে ছুটতে-ছুটতে হাজির হলেন। বললেন : আমরা এই গাছ আমাদের খেয়াল-খুশিমতো এখান থেকে সরাতে পারব না। কারণ আমরা বাণিজ্য দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত, আর এই গাছ কৃষি-দপ্তরের এক্তিয়ারে। আমি এই ফাইল আর্জেন্ট মার্ক করে এখনই কৃষি-দপ্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখান থেকে উত্তর আসার পর আমরা গাছ সরাব।

দ্বিতীয় দিন কৃষিবিভাগ থেকে উত্তর এল : এই গাছ বাণিজ্যদপ্তরের লনে পড়েছে, সুতরাং এই গাছ সরানোর দায়িত্ব বাণিজ্য দপ্তরের।

উত্তর পড়ে বাণিজ্য দপ্তর যারপরনাই চটে গেল। তারাও সঙ্গে-সঙ্গে দিল কড়া জবাব : এই গাছ সরানো বা না-সরানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব কৃষি-দপ্তরের। বাণিজ্য দপ্তরের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

পরের দিনও ফাইল চলতে আরম্ভ করল। সন্ধ্যার সময় জবাব এল : আমরা এই সমস্যা হার্টিকালচার ডিপার্টমেন্টে পাঠালাম। কারণ এ এক ফলদার গাছের ব্যাপার। এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট শাকসবজি এবং ক্ষেতখামার-সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে।

জামগাছ ফল দেয়। সুতরাং এই ধরনের ফলদার গাছের ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে হার্টিকালচার ডিপার্টমেন্টেরই অন্তর্গত।

রাত্রে মালী চাপা-পড়া মানুষটিকে ডাল-ভাত খাওয়াল। তার চারদিকে পুলিশের কড়া পাহারা বসেছে, কোনো মানুষ যেন নিজের হাতে কানুন তুলে নিয়ে গাছ সরানোর চেষ্টা না করে। কিন্তু চাপা-পড়া মানুষটির প্রতি করুণা হয় একজন পুলিশের। সে মালীকে খাওয়ানোর অনুমতি দেয়।

মালি চাপা-পড়া মানুষটিকে বলল, "তোমার ফাইল চলছে, মনে হচ্ছে কালকের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যাবে।"

চাপা-পড়া মানুষটি মালীর কথার কোনো জবাব দেয় না।

মালী গাছটির দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে বলল, "ভাগ্যিস গাছটা তোমার কোমরের একদিকে পড়েছে, কোমরের মাঝখানে পড়লে তোমার শিরদাঁড়া ভেঙে যেত।"

চাপা-পড়া মানুষটি কিন্তু মালীর কথার কোনো জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে না।

মালী আবার বলল, "তোমার যদি কোনো ওয়ারিশ থাকে তবে আমাকে তার ঠিকানা বলো, আমি তাকে খবর দেওয়ার চেষ্টা করব।"

চাপা-পড়া মানুষটি অনেক কষ্টে মালীকে বলল, "আমি নিজেই বেওয়ারিশ।"

মালী দুঃখ প্রকাশ করে চলে গেল।

তৃতীয় দিন হার্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট খুব কড়া এবং ব্যঙ্গপূর্ণ জবাব দিল।

হার্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি সাহিত্যদরদি বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক ভাষায় লিখলেন : খুব আশ্চর্যের কথা যখন সমগ্র দেশে আমরা বৃক্ষ রোপণ করছি, তখনই আমাদের দেশে এমন কী সরকারি আইন আছে যার বলে বৃক্ষ কাটা যায়! বিশেষ করে এমন এক বৃক্ষ--যা

ফল দেয়। আর এই বৃক্ষ হচ্ছে একটি জামবৃক্ষ, যার ফল সবাই আনন্দের সঙ্গে আস্বাদন করে। আমাদের বিভাগ কোনোমতেই এই ধরনের এক ফলদার বৃক্ষকে কাটার অনুমতি দিতে পারে না।

একজন রসিক মানুষ আপসোস করে বলল, "এখন তবে কী করা যায়? যদি গাছ কাটা না যায় তবে মানুষটিকেই কেটে বের করা হোক।" সে সবাইকে তার প্রস্তাব বুঝিয়ে দিল, "দেখুন, যদি মানুষটিকে এখান থেকে কাটা যায় তবে অর্ধেক মানুষ এদিকে বেরিয়ে আসবে, অর্ধেক ঐদিকে। আর গাছটিও যেমনকার তেমন থাকবে।"

চাপা-পড়া মানুষটি তার কথার প্রতিবাদ করে উঠল, "কিন্তু আমি যে মারা যাব!" একজন ক্লার্ক বলল, "হ্যাঁ, এ-কথাও ঠিক।"

মানুষটিকে কাটার জন্য যিনি নিপুণ যুক্তি হাজির করছিলেন, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "আপনি জানেন না, আজকাল প্লাস্টিক সার্জারি কত উন্নতি সাধন করেছে। একে যদি দুখণ্ড করে কেটে বের করা যায় তবে প্লাস্টিক সার্জারি করে আবার জোড়া লাগানো যাবে।"

এইবার ফাইল মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হল। মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট অ্যাকশন নিল সঙ্গে-সঙ্গে। যেদিন তাদের ডিপার্টমেন্টে ফাইল পৌছল তার পরদিনই তার ঐ ডিপার্টমেন্টের যোগ্যতম প্লাস্টিক সার্জনের কাছে পাঠিয়ে দিল। সার্জেন খুঁটিয়ে চাপা-পড়া মানুষটির স্বাস্থ্য, রক্তচাপ, নাড়ির গতি, হার্ট এবং মাংস পরীক্ষা করে এক রিপোর্ট লিখলেন : হ্যাঁ, প্লাস্টিক অপারেশন হতে পারে এবং অপারেশন সফলও হবে, তবে মানুষটি মারা যাবে।

সুতরাং এই ফয়সালাও আর গ্রহণ করা হল না।

রাত্রে মালী চাপা-পড়া মানুষটিকে খিচুড়ি খাওয়াতে খাওয়াতে বলল : তোমার ব্যাপারটি ওপরমহলে গেছে। শুনেছি কালকে সেক্রেটারিয়েটের সমস্ত সেক্রেটারিদের মিটিং হবে। ঐ মিটিঙে রাখা হবে তোমার কেস। মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাপা-পড়া মানুষটি বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে বলল :

"জানি আমাকে হয়তো অস্বীকার করবে না
কিন্তু তোমার কাছে যখন খবর আসবে
তখন আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাব।"

মালী আচমকা তার ঠোঁটে আঙুল রেখে আশ্চর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "তুমি...তুমি কবি?"

চাপা-পড়া মানুষটি ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

পরের দিন মালী চাপরাশিকে বলল, চাপরাশি বলল ক্লার্ককে, ক্লার্ক হেডক্লার্ককে, কিছুক্ষণের মধ্যে সারা সেক্রেটারিয়েট খবর রটে গেল চাপা-পড়া মানুষটি একজন কবি। আর দেখতে-দেখতে কবিকে দেখার জন্য লোক ভেঙে পড়ল। এই খবর শহরেও পৌছে গেল। আর সন্ধ্যার মধ্যে শহরের অলিগলিতে যত কবি আছেন তাঁরা এসে জমা হলেন।

সেক্রেটারিয়েটের লন কবি, কবি আর কবিতে ভরে উঠল। চাপা-পড়া মানুষটির চারদিকে কবি-সম্মেলনের এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল। সেক্রেটারিয়েটের কয়েকজন ক্লার্ক এবং আন্ডার-সেক্রেটারি—যাঁরা সাহিত্য এবং কবিতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরাও থেমে গেলেন এখানে। কয়েকজন কবি চাপা-পড়া মানুষটিকে তাঁদের কবিতা এবং দোঁহা শোনাতে শুরু করলেন। আর কয়েকজন ক্লার্ক তাঁকে তাঁর নিজস্ব কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে বললেন।

চাপা-পড়া মানুষটি যে একজন কবি, এই খবর যখন সেক্রেটারিয়েটের সাবকমিটিতে পৌছুল, তখন তাঁরা রায় দিলেন : চাপা-পড়া মানুষটি একজন কবি, সুতরাং তার ব্যাপার ফয়সালা করতে হার্টিকালচার বা এগ্রিকালচার দপ্তর পারে না। এ সম্পূর্ণভাবে কালচারাল বিভাগের ব্যাপার।

কালচারাল বিভাগকে অনুরোধ করা হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হতভাগ্য কবিকে চাপা-দেওয়া ফলদার গাছ থেকে মুক্ত করা হোক।

ফাইল কালচারাল ডিপার্টমেন্টের এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগ ঘুরতে-ঘুরতে সাহিত্য অ্যাকাডেমির সেক্রেটারির হাতে এল। বেচারা সেক্রেটারি ঠিক ঐ সময়েই গাড়িতে করে সেক্রেটারিয়েট এসে চাপা-পড়া মানুষটির ইন্টারভিউ নিতে শুরু করলেন।

—তুমি কবি?

সে জবাব দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—কোন নামে তুমি পরিচিত?

—ওস।

"ওস?" সেক্রেটারি বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন। "তুমি সেই ওস—যার পদ্যসংগ্রহ 'ওসের ফুল' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে?"

চাপা-পড়া মানুষটি রুক্ষ কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ!"

সেক্রেটারি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমাদের অ্যাকাডেমির মেম্বার?"

—না।

সেক্রেটারি বললেন, "আশ্চর্যের কথা! এত বড় কবি—'ওসের ফুলে'র লেখক আমাদের অ্যাকাডেমির সদস্য নয়! আহা কী ভুল হয়ে গেছে আমার, কতবড় কবি, অথচ কী অন্ধকারের নিচে নাম চাপা পড়ে আছে!"

—আজ্ঞে, নাম চাপা পড়ে নেই, আমি স্বয়ং এক গাছের নিচে চাপা পড়ে আছি। দয়া করে আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি মুক্ত করুন।

'এক্ষুনি করছি' বলে সেক্রেটারি তখনই নিজের দপ্তরে রিপোর্ট করলেন।

পরের দিন সেক্রেটারি ছুটতে-ছুটতে কবির কাছে এলেন। বললেন, "নমস্কার, মিষ্টি খাওয়াও। আমাদের সাহিত্য অ্যাকাডেমি তোমাকে কেন্দ্রীয় শাখার সদস্য করে নিয়েছে। এই নাও তোমার সদস্যপত্র।"

চাপা-পড়া মানুষটি বেশ কঠোরতার সঙ্গে তাঁকে বলল, "আমাকে তো আগে এই গাছের নিচ থেকে বের করুন।" খুব ধীরে-ধীরে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছিল। তার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন খুব কঠিন অসুখ আর দুঃখের মধ্যে পড়েছে।

সেক্রেটারি বললেন : এ-ব্যাপারে আমার করার কিছুই নেই। আমি যা করতে পারি তা করে দিয়েছি। তুমি যদি মারা যাও তবে তোমার স্ত্রীকে পেনশন দিতে পারি।

কবি থেমে-থেমে বলল : আমি বেঁচে আছি, আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন।

সরকারের সাহিত্য অ্যাকাডেমির সেক্রেটারি হাত কচলাতে-কচলাতে বললেন : মুশকিল কী জানো, আমার দপ্তর শুধুমাত্র কালচারের সঙ্গে যুক্ত। গাছ-কাটাকাটির ব্যাপার তো আর দোয়াতকলমে হয় না—কুড়ুল কাটারির সঙ্গেই এর গভীর সম্পর্ক। আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে আর্জেন্ট লিখে দিয়েছি।

সন্ধ্যার সময় মালী এসে চাপা-পড়া মানুষটিকে বলল : কাল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক এসে গাছ কেটে দেবে, আর তুমিও বেঁচে যাবে।

মালী খুব খুশি। চাপা-পড়া মানুষটির শরীরে আর কুলাচ্ছিল না। বাঁচার জন্যে সে যুঝে চলেছিল আপ্রাণ। কাল পর্যন্ত...কাল ভোর পর্যন্ত...যে-কোনোভাবেই হোক কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে।

পরের দিন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মানুষজন যখন কুড়ুল-কাটারি নিয়ে গাছ কাটতে হাজির হল, তখন বৈদেশিক দপ্তর থেকে খবর এল : গাছ কাটা বন্ধ রাখো। কারণ দশ বছর আগে পিটোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী সেক্রেটারিয়েটের লনে এই গাছ লাগিয়েছিলেন। এখন যদি এই গাছ কাটা হয় তবে পিটোনিয়া সরকার অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

—কবির মরে যাওয়া উচিত।

—নিশ্চয়ই।

আন্ডার-সেক্রেটারি সুপারিনটেনডেন্টকে বললেন, "আজ প্রধানমন্ত্রী সফর শেষ করে ফিরেছেন। বিকেল চারটায় বৈদেশিক দপ্তর এই গাছ-সম্পর্কিত ফাইল তাঁর কাছে পেশ করবেন। উনি যা বলবেন তা-ই হবে।"

বিকেল পাঁচটায় সেক্রেটারি স্বয়ং ফাইল নিয়ে হাজির হলেন। "এই যে শুনছ!" খুশিতে গদগদ তিনি ফাইল দোলাতে-দোলাতে বললেন, "এই গাছ কাটার হুকুম দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সমস্ত আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কালই এই গাছ কাটা হবে। আর তুমিও বেঁচে যাবে এই সমস্যা থেকে। আরে শুনছ কি! আজ তোমার ফাইল পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।"

কিন্তু কবির হাত তখন বরফের মতো ঠাণ্ডা। চোখের তারা স্থির। একসার পিঁপড়ে তার মুখের ভিতর ঢুকছিল।

তার জীবনের ফাইলও পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

পিকাসোর ছেলেবেলা

সন ১৮৯৫। স্পেনের বারসিলোনা শহর। এখানকার চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন অধ্যাপক জোসে রুইজ লাসকো। বারসিলোনায় এসে বন্দরের কাছেই বাসা ভাড়া করেছেন। কাছেই সমুদ্র। মহাবিদ্যালয়ও অদূরে। অধ্যাপকের বড়ছেলে পাবলোর বয়স মাত্র চোদ্দ। ছেলেটির আঁকা এমন নিখুঁত যে তা দেখে উঁচু ক্লাসে ভরতি হবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিলেন মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। একমাস ধরে পরীক্ষা চলবে। দেখে-দেখে আঁকতে হবে একটা বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোট্টা লোককে আর একটা প্লাস্টারের পা। পাবলো নির্ধারিত সময়ের আগেই সে-ছবি শেষ করলেন।

পাবলো নামটা স্পেনে বেশ চালু। এই শতাব্দীতে তিনজন বিশ্ববিখ্যাত পাবলো ছিলেন। একজন পাবলো কাসালস। পশ্চিম ধ্রুপদী সংগীতে চেলো বাজানোর জাদুকর। অন্যজন পাবলো নেরুদা। স্পেনীয় ভাষায় লিখতেন। চিলির মহাকবি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। কিন্তু তিনজন পাবলোর মধ্যে চিত্রশিল্পী পাবলোর খ্যাতি সবচাইতে বেশি। বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন বংশের একমাত্র পিদিমটির ইয়া বড় একটা নাম রেখেছিলেন : পাবলো, ডিয়াগো, জোসে, ফ্রানসিসকো ডি পাওলো, হুয়ান নেপোমুচেনো, মারিয়া লস রেমোডিয়াস, সিপ্রানো ডি লা সান্তিসিমা ত্রিনিদাদ। কিন্তু এত নামের মধ্যে তিনি পাবলো নামটাই বেছে নিয়েছিলেন।

২৪ অক্টোবর ১৮৮১-তে পাবলো স্পেনের মালাগা বন্দরে জন্মেছিলেন। মায়ের নাম মারিয়া পিকাসো লোপেজ। গোড়ায় ওঁর নাম ছিল পাবলো রুইজ। মাকে বড় ভালোবাসতেন পাবলো।

স্পেনের রীতি অনুসারে মায়ের নামও পদবি করা যায়। একটা সময় তিনি পাবলো রুইজ পিকাসো নামে সই করতেন ছবিতে। শেষে নামটা ছেঁটে ছোট্ট করলেন—পাবলো পিকাসো।

বিশ্বের শিল্পকলার বেশকিছু মহাশিল্পীর জন্মভূমি স্পেন। যেমন ভেলাসকুজ, এল গ্রেকো, গোইয়া। পাবলো পিকাসো এঁদের উত্তরসূরি। বিচিত্র সুন্দর দেশ। পিরানিজ পবর্তমালা। আঙুরবাগান। এসেছে প্রাচীনকালে রোমানরা। পরে মুসলমান-শিক্ষার পীঠস্থান হয়েছিল স্পেনের কারডোভা বিশ্ববিদ্যালয় মুরদের আমলে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মের ঐতিহ্য আর কুসংস্কার জনজীবনে ছাপ ফেলেছিল। শেষে শোষণে-শাসনে সবাই রীতিমতো বিপ্লবী হয়ে গেলেন। এর মধ্যেই জন্মেছিলেন পাবলো। স্পেনীয়দের মতো ষাঁড়ের লড়াই দেখতে খুব ভালোবাসতেন।

পাবলো পিকাসো শুধু এই শতাব্দীর নন, সর্বকালের মহাশিল্পী। মারা যান ৮ এপ্রিল, ১৯৭৩-এ ৯৩ বছর বয়সে। প্রতিদিন কত-যে ছবি এঁকেছেন তার হিসেব নেই। মূলত চিত্রকর হলেও, ভাস্কর্য, ছাপাই-ছবি, চিনেমাটির বাসনপত্তরের নকশা এবং নকশি-কাটায় তিনি তাঁর প্রতিভার ছাপ ফেলেছেন।

স্পেনীয় হলেও তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে ফ্রান্সে। আঠারো বছর বয়সে ফরাসি দেশে এসে অনাহারে, অর্ধাহারে বহুবছর পরিশ্রম করে তিনি খ্যাতির চূড়োয় উঠেছিলেন। শুধু শিল্পী হয়ে কোটি-কোটি টাকা রোজগার করেছেন। পৃথিবীর দুঃখী অভাজনদেরও ছবি এঁকেছেন। নিজেকে তাঁদের একজন বলে মনে করতেন। সব মানুষের জন্য মমত্ব তাঁর ছবিতে ছায়া ফেলেছে। অত্যাচার-অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন ছবিতেই। তাই তাঁর মৃত্যুতে সকলেই প্রিয়জন-হারানোর ব্যথা পেয়েছেন।

চারপাশের জগৎ তিনি নতুন করে দেখতে শিখিয়েছেন। ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়া যে হুবহু

কোনোকিছুর নকল করা নয়, তোমরা যারা ছবি আঁকো তারা জানো। বরং কল্পনা করে সবকিছুকে নতুন করে নাও—তা-ই না? কথাটা নতুন নয়। কিন্তু নিজের আঁকা ছবি, মূর্তির মধ্যে দিয়ে এ-কথা পাবলো আমাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। যদিও হুবহু ছবি আঁকায় পাবলোর সমকক্ষ শিল্পীও খুব কম। তাঁর বন্ধু ফরাসি কবি গিওম অ্যাপলনিয়ের বলেছিলেন : "আমার মনে হয় প্রকৃতির কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে, কিন্তু ফটোগ্রাফারের মতো তাকে নকল করার জন্য নয়। যখন মানুষের দরকার পড়ল পা-গাড়ির মতো একটা যন্ত্র তৈরি করার, তখন সে তৈরি করল চাকা। চাকা তো আর পায়ের মতো নয়!" কথাটা ছবি, মূর্তি দেখার সময় মনে রাখতে হবে।

পাবলোর বাবা জোসে রুইজ ছিলেন লম্বা। মাথায় লাল চুল। পুরুষালি চেহারা। কথা কম বলতেন বলে লোকে আড়ালে বলত 'গোমড়ামুখো ইংরেজ'। তিনি এগারোজন ভাইবোনের মধ্যে নবম। পেশাদার চিত্রকর। প্রতিভাবান ছিলেন না। রোজগারও বেশি করতেন না। পাবলোর মা ডনা মারিয়া ছিলেন ছোটখাটো আমুদে মানুষ। কালো চুল আর কালো চোখ ছিল তাঁর। রুইজের ভাইবোনদের কারও ছেলে ছিল না। পাবলো একমাত্র বংশধর। সুতরাং পাবলো জন্মালে ওঁদের সবার খুব আনন্দ হয়েছিল।

বুড়ো বয়সে ডনা মারিয়া তাঁর পাবলিটো সম্বন্ধে গল্প করতে গিয়ে বলতেন : "বাছা আমার, অন্য সব কথার আগে শেখে 'পিস' শব্দটা। 'লাপিস' বলতে পারত না ছোট্ট সোনা (লাপিস মানে পেনসিল)। একবার লাপিস পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হিজিবিজি কেটে কাটিয়ে দিত।" ছেলেবেলা থেকে পাবলো একটু অন্যরকম। গল্প আছে, টিনে বিস্কুট আছে জেনে সেটা পা দিয়ে ঠেলে-ঠেলে হাঁটতে শিখেছিলেন। ভেতরে পুরস্কার কী আছে জানা, কিন্তু আগে কাজটা শিখে নিতে হবে।

তখন পাবলোর বয়স তিন বছর। হঠাৎ মালাগায় ভূমিকম্প শুরু হল। শীতের বিকেল। জোসে রুইজের মনে হল ওঁদের বাড়িটা তেমন মজবুত নয়। ওঁর এক বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া নিরাপদ। পাবলোর মনে এই ঘটনা গভীর দাগ কেটেছিল। পঞ্চাশ বছর পরে এই ঘটনার কথা বলার সময় পাবলো বলেছেন : "আমার মা মাথায় একটা রুমাল বেঁধেছিলেন। ওঁকে এমন সাজে কখনো দেখিনি। আর বাবা একটা ক্লোক কাঁধে ফেলে তার মধ্যে আমাকে জড়িয়ে নিলেন। আমার মুণ্ডুটাই শুধু বেরিয়ে রইল।"

জোসের পক্ষে সংসার চালানো দায় হল। তিনি তখন মালাগার কলাভবনের অধ্যাপক হলেন। সেই সুবাদে শহরের জাদুঘরের বড়কর্তা। পাবলো বাবার সঙ্গে ছবি আঁকেন। পায়রা আঁকতেন জোসে। কিংবা প্লাস্টারের গ্রিকদেবীকে দেখে একটু অদলবদল করে যিশুর মা মেরিকে এঁকে ফেলতেন। টেবিলের উপর ফুলদানিতে ফুল, জগ বা গ্লাস বা ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে আঁকতেন। তার বাবাই তাকে এসব আঁকা শেখাতেন। বাবা পোষা পায়রা সামনে রেখে আঁকতেন। পাবলোর জন্য মরা পায়রার পা বোর্ডে টাঙিয়ে দিতেন। পাবলো নানা কোণে দাঁড়িয়ে পা-টাকে বারবার আঁকতেন। এইভাবে আঁকাটা মুখস্থ হয়ে যেত। শেষবয়সে বিশ্বশান্তির প্রতীক এঁকেছিলেন পায়রা। ছেলেবেলার ঘটনা মনে করেই হয়তো।

জোসের মাথায় দুর্ভাবনা। ছবি আঁকায় পাকা হলেও পাবলো লেখাপড়ার ধার দিয়ে যায় না। অঙ্ক দেখলে পালায়। স্কুলে ভরতি করার জন্যে জোর করে নিয়ে গেলেন। শিক্ষক জোসের বন্ধু। তিনি বললেন : "কী জানো বলো তো খোকা?" পাবলো বলল : "কিস্‌সু জানি-টানি না।"

পরপর সংখ্যাগুলো ঘর কেটে উপর থেকে নিচে লিখতে বললেন। একেবারে অসম্ভব। বন্ধুর ছেলে। স্কুলে নিতেই হবে। বোর্ডে সংখ্যাগুলো লিখে বললেন : "লেখো তো খোকা!" খোকা দেখে দেখে হুবহু এঁকে ফেলল। স্কুলে পড়াশুনোর চাপ বেশি ছিল না। অযথা বই মুখস্থ করানো হত না তাই রক্ষে!

জোসের সংসার ভালো চলে না। বাধ্য হয়ে জন্মস্থান মালাগা ছেড়ে চাকরি নিলেন স্পেনের অপরপ্রান্তে কোরুন্নার কলাভবনে। দক্ষিণ ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তর-স্পেনের অতলান্তিকের তীরে। এখানে শীত পড়ে বেশি। সূর্যের মুখ দেখা যায় না। পাবলোর পর দুই বোন—লোলা আর কনচিটা। জোসে তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে ছোট্ট কনচিটাকে ভালোবাসতেন বেশি। মেয়েটি অবিকল বাবার মতো দেখতে। সে ডিপথিরিয়ায় মারা গেল। ওই আঘাতে ভেঙে পড়লেন জোসে।

পাবলোর দশ বছর বয়স। ক্লাসে না গিয়ে বাবার স্টুডিওতে ছবি আঁকেন। দেখে নকল করা বাদ দিয়েও মন থেকে ছবি-আঁকা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করেন। তাতে ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন। শিরোনাম লেখেন : অঙ্ক পরীক্ষা।

শিক্ষক : যদি আমি তোমাকে পাঁচটা তরমুজ দি আর তুমি চারটে খেয়ে ফেল, কটা থাকে?

ছাত্র : একটা।

শিক্ষক : দেখো, বদহজম যেন না হয়।

বাবা তাঁকে পায়রা আঁকান বা টেবিলে জিনিস সাজিয়ে ছবি আঁকা শেখান।

একদিন মন এত খারাপ জোসের যে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। পাবলো দ্রুত বাবার ক্যানভাসে তেলরঙে পায়রা এঁকে রপ্ত করলেন। চোদ্দ বছরের পাবলো। কিন্তু হাতটা পাকা। জোসে বহুক্ষণ পরে ফিরে এসে ক্যানভাস দেখে অবাক! মন ভরে গেল জোসের। শিল্পী হিসেবে ব্যর্থ তিনি, কিন্তু তাঁর ছেলে বড় শিল্পী হবেই।

নিজের তুলি, বর্ণপাত্র, রং, ছুরি পাবলোর হাতে তুলে দিয়ে বললেন : "তুমি আমার চেয়ে ঢের ভালো ছবি আঁকো। এখন থেকে আমি আর ছবি আঁকব না।"

ফ্রান্সের রূপকথা

বিউটি ও অদ্ভুত জন্তুর গল্প

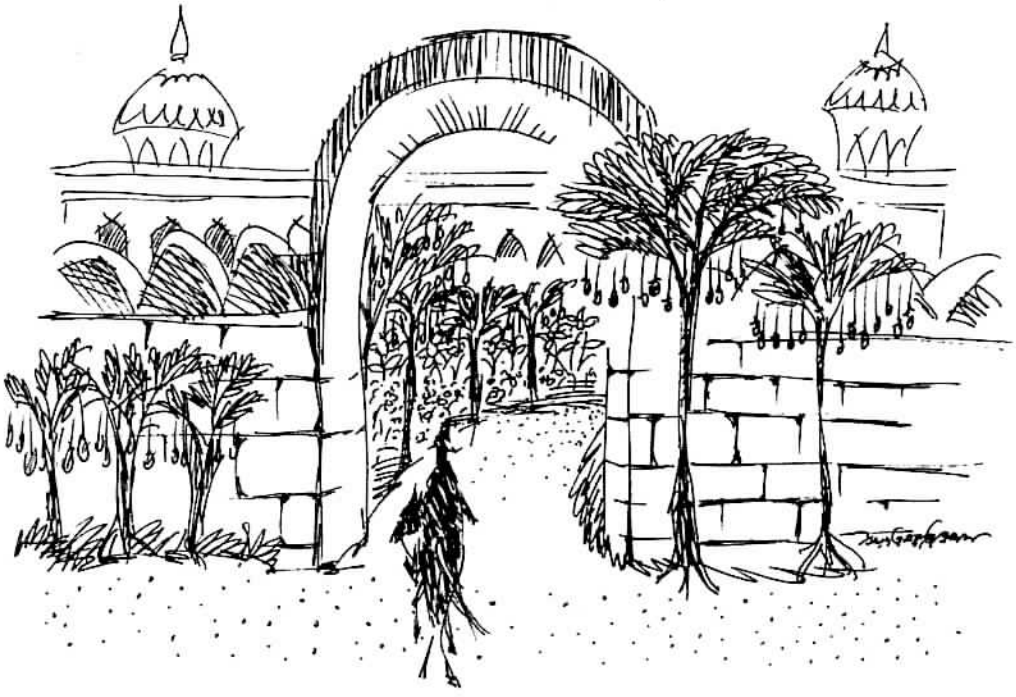

অনেক অনেক দিন আগে এক দূরদেশে ছিলেন এক বিত্তবান বণিক। বিশাল তাঁর ধনসম্পদ। বাড়ি তাঁর রাজপ্রাসাদের মতো।

সেই বণিকের ছিল ছয় ছেলে ছয় মেয়ে। সন্তানরা প্রত্যেকেই শৌখিন। তারা ভীষণ আমোদপ্রিয়। দুহাতে তারা টাকাপয়সা ওড়াত; কারণ তাদের বিত্তের কোনো অভাব নেই।

কিন্তু সুখের দিন মানুষের সবসময় একরকম যায় না। হঠাৎ করেই দুর্ভাগ্য নেমে এল সেই বিত্তবান সংসারে। একদিন আগুন লাগল তাদের বাড়িতে। আগুনের লেলিহান শিখায় মুহূর্তের মধ্যে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। দামি দামি আসবাবপত্র, সোনারুপার অলংকার, বইপত্র, ছবিসহ অমূল্য সব জিনিসপাতি পুড়ে গেল। নিমেষেই জৌলুস নিভে গেল তাদের।

ইতোমধ্যে খবর এল, সেই বণিকের মালবাহী কয়েকটা জাহাজ ডুবে গেছে গভীর সমুদ্রে। বাকি জাহাজগুলো জলদস্যুদের কবলে পড়ে এখন হাতছাড়া। যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত!

আরও খবর এল, তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মচারী ক্যাশবাক্স থেকে টাকাপয়সা নিয়ে ভেগে পড়েছে। সেই বণিক বিশাল ধনসম্পদ হারিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে নিঃসম্বল হয়ে পড়লেন।

শহর থেকে অনেক দূরে এক বাসায় গিয়ে উঠলেন তিনি। আজ তিনি সহায়সম্বলহীন। তাঁর পুত্রকন্যারা কয়েকদিনের মধ্যেই বন্ধুবান্ধবহীন হয়ে পড়ল। যখন টাকাপয়সা ছিল তখন সারাদিন যারা ঘুরঘুর করত আজ তাদের দেখা নেই। কদিনের মধ্যেই তারা সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ল, কেউ তাদের পাশে নেই। তাদের পুরনো বন্ধুবান্ধবরাও সরে দাঁড়াল। কারণ আভিজাত্য আর অহংকারে তারা গরিব মানুষকে মানুষ বলে মনে করত না।

এক বনের ধারে পর্ণকুটিরে এখন তারা বাস করে। তারা একসময় এতই গরিব হয়ে পড়ল যে তাদের বাসায় কাজ করার কোনো লোক পর্যন্ত থাকল না। পুত্রকন্যাদের এখন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়। পুত্ররা যায় জমিতে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের শস্য উৎপাদন করতে হয়। এখন তারা পরে মোটা কাপড়ের ছেঁড়া পোশাক, থাকে খুব সাধারণভাবে। কন্যারা ভুলে গেছে সেই বিলাসী ও আনন্দময় জীবনের কথা। তারা এখন সারাক্ষণই মলিন ও বিষণ্ণ থাকে। একমাত্র ছোটকন্যাটির কোনো পরিবর্তন নেই। সে আগের মতোই সাহসী ও আনন্দময়। ঘরের কাজকর্ম করতে তার কোনো ক্লান্তি নেই।

মেয়েটি বাবার কথা ভেবে খুব দুঃখিত হয়ে উঠত। বাবাকে আনন্দে রাখার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত। সর্বান্তঃকরণে সে কাজ করত যেন ভাইদের কোনো কষ্ট না হয়। অবসরে বোনদের নিয়ে নাচগানের আসর জমিয়ে তুলতে চাইত। কিন্তু ভাইবোনেরা এতে রাজি হবে কেন? তারা এইভাবে বেঁচে থাকতে চাইত না। তারা বলত, এরকম অবর্ণনীয় দুঃখময় জীবনটা একমাত্র ছোটবোনটাই মানিয়ে নিতে পারে। আমাদের দিয়ে সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটবোনটাই ছিল সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে সুন্দরী। সে ছিল সবসময়ই হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। এ-কারণে তাকে 'বিউটি' বলে ডাকা হত।

এইভাবে কেটে গেল দুই বছর।

হঠাৎ করে একদিন তাদের বাবা খবর পেলেন, তাঁর হারিয়ে-যাওয়া একটি জাহাজের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। জাহাজটি নোঙর করেছে দূর-দ্বীপের এক বন্দরে। জাহাজে আছে অনেক দামি দামি জিনিসপত্র।

সব ভাইবোনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তাদের দুঃখের দিনের বুঝি এখন সমাপ্তি হবে। তারা যথাশীঘ্র শহরে ফিরতে চায়। বাবা তাদের বুঝিয়েসুজিয়ে নিরস্ত করেন, আরেকটু অপেক্ষা করা দরকার। এখন চাষবাসের সময়। নতুন শস্য উঠবে। সবেমাত্র জাহাজের সন্ধান-সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। আরও তদন্তের বাকি আছে। এই অবস্থায় শহরে চলে যাওয়া ঠিক নয়।

একমাত্র ছোটমেয়েটির কোনো ভাবান্তর নেই। তার মনে সন্দেহ আছে, হয়তো আগের মতো ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী তারা হতে পারবে না।

প্রত্যেক ভাইবোন বিশাল আবদারের ফর্দ ধরিয়ে দিল বাবার হাতে। তারা প্রত্যেকেই দামি অলংকার ও পোশাক প্রত্যাশা করল বাবার কাছে। একমাত্র বিউটি কোনোকিছুর জন্য বাবাকে অনুরোধ জানাল না। সে নীরবে বাবার পাশে বিদায়ের বেলা দাঁড়িয়ে রইল। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, বিউটি, আমি তোমার জন্য কী উপহার নিয়ে আসতে পারি?

—কিছুই না। আমি চাই তুমি সুস্থ শরীরে আবার বাড়ি ফিরে এসো।

বিউটির উত্তরে বোনেরা বিরক্ত হল। তারা বুঝতে পারল বিউটি সূক্ষ্মভাবে তাদের দামি দামি জিনিস চাওয়ার বিষয়টিকে উপহাস করছে। বাবা কিন্তু মেয়ের উত্তরে ভীষণ খুশি। তার পরও বাবা মনে-মনে ভাবলেন, ছোটকন্যা হয়তো আলাদা কোনো জিনিস প্রত্যাশা করছে। বাবা বললেন,

—তোমার জন্য কি সম্পূর্ণ আলাদা কিছু আনব?

—কিছুই দরকার নেই আমার। যদি কিছু আনতেই চাও তবে গোলাপফুল নিয়ে এসো আমার জন্যে। অনেকদিন ধরে আমি গোলাপফুল দেখি না। গোলাপফুল আমি খুব ভালোবাসি।

সেই বণিক এরপর জাহাজের সন্ধানে রওনা দিলেন। দীর্ঘদিন যাত্রাপথে কেটে গেল। তারপর বহু সুলুক-সন্ধান করে পাওয়া গেল এক কর্মচারীকে। সে জানাল, তারা জানে যে, বণিক মারা গিয়েছে। সেই ধনসম্পদ তখন ভাগ করে দেয়া হয়েছে সবার মধ্যে। ছয় মাসের পথশ্রম ও অর্থব্যয়ে তখন ক্লান্তপ্রাণ বণিক। তিনি এখন কপর্দকশূন্য, হতদরিদ্র। তাঁর কপালে নেমে এল আরও দুর্গতি। ফিরতি পথে প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিপর্যস্ত বেচারা।

ঘোড়ার পিঠে চেপে ফিরছেন তিনি বাড়িতে। আর কয়েক লিগ (এক লিগ=প্রায় তিন মাইল) যেতে পারলেই বনের কাছাকাছি পৌঁছানো যেত। তার পরই খুঁজে পাওয়া যেত নিজের বাড়ি। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় তখন বেচারা বিপর্যস্ত, ক্লান্ত, হয়রান। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন তিনি। কিন্তু তখন রাত নেমে এসেছে। শুরু হয়েছে তুষার-ঝড়। তীব্র তুষারপাত হচ্ছে। এই মুহূর্তে ঘোড়া আর এক কদমও এগিয়ে যেতে পারবে না।

একমাত্র উপায়, কোনো বিশাল বৃক্ষের তলায় আশ্রয় নেওয়া। বণিক লোকটি তখন খুঁজে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন। বিদীর্ণ কষ্টকর রাত সহজে ফুরায় না। এইরকম দীর্ঘরজনী সম্পর্কে তাঁর কোনো পূর্বধারণা ছিল না। নেকড়ের ক্রমাগত গর্জন তাঁকে জাগ্রত রাখল। তুষারপাতে সমস্ত পথ তখন অবরুদ্ধ।

প্রভাতের মৃদু মেঘলা আলোয় বণিক প্রস্তুত হলেন—এবার তিনি ঘরে ফিরে যাবেন। কিন্তু কোন পথে যাবেন? পথ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। সকল পথেই তুষারের স্তূপ। বৃক্ষশোভিত সুন্দর একটি পথ ধরে তিনি এগোতে লাগলেন।

কিছুদূর যেতেই অবাক হলেন তিনি। অদ্ভুত সুন্দর এক দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে। দুর্গ দেখে খুব অবাক হয়ে গেলেন সেই ব্যবসায়ী। দুর্গের গায়ে কোথাও কোনো তুষারপাতের চিহ্ন নেই। দুর্গের প্রবেশপথে চারপাশে কমলালেবুর গাছ। ফুলে-ফলে ঢাকা চমৎকার এক বাগান।

দুর্গের প্রবেশমুখে মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। কোথাও জনমানুষের সাড়াশব্দ নেই। তিনি সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। দেখলেন, সামনেই এক সুদৃশ্য, মনোরম আসবাবসজ্জিত ঘর। ঠাণ্ডা বাতাসের অপূর্ব হিল্লোল বয়ে গেল তাঁর চারপাশে। তিনি অনুভব করলেন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত তিনি। সেই বিশাল দুর্গে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কোথাও কেউ নেই। প্রতিটি শূন্যঘরে, বিশাল হলরুমে, গ্যালারিতে অপরিসীম নিস্তব্ধতা।

একটা ছোট্ট ঘরে এসে স্থির হয়ে তিনি দাঁড়ালেন। ঘর গরম করে রাখার চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। তিনি একটা আরামকেদারায় আয়েশ করে বসলেন। বসেই টের পেলেন, সবেমাত্র ঘরটিকে সজ্জিত করা হয়েছে। আকাঙ্ক্ষিত কেউ হয়তো এখানে আসবে। লোকটি আরামকেদারায় শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কারও আগমনের। ক্লান্তি শ্রান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল।

অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখলেন, এখনও তিনি একা। কিন্তু সামনে একটা ছোট্ট টেবিল। সজ্জিত রয়েছে নানারকম খাবার। তিনি একমুহূর্ত দেরি করলেন না। ক্ষুধার্ত পেটে খাদ্যগ্রহণ শুরু করলেন। অদৃশ্য আতিথেয়তায় তিনি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন

গৃহকর্তাকে। কিন্তু কারও দেখা পেলেন না।

খাবার পর দিলেন আবার দীর্ঘ ঘুম। জেগে উঠে টের পেলেন—তাঁর ক্লান্তি এখন নেই। রাত্রি-জাগরণের ছাপও মুছে গেছে শরীর থেকে। আবারও খাদ্যগ্রহণ। ভরপেট খাওয়ার পরে কেক এবং ফলমূল খেলেন।

দুর্গপ্রাসাদের নৈঃশব্দ একসময় তাঁকে আতঙ্কিত করে তুলল। প্রত্যেক ঘরে-ঘরে ঘুরে তিনি খোঁজ করতে লাগলেন কাউকে পাওয়া যায় কি না! কিন্তু প্রাণের কোনো চিহ্ন তিনি পেলেন না।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে তিনি এলেন বাগানে। যদিও এখন শীতকাল তবু সূর্য ঝলমল করছে আকাশে। পাখিরা গান গাইছে। ফুল ফুটেছে অনেকরকম। মিষ্টি মৃদু বাতাস বইছে সবখানে।

ব্যবসায়ী লোকটা নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আনন্দে-পুলকে বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি স্বগতোক্তি করে উঠলেন,

—আহা, সবকিছু যেন আমার জন্যে। আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে সবাইকে নিয়ে এসে উপভোগ করব এই দৃশ্য।

যখন তিনি প্রাসাদে এসেছিলেন তখন অতিরিক্ত ঠাণ্ডায়, তুষারপাতে তিনি ছিলেন ক্লান্ত, যেন বিধ্বস্ত। এখন নিজেকে কিছুটা সজীব মনে হচ্ছে। তখন তাঁর বাহন ঘোড়াটার কথা মনে পড়ল। বারান্দার সামনেই ঘোড়াটাকে তিনি রেখেছিলেন। কিন্তু ঘোড়াটার অবস্থা কী?

সামনেই মনে হচ্ছে আস্তাবল।

এখন তাঁর বাড়ির কথা খুব মনে পড়ল। ঘোড়াটাকে তৈরি করে নেয়া দরকার। আস্তাবলে যাবার পথের দুপাশে সুসজ্জিত গোলাপের ঝাড়। এত সুন্দর গোলাপ তিনি কখনও দেখেননি। একটি গোলাপ নিয়ে যেতে বলেছিল বিউটি। তাঁর শান্তশিষ্ট ছোট্ট মেয়েটি।

ব্যবসায়ী লোকটি একটিমাত্র গোলাপ তুলতে গেলেন। মাত্র একটি গোলাপ ছিঁড়ে তিনি হাতে নিয়েছেন অমনি এক অদ্ভুত রকমের শব্দ শুনতে পেলেন পেছনে। ঘুরে দাঁড়াতেই তিনি দেখতে পেলেন—এক ভয়ংকরদর্শন অদ্ভুত জন্তু দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে। জন্তুটার চেহারায় মারাত্মক রাগের ছাপ। ভয়ানকভাবে জন্তুটা চিৎকার করে উঠল,

—কে তোমাকে সাহস দিয়েছে আমার গোলাপফুল ছেঁড়ার। আমার প্রাসাদে তুমি আরাম করলে, ঘুমালে, খাওয়াদাওয়া করলে—তারই প্রতিদান দিলে একটা ফুল চুরি করে? তোমাকে এজন্যে শাস্তি পেতে হবে। শাস্তি ছাড়া তোমার মুক্তি নেই।

সাংঘাতিক ভয় পেয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন লোকটি। তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল গোলাপফুলটা। হাঁটুগেড়ে লোকটি অদ্ভুত জন্তুর সামনে কাতরস্বরে বলতে লাগলেন,

—ক্ষমা করুন আমাকে। আমি দারুণভাবে কৃতজ্ঞ আপনার আন্তরিকতায়। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে আমার। এই সামান্য গোলাপফুলটির জন্যে আপনি এত দুঃখ পাবেন এ আমার কল্পনারও বাইরে।

কিন্তু অদ্ভুত জন্তুর রাগ তাতে একটুও কমল না। সে চিৎকার করে উঠল,

—এসব ভড়ং ছাড়ো। এখন মাপ চেয়ে লাভ কী? তোমার মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারবে না। তোমার মৃত্যুই হওয়া উচিত।

লোকটি তখন একেবারে ভেঙে পড়েছেন। চরম হতাশায় বেচারা তখন মূক, বধির, স্থবির। মনে পড়ল বিউটির কথা। হায় রে! বিউটি কি জানে একটা গোলাপের কী যন্ত্রণা! এখন তিন মৃত্যুপথযাত্রী। বণিক তখন অদ্ভুত জন্তুকে সবিস্তারে খুলে বললেন সব কাহিনী। তাঁর দুর্ভাগ্যের সকল উপাখ্যান।

—ছোটমেয়ে বিউটির উপহার নেয়া যাবে বলেই আমি চরম ভুল করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি জানলে আপনার এই ক্ষতি করতাম না।

অদ্ভুত জন্তু কর্কশকণ্ঠে জানাল,

—একটিমাত্র শর্তে আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারি। তোমার যে-কোনো একটি মেয়েকে আমার কাছে দিতে হবে।

আর্তনাদ করে উঠলেন লোকটি।

—আমার যে-কোনো একটি সন্তানের জীবন আমার জীবনের চেয়েও মূল্যবান। কিসের মূল্যে আমি একটি মেয়েকে এখানে নিয়ে আসব? কাকে আনব?

—না, কাউকে জোর করে আনা চলবে না। স্বেচ্ছায় আসতে হবে। সেই মেয়ের সঙ্গে কোনো শর্ত থাকবে না। তোমার যে-মেয়ে সবচেয়ে সাহসী এবং বাবাকে যে সবচেয়ে ভালোবাসে তাকেই আসতে হবে। সে আসবে বাবার জীবনরক্ষার্থে । তুমি নিশ্চয়ই সৎমানুষ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করে বাড়ি ফেরার অনুমতি দিলাম। আর একমাসের মধ্যে তোমাকে মেয়েসহ এখানে আসতে হবে। তারপর তোমাকে মুক্তি দেব। যদি কেউ না আসে তবে চিরদিনের মতো বিদায় দিয়ে আসবে সন্তানদের। তার পরে তুমি আমার সঙ্গে বসবাস করবে। আমার কথার কোনো অমর্যাদা হলে বুঝতেই পারছ—তোমার কোনো নিস্তার নেই।

ভয়ংকরভাবে অদ্ভুত জন্তুটা লোকটার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,

—তোমার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।

অসহায় ব্যবসায়ী অদ্ভুত জন্তুর প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তিনি সকল প্রস্তাবে রাজি।

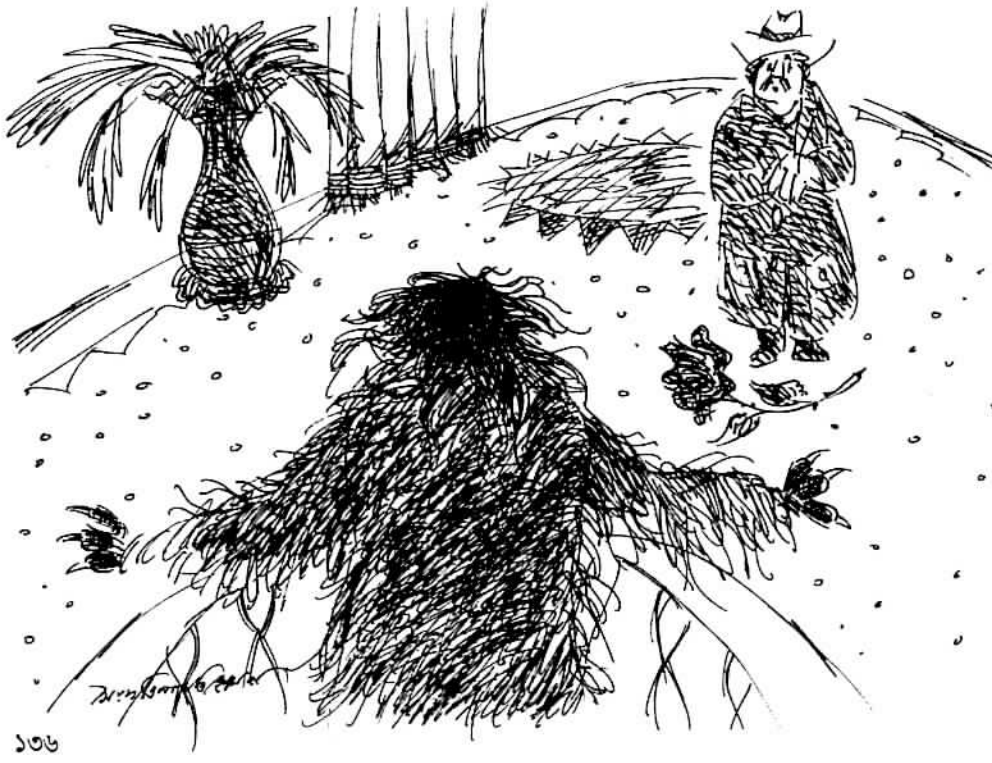

কোনোমতে এখন তিনি অদ্ভুত জন্তুর সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইলেন। অনুমতি প্রার্থনা করলেন,

—এখন কি আমি বাড়ির পথে যাত্রা করতে পারি?

—না, আগামীদিন পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। কাল সকালে দ্রুতগতিসম্পন্ন একটা ঘোড়া তোমার জন্য প্রস্তুত থাকবে। যাও, এখন খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

হায় বেচারা ব্যবসায়ী! ভীতচকিত হয়ে ফিরে গেলেন নিজের ঘরে। ছোট্ট টেবিলে ইতোমধ্যেই সাজানো হয়েছে নানারকম খাদ্যদ্রব্য। কিন্তু ভয়ের চোটে তিনি কিছুই খেতে পারলেন না। তার পরই মনে পড়ল বিকটদর্শন জন্তুর কথা। তার হুকুম পালন না হলেই সে ক্ষিপ্ত হবে। ভয়ে লোকটা প্রায় সম্বিৎহারা। কষ্ট করে খাওয়া শুরু করলেন। জন্তুটা সামনে দাঁড়িয়ে। খাবার-পর্ব শেষ হতেই জন্তুটা বলল,

—আমার শর্তগুলো যেন ঠিকঠিক মনে থাকে। স্বেচ্ছায় তোমার এক কন্যার যেন আগমন হয়।

জন্তুটা আরও বলল,

—সূর্য না-ওঠা পর্যন্ত তুমি ঘুম থেকে উঠবে না। একটা সোনালি ঘণ্টা বাজবে প্রভাতে। তখন তোমার সকালের নাশতা প্রস্তুত থাকবে। নাশতা খাওয়ার পরই দুর্গপ্রাসাদের বাইরে প্রস্তুত থাকবে তোমার ঘোড়া। ঐ ঘোড়াটা তোমাকে নিয়ে যাবে বাড়িতে। একমাস তোমার ওখানে অপেক্ষা করবে। তারপর তোমার কন্যাসহ ঘোড়াটা তোমাকে নিয়ে ফিরে আসবে। কথাগুলো যেন মনে থাকে। আর এই নাও একটি লাল গোলাপ তোমার বিউটির জন্যে। আর প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হয়ো না।

বণিক সূর্য না-ওঠা পর্যন্ত শুয়ে রইলেন। আজ কি তাঁর চোখে ঘুম আসে ?

সকালে নাশতা খাওয়ার পরে ঘোড়ায় চেপে যাত্রা শুরু করলেন বণিকটি। ঘোড়াটি ছিল দুর্দান্ত সবল এবং বলিষ্ঠ। নিমেষেই প্রাসাদ পেরিয়ে ছুট লাগাল সে। বাসায় ফেরার জন্য বণিকের মন আনচান করছিল। কিন্তু বাসায় যখন এসে পৌঁছালেন তখন তাঁর চেহারা মলিন, বিবর্ণ এবং ভঙ্গুর। হতাশার গাঢ় ছায়া চেহারায়।

তাঁর সন্তানেরা ছুটে এল। দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তারাও চিন্তিত। তারা দ্রুত জানতে চাইল, তাঁর দীর্ঘ পথশ্রমের কষ্ট কি সফল হয়েছে? তারা অবাক হয়ে শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ঘোড়াটির দিকে তাকিয়ে আছে। সোনালি জিন, দামি আসন, চকচকে ঘোড়া দেখে তারা আশ্বস্ত হল—যাক বাবা হয়তো তাঁর হৃতসম্পদ কিছুটা উদ্ধার করতে পেরেছেন।

বণিক তাঁর সন্তানদের প্রথমেই নিদারুণ দুঃখ ও কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। বিউটির জন্য গোলাপ নিয়ে কী নিদারুণ বিপদগ্রস্ত তিনি তাও জানাতে ভুললেন না। গোলাপফুলটি বিউটির হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন,

—তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি—এই সেই গোলাপ। তুমি জানো না এর চরম মূল্য কতখানি।

বণিক তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার গল্প শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বললেন। সেই কথা শুনে সন্তানেরা প্রত্যেকে মর্মাহত। মেয়েরা হতাশায় মুষড়ে পড়ল। ছেলেরা বলতে লাগল, বাবা তুমি ঐ প্রাসাদে আর যেতে পারবে না। কিন্তু বাবা তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

বোনেরা তখন বিউটির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সব দোষ বিউটির। যদি সে গোলাপফুল না চাইত তবে হয়তো বাবা এমন বিপদে পড়তেন না।

বেচারি বিউটি বলতে লাগল,

—এই দুর্ভাগ্যের জন্য আমিই দায়ী। কিন্তু কে জানত গ্রীষ্মকালে একটি গোলাপের জন্য এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটবে! কিন্তু এই ঘটনার জন্য আমিই যখন দায়ী তবে এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। আমিই বাবার সাথে প্রাসাদে যাবে। বাবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব।

প্রথমে সবাই বুঝতে পারল না, বিউটি কী বলছে। বাবা এবং ভাইয়েরা তাকে খুব ভালোবাসে। তারা তাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। কিন্তু বিউটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিল।

সেই প্রতিশ্রুত দিন যখন এল, বিউটি তখন ঘোড়ায় চাপতে প্রস্তুত। সে সাহস ও হাসিখুশি ভাব দেখাতে লাগল বাবাকে। বাবার সাথে ঘোড়ায় চাপতেই ঘোড়াটা যেন হাওয়ায় ভেসে উড়তে লাগল। এত সুন্দরভাবে ঘোড়াটা ছুটছে যে বিউটির আর কোনো ভয় রইল না। এমনকি বিউটির আনন্দই হতে লাগল, কারণ বিউটি এই যাত্রার পরিসমাপ্তি সম্পর্কে কিছুই জানে না।

বাবা বারবার তাকে ফিরে যেতে অনুরোধ জানাল। কিন্তু বিউটি সে-কথায় কর্ণপাত করল না।

যেতে যেতে যেতে পথে রাত্রি নেমে এল। অবাক হয়ে তারা টের পেল বনের অন্ধকারে চারপাশ থেকে আলো জ্বলছে। তাদের চারপাশেই আগুনের ফুলকি, যদিও সমগ্র অরণ্যভূমি অন্ধকারে নিমজ্জিত। তারা উত্তাপ পাচ্ছে। কিন্তু অরণ্যে তখন বয়ে যাচ্ছে চরম ঠাণ্ডা বাতাস। তারা একসময় এসে পৌঁছাল সেই কমলালেবুর ছায়াঢাকা প্রাসাদের প্রবেশমুখে। প্রাসাদের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আলোর উজ্জ্বলতা। ঝকমক করছে সবকিছু। আর চতুষ্পার্শ্বে মৃদু সংগীতের মূর্ছনা। যেন এক অপার্থিব পরিবেশ। অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত প্রাসাদ।

বিউটি অবাক হল এই রূপসজ্জায়।

—অদ্ভুত জন্তুটি নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত।

কষ্ট করে মৃদু হাসি দিয়ে বিউটি আরও বলল,

—শিকার এখন তার হাতের মুঠোয় বলে প্রাসাদে এত উৎসবের ভাব।

মনের দুশ্চিন্তা কাটানোর জন্য বিউটি তখন উপভোগ করতে লাগল রাজপ্রাসাদের আশ্চর্য-সৌন্দর্য।

যখন তারা প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হল তখন সংগীতের মূর্ছনা আরও বৃদ্ধি পেল। বাবা বিউটিকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। হাঁটতে হাঁটতে সেই ছোট্টঘরটিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন যে-ঘরে ইতিপূর্বে তিনি থেকেছেন। ঘরের কোণে চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। তা থেকে মৃদু উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। টেবিলের উপর সাজানো আছে সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় সব খাবারদাবার।

ঘরে ঢুকেই কিছুটা ভয় কমে গেল বিউটির। সে ধীর পদক্ষেপে একের পর এক ঘর ঘুরে দেখতে লাগল। কিন্তু অদ্ভুত জন্তুটার দেখা পেল না কোথাও। দীর্ঘ পথযাত্রায় খিদের উদ্রেক হয়েছে বিউটির। বাবা আর মেয়ে পেটভরে খাদ্যগ্রহণ করল।

খাবার শেষ হতেই সেই অদ্ভুত জন্তুর বিকৃত পদশব্দ শোনা গেল। বিউটি ভয় পেয়ে বাবার কোলঘেঁষে বসল। জন্তুটাকে দেখে ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল বিউটি। সে যা ভেবেছিল তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর জন্তু।

কিন্তু সে এখানে স্বেচ্ছায় এসেছে।

ভয় তাড়িয়ে, আতঙ্ক তাড়িয়ে স্থির হতে চাইল বিউটি। সে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মান জানাতে চাইল জন্তুটাকে।

বিউটির এই সাহসী আচরণে খুব খুশি হল জন্তুটা। বিউটির দিকে তাকিয়ে রইল আন্তরিকভাবে। কিন্তু জন্তুটার চেহারা এতই ভয়াবহ যে সেই আন্তরিকতার ছাপ তার চেহারায় পাওয়া গেল না। কঠিন তার হৃদয়। ভয়ংকর তার মুখশ্রী। সে উৎকট কণ্ঠে বলল,

—শুভরাত্রি।

বণিক ভয়ে কিছুই বলতে পারলেন না। তবে বিউটি প্রতি-অভিবাদন জানাল মিষ্টিস্বরে,

—আপনাকেও শুভরাত্রি।

—তুমি কি স্বেচ্ছায় আমার গৃহে এসেছ?

প্রশ্ন করল জন্তুটা।

—যদি তোমার বাবা চলে যায় তবে কি তুমি আমার সাথে থাকবে?

জন্তুটার কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল—তার মনে রাগ নেই। বরং সে এখন কিছুটা আর্দ্র।

বিউটি সাহসের সঙ্গে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল। কারণ সে এখানে থাকার জন্য প্রস্তুত।

জন্তুটি বলল,

—আমি তোমার ব্যবহারে আনন্দিত। তুমি থাকো আমার সঙ্গে। অবশ্য যখন খুশি তুমি চলেও যেতে পারবে আমার কাছ থেকে। ভয়ের কিছু নেই।

জন্তুটা তারপর বিউটির বাবার দিকে তাকিয়ে বলল,

—ওহে বৃদ্ধ মানুষ, কাল সকালেই তুমি চলে যেতে পারো। যখন ঘণ্টা বাজবে, তখনই উঠে ঝটপট নাশতা খেয়ে তৈরি হয়ে নেবে। একই রকম ঘোড়া তৈরি থাকবে। খুব আরামেই তুমি পৌঁছে যাবে তোমার বাড়িতে।

তারপর বিউটির দিকে ঘুরে জন্তুটা জানাল,

—তোমার বাবাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও। ওখান থেকে বেছে নাও তোমার ভাইবোনদের উপহার। দুটো দামি বাক্স আছে সেখানে। বাক্স দুটো তুমি ভরে দিতে পারো উপহারে। খুব মূল্যবান দ্রব্যগুলো তুমি ভাইবোনদের উপহার দিও। এমন জিনিস দিও যা তোমার ভাইবোনেরা কোনোদিন দেখেনি।

তারপর অদ্ভুত জন্তুটা বিউটিকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেল অন্য ঘরে।

বিউটির মনটা বিষাদে পূর্ণ হয়ে গেল। বাবাকে চলে যেতে হবে। জন্তুর কথা অনুযায়ী ওরা গেল পাশের ঘরে। ঘরটার চারিদিকে শেলফ আর কাপবোর্ড। তারা দুজনেই আশ্চর্য হয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখল—দামি দামি দুষ্প্রাপ্য সব জিনিসে পূর্ণ শেলফ। খুবই সুদৃশ্য রানির পোশাক রয়েছে। তাকে থরে থরে সাজানো হীরা মণি মুক্তো।

বিউটি চমকে গেল অলংকারের উজ্জ্বলতায়। বোনদের জন্য সেসব অলংকার বাছাই করে দিল বিউটি। প্রত্যেকের জন্য একেকটা আশ্চর্য-সুন্দর পোশাক বাছাই করে বাক্সে ভরল। শেলফের শেষ ডালায় সোনা আর সোনা।

—বাবা, এই সোনাদানা এখন তোমারই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। একবাক্স সোনা নিয়ে যাও। অন্য জিনিসের চেয়ে সোনার মূল্য অনেক বেশি।

তারপর দুজনে একবাক্সে সোনাদানা, হীরা মণি মুক্তো ভরে নিল। বাক্সটা সম্পূর্ণ ভরেনি। কিন্তু অনেক ওজন হয়ে গেছে। তারা দুজন তুলে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু এতটুকু নাড়াতে পারল না। এই বাক্স বহন করতে হলে হাতির প্রয়োজন।

—বিকট জন্তুটা এই বাক্স দিয়েছে। সে সব জিনিস নেয়ার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু খুব ভালো করে জানে, এতকিছু বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—তবু যা পেয়েছ বাবা, সেটাই যথেষ্ট।

বাক্স গুছাতে গুছাতেই রাত ফুরিয়ে গেল। সকালের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তারা ছোট্ট ঘরে প্রবেশ করতেই দেখল, নাশতার টেবিল সাজানো হয়েছে। বাবা আর মেয়ে পেট ভরে নাশতা খেল। বাবার ধারণা, খুব শীঘ্রই তিনি ফিরে আসবেন এই প্রাসাদে। আবার দেখা হবে মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু বিউটি টের পাচ্ছে—হয়তো এটাই বাবার সঙ্গে শেষ দেখা। চিরদিনের জন্য বাবার সঙ্গে বিদায়।

সোনালি ঘণ্টা বেজে উঠল। বাবার বিদায়লগ্নে দুঃখে পূর্ণ হয়ে গেল বিউটির মন। তার এখন দারুণ মন-খারাপ।

প্রাসাদের আঙিনায় দুটো তাগড়া ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। বাক্স দুটো কে বা কারা একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিয়েছে। আরেকটা ঘোড়ায় চড়বেন বণিক। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে শেষ বিদায়ের অশ্রু ঝরতে লাগল তাঁর চোখে।

ঘোড়ার পিঠে চড়তেই চকিতে ঘোড়াটা ছুট লাগাল। বাবার সঙ্গে ঠিকমতো কথাও বলতে পারল না বিউটি। সে কান্না শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল নিজের ঘরে।

দুঃখে, বিপদে, কান্নায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সে। তার ঘুম পেতে লাগল, খুব ঘুম। দুঃখ, কষ্ট, বেদনায় ঘুম ছাড়া আর কী আছে! নিমেষেই গভীর ঘুমে তার দুচোখ বুজে এল।

তারপর বিউটি স্বপ্ন দেখতে লাগল। অভূতপূর্ব এক স্বপ্ন। ছোট্ট একটা শোভিত লেকের ধার

দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। চারিদিকে নানারকম গাছ, নানারকম ফুল ফুটেছে তাতে। একা একা হাঁটছে বিউটি। মন তার ভালো নেই। সে কতই-না দুর্ভাগা!

ঠিক তখনই—

তার সামনে এসে উদয় হল অপরূপ এক রাজপুত্র। এমন সুপুরুষ, সুবেশধারী ব্যক্তিকে কেউ কোথাও দেখেনি। তার কণ্ঠস্বর হৃদয়ে গিয়ে প্রবেশ করে।

—আহ্ বিউটি—নিজেকে তুমি যতটা দুর্ভাগা মনে করছ আসলে ততটা নয়। এখানে তুমি এমন পুরস্কার পাবে যা তুমি ভাবতেও পার না। তোমার প্রতিটা ইচ্ছাপূরণ হবে। তোমার কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবে। শুধু আমাকে তুমি বুঝতে চেষ্টা করো। আমি তোমাকে গভীরভাবে ভালোবাসি। আমাকে যদি সুখী করতে পারো তবে তুমি নিজেও সুখী হবে। হৃদয়ের শক্তি নিয়ে তুমি আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

—আমি তোমাকে সুখী করার জন্য কী করতে পারি রাজকুমার?

জানতে চায় বিউটি।

—ভালোবাসা! কৃতজ্ঞ ভালোবাসাই আমাকে সুখী করবে। তোমার চোখ ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাকে ভুল বুঝবে না।

এরপর স্বপ্নের মধ্যে বিউটি নিজেকে আবিষ্কার করে দুগ্ধফেননিভ এক শয়নকক্ষে। সেখানে অপূর্ব সুন্দরী এক পরিচারিকা তাকে বলছে,

—প্রিয় বিউটি, আজকের দুর্ভাগ্য একদিন পরম সৌভাগ্য বয়ে আনবে তোমার জীবনে। কুৎসিত বলে কাউকে তুমি অবহেলা কোরো না।

স্বপ্নের সমুদ্রে অবগাহন করছে বিউটি। চমৎকার স্বপ্নের পরে ঘুম ভেঙে গেল তার। বিছানা ছেড়ে ওঠার কোনো তাড়াহুড়ো নেই। শুয়ে শুয়ে মধুর আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে রইল সে। তখন ঘড়ি বেজে উঠল। খুব মধুর স্বরে ঘড়িতে বারবার তার নাম উচ্চারিত হল।

তখন জেগে উঠল বিউটি।

ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে সামান্য সাজগোজ করে নিল সে। যে-রূপসামগ্রী তার প্রয়োজন সবই আছে ড্রেসিং-টেবিলে। তারপর খাবার টেবিলে বসল। তার পছন্দের সব খাবার। একা একা খুব বেশিকিছু খাওয়া যায় না। সামান্য খাদ্যগ্রহণের পর বিউটি আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসল। আর ভাবতে লাগল আশ্চর্য স্বপ্নের কথা। স্বপ্নে-দেখা সেই রাজকুমার বারবার এসে ভর করতে লাগল তার দুচোখে। বিউটি নিজেই নিজেকে বলতে লাগল,

—রাজকুমার বলেছে, একমাত্র আমিই তাকে সুখী করতে পারি। কিন্তু আমি তো এখন অদ্ভুত জন্তুর কবলে বন্দি। এখান থেকে কীভাবে মুক্ত হব আমি? রাজকুমার আবার বলেছে, আকার এবং আচরণ দেখে কাউকে আমি যেন অবহেলা না করি।

যাহোক, এসব স্বপ্নের ব্যাপার-স্যাপার। এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? এর চেয়ে নিজের আনন্দে বেঁচে থাকার মধ্যে সুখ রয়েছে।

বিউটি তখন রাজপ্রাসাদ ঘুরে দেখার জন্য উঠে দাঁড়াল। প্রথমেই আয়নাঘর। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াতে বিউটির প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল। এরকম অপূর্ব আয়না বিউটি আগে কখনও দেখেনি।

তারপর অন্য ঘরে যেতেই দেখে অপূর্ব একটা ছবি ঝুলছে। ছবিটা সেই রাজকুমারের, যে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে। চারপাশে ছবি আর ছবি। প্রমাণ-সাইজ ছবিগুলো দেখে বিস্মিত হয়ে গেল বিউটি। স্বপ্নের রাজকুমারের বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দে তিরতির করে কাঁপতে

লাগল বিউটি। প্রত্যেকটা ছবি যেন জীবন্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বিউটি লাফ মেরে পাশের ঘরে গেল। সে কি স্বপ্ন দেখছে? নাকি এটা বাস্তব? পাশের ঘরে শুধু বাদ্যযন্ত্র! জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে সেই ঘরে। বিউটি একা একা কিছুক্ষণ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গাওয়ার চেষ্টা করল।

তার পরের ঘরটা লাইব্রেরি। সেখানে শুধু বই আর বই। এ-জীবনে যেসব বই পড়তে চেয়েছিল বিউটি সব বইই আছে সেখানে। লাইব্রেরি-ঘরে হীরার মোমদানিতে মোম জ্বলছে। আর প্রত্যেক ঘরে আছে সোনার আলোকদানি। বিপুল বিত্তের প্রাচুর্যে চমকে-থমকে স্তম্ভিত হয়ে গেল বিউটি।

বিউটি সময়মতো রাতের খাবার পেয়ে গেল। যখনই তার খিদে-খিদে ভাব অনুভূত হয়েছে অমনি টেবিল পূর্ণ হয়েছে খাবারে।

কিন্তু কাউকে কোথাও দেখা যায় না। শোনা যায় না কারও কথা। কারও পদশব্দ পর্যন্ত টের পাওয়া না। কে তাকে গোপনে খাবার দিচ্ছে? কে তাকে সেবা-সহযোগিতা করছে?

তৎক্ষণাৎ সে শব্দ শুনে বুঝল অদ্ভুতদর্শন জন্তুটা আসছে। বিউটি ভীত হয়ে পড়ল, হয়তো এবার তাকে খেয়ে ফেলবে জন্তুটা। কিন্তু দেখা গেল জন্তুটার আচরণ আগের মতো ভয়ংকর নয়। ভরাট কণ্ঠস্বরে সে বলল,

—শুভসন্ধ্যা, বিউটি।

বিউটি প্রতি-উত্তর দিল আনন্দিতভাবে। তার প্রতিপক্ষ যেন উত্তেজিত না হয়। জন্তুটা জানতে চাইল, বিউটি কি এই প্রাসাদে বাস করে আনন্দিত?

বিউটি তখন কামরাগুলো ঘুরে দেখার আনন্দময় অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করল।

—এইখানে থাকায় তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি?

—সামান্যতম অসুবিধাও হচ্ছে না। সবকিছুই অতি সুন্দর।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাক্যালাপ হল জন্তুটা ও বিউটির মধ্যে। বিউটি টের পেল, জন্তুটাকে যত অমানুষ ভাবা হয়েছে আসলে সে ততটা নয়। বরং তার মধ্যেও আছে সরলতা ও সহজ আচরণ। অদ্ভুত জন্তুটা ঘুমোতে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মন্দ্রিত কণ্ঠে বলল,

—বিউটি, তুমি কি আমাকে ভালোবাসতে পারবে? তুমি কি বিয়ে করতে পারবে আমাকে?

এই কথা শুনে বিউটি কানে হাত দিল।

—আহ্, এসব কী শুনছি আমি?

কাঁদতে লাগল বিউটি। যদি সে কথার অন্যথা করে তবে হয়তো জন্তুটা তাকে হত্যা করে ফেলবে এই ভয়ে বিউটি নিরুত্তর রইল।

—কোনো ভয় নেই। তুমি হাঁ অথবা না বলো।

জন্তুটা পুনর্বার জানতে চাইল।

—না, না, এ হয় না।

খুব দ্রুত শব্দকয়টি উচ্চারণ করল বিউটি।

জন্তুটি কিছুই বলল না।

—শুভরাত্রি, বিউটি।

বিউটিও শুভরাত্রি জানাল। সে মনে-মনে দারুণ খুশি। জন্তুটা যে তার উপর কোনো জবরদস্তি করেনি এতে সে মুগ্ধ।

খুব দ্রুত বিছানায় গেল বিউটি। অপূর্ব আরামদায়ক বিছানা। মুহূর্তেই ঘুমের দেশে সেই অপরূপ রাজকুমারের দেখা পেল বিউটি। তার অনিন্দ্যসুন্দর চক্ষুযুগলে স্বপ্নের ছোঁয়া। বিউটি ভাবতে লাগল, রাজকুমার এসেছে। কাতরস্বরে সে বলছে,

—আহ্, বিউটি। তুমি আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর, এত নির্দয় কেন? আর কতদিন এমন দুর্ভাগ্য বয়ে বেড়াতে হবে আমাকে কে জানে!

হঠাৎ করে রাজকুমারের আকুতিতে স্বপ্ন ভেঙে গেল বিউটির। সে প্রাণপণ চেষ্টা করল রাজকুমারের মুখশ্রী মনে রাখার। সেদিন সকালবেলা বিউটির প্রথম কাজ—পাশের কামরায় গিয়ে রাজকুমারের অঙ্কিত ছবি দেখা। ছবি দেখে বিউটি নিশ্চিত হল, তার স্বপ্নে-দেখা রাজকুমারের চেহারার সঙ্গে ছবির অপূর্ব মিল রয়েছে।

সেদিন সকালে বিউটি ভাবল, আজ সে বাগানে ঘুরে বেড়াবে। আকাশে সূর্য উঠেছে সাতরঙা পাখা মেলে। বাগানের আলোকিত ঝরনায় অবিরল জলপ্রবাহ হচ্ছে। বিউটি হাঁটতে হাঁটতে আরেকটু এগিয়ে গেল। সবুজ শোভিত লেকের ধারে এসে চমকিত হল সে। এইরকম এক স্থান সে স্বপ্নে দেখেছে, যেদিন প্রথম রাজকুমারের সঙ্গে তার দেখা হয়। তা হলে রাজকুমার কি এই প্রাসাদেরই কোথাও বন্দি আছে? ঐ অদ্ভুত জন্তুটা নিশ্চয়ই বন্দি করেছে রাজকুমারকে।

ঘুরতে ঘুরতে বিউটি প্রাসাদের পেছনদিকে এল। ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে আসছে। সে পেছনের সিঁড়ি বেয়ে প্রবেশ করল প্রাসাদে। একটা নতুন কামরায় এসে দেখল, এ যেন এক পক্ষীশালা। দামি ও দুষ্প্রাপ্য সব পাখি নেচে-গেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা পাখি বিউটির কাঁধে, মাথায় এসে বসল।

—আহা, কী সুন্দর প্রকৃতির সৃষ্টি!

বিউটি বলল,

—আমার ঘরের পাশে যদি তোমাদের রাখতে পারতাম, তা হলে সবসময় শুনতাম তোমাদের মিষ্টি মধুর গান।

যেই-না এই কথা বলা অমনি তার সামনে খুলে গেল বিশাল এক দরজা। অবাক হয়ে বিউটি তাকিয়ে রইল সামনে। এই হচ্ছে তার ঘর।

আরেক কামরায় আরও পাখি আছে। কথা-বলা পাখি রয়েছে অনেক। টিয়া আর কাকাতুয়ারা বিউটির নাম ধরে ডাকতে লাগল। বিউটি বিস্ময়করভাবে টের পেল, পাখিরা তার সঙ্গে কথা বলছে। তারাই তাকে খাদ্যগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাল। ভারি ভালো লাগছে বিউটির। সেও কি কোনো পাখি? বন্দি পাখিদের সাম্রাজ্যে আনন্দেই কেটে গেল তার দিন।

রাতের বেলা অদ্ভুত জন্তুটা আবার এল বিউটির ঘরে। আগের মতো একই প্রশ্ন করল সে। মন্দ্র কণ্ঠস্বরে শুভরাত্রি জানিয়ে আবার বিদায় নিল।

বিউটি রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আবার ভাবতে লাগল রহস্যময় রাজকুমারের কথা।

দিনগুলো কেটে যেতে লাগল বিভিন্নরকম আনন্দ-উৎসবে, আনন্দ-ফুর্তিতে। কদিন পরে বিউটি সেই প্রাসাদের ভেতর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা অর্জন করল। প্রাসাদে অদ্ভুত এক কামরা আছে। সারা কামরাটা শূন্য, কিছুই নেই। আটটা জানালা আছে চারপাশে। জানালার ধারে আছে আটটা আরামকেদারা। একাকী মন-খারাপ করলেই বিউটি সেই কামরায় যায়। প্রথমদিন বিউটি বসেছিল কালো পরদার জানালার পাশে। কিন্তু কালো পরদার কারণে বিউটি জানালার বাইরে কিছুই দেখতে পারেনি। দ্বিতীয়বার সেই কামরায় গিয়ে বসল সবুজ পরদা ঢাকা জানালার সামনে। কিছুটা ক্লান্ত সে। নিঃসঙ্গও বটে। আরামকেদারায় বসামাত্র পনদাটা আপনিআপনা সরে গেল। পর্দার ওপারে চলছে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক মূকাভিনয়। আরেকদিন অন্য জানালায় বসে দেখা গেল—লাল নীল আলোর দীপাবলি। এরই মাঝে চলছে নৃত্য এবং গীত। সবার পরনে সুদৃশ্য পোশাক। অপূর্ব নৃত্য দেখে মোহমুগ্ধ হয়ে গেল বিউটি। আরও একটি জানালার ওপাশে চলছে জাদুকরের খেলা। সে কী আনন্দময় অভিজ্ঞতা! এইভাবে যে-কোনো জানালার ধারে বসলেই কিছু-না-কিছু বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপভোগ করা যায়। ক্লান্ত-শ্রান্ত হলেই বিউটি সেই আশ্চর্য-কামরায় এসে উপস্থিত হয়। অনুষ্ঠান উপভোগ করে প্রাণভরে। সময় যে কীভাবে কেটে যায় তা টেরও পায় না।

প্রতি সন্ধ্যায় রাতের খাবারের পর অদ্ভুতদর্শন জন্তু এসে উপস্থিত হয় বিউটির ঘরে। তার ঘড়ঘড়ে রুদ্র কণ্ঠস্বরে সে প্রতিবারই শুভসন্ধ্যা জানায় বিউটিকে, তারপর প্রশ্ন করে,

—বিউটি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

বিউটি জন্তুটার প্রতি এখন আগের চেয়ে কিছুটা সমব্যথী। সে ছোট্ট করে জবাব দেয়,

—না।

জন্তুটা চলে যায় অবলীলায়। মন-খারাপ করে। স্বপ্নে-দেখা রাজকুমারের কারণেই বিউটি চরমভাবে উপেক্ষা করে জন্তুটাকে। কিন্তু একটি বিষয়ে দ্বিধা কাটে না বিউটির। রাজকুমার তাকে বলেছে, বাহ্যিক অবয়ব দেখে কারও প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা উচিত নয়। চোখ দিয়ে নয়, আমাদের হৃদয় দিয়ে সব উপলব্ধি করা দরকার। এই অবস্থায় কী করণীয় বিউটির—সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

দিন কেটে যায়।

বিউটির দিন কাটে সুখে-আনন্দে।

বাবা-ভাইবোনদের ছেড়ে অনেক দিন কেটে গেল। বাবা আর ভাইবোনদের কথা আজকাল খুব মনে পড়ে। চারপাশের আনন্দের উত্তেজনা একসময় কমে আসে। কখনও কখনও তীব্র একাকী বোধ করে বিউটি।

এক রাতে।

বিউটির মন খুবই খারাপ।

—তোমার কী হয়েছে?

জানতে চায় জন্তুটা।

বিউটি এখন আর জন্তুটাকে দেখে ভয় পায় না। জন্তুটার সাহচর্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। এখন বিউটি জানে, ভয়ানক চেহারা আর মৃত্যুময় কণ্ঠস্বর থাকলেও জন্তুটা আসলে আচরণগত দিক থেকে খুবই ভদ্র। বিউটি জানাল, একবারের জন্য সে বাড়ি ফিরতে চায়। কদিন ধরে বাড়ির কথা তার খুব মনে পড়ছে।

এ-কথা শুনে দারুণ মর্মাহত হল জন্তুটা। দুঃখ-যন্ত্রণায় তার চোখে পানি এসে গেছে।

—আহ্ বিউটি—আমার মতো অসুখী জন্তুর হৃদয়টাকে তুমি মরুভূমি বানিয়ে রেখেছ? তোমাকে সুখী করতে হলে আর কী করতে হবে আমাকে বলে দাও। তুমি আমাকে ঘৃণা করো। তাই এখন পালাতে চাচ্ছ।

—না, না, প্রিয় আমার।

মোহময় সুরে উত্তর দেয় বিউটি,

—আমি তোমাকে কখনওই ঘৃণা করি না। তোমার কাছ থেকে আমি পালাতে চাই না। কিন্তু বাবার সঙ্গে আমার অনেকদিন ধরে দেখাসাক্ষাৎ নেই। মাত্র দুমাসের জন্য আমি যেতে চাই। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দুমাসের মধ্যেই আমি ফিরে আসব। তারপর বাকি জীবন আমি তোমার সঙ্গে কাটাব।

দুঃখের ভাব কেটে গেল অদ্ভুত জন্তুটার অবয়ব থেকে। বিউটির কথা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠল জন্তুটা।

—তুমি যা বলবে আমি তার কোনোকিছুই প্রত্যাখ্যান করব না। যদি এতে আমার জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয় আমি তাতেও রাজি। যাও, এখন তুমি চারটে বাক্স ভরে বেছে নাও উপহার-সামগ্রী। ধনরত্ন সব নাও। কিন্তু মনে রেখো তোমার প্রতিশ্রুতি। দুমাসের মধ্যে স্বেচ্ছায় তোমার ফিরে আসা চাই। যদি তুমি সময়মতো না আসো তবে তুমি তোমার বিশ্বস্ত জন্তুটাকে মৃত অবস্থায় পাবে। আমার কাছে ফিরে আসার জন্য তোমার কোনো বাহনের দরকার নেই। তুমি ফেরার দিন বাবা-ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নেবে। সে-রাতে বিছানায় যাবার আগে পরে নেবে এই অঙ্গুরীয়। তারপর হৃদয় থেকে তুমি বলতে থাকবে—আমি আমার প্রাসাদে যেতে চাই। আমি এখুনি দেখা করতে চাই আমার প্রিয় জন্তুটার সঙ্গে। শুভরাত্রি বিউটি। ভয়ের কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়ো শান্তিপূর্ণভাবে। অনেক দিন বাদে তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ। সুন্দর হোক তোমার এই যাত্রা।

বিদায় নিল অদ্ভুতদর্শন জন্তু।

বিউটি তখন বাক্স ভরে ধনরত্ন নিতে লাগল। দামি এবং দুষ্প্রাপ্য সব রত্নাবলি। চার বাক্স

সোনাদানা ভরতে ভরতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল বিউটি। তারপর বিছানায় গিয়ে চমৎকার এক ঘুম দিল। আজ তার অন্যরকম আনন্দ। ভোরবেলায় স্বপ্নে দেখা দিল ভালোবাসাপূর্ণ রাজকুমার। ঘন ঘাসের পথ ধরে সে হেঁটে যাচ্ছে। মন ভালো নেই। গভীর চিন্তামগ্ন চেহারা।

—কী হয়েছে তোমার রাজকুমার?

কাঁদতে কাঁদতে শুধাল বিউটি।

রাজকুমার দুঃখিত ভঙ্গিতে তাকাল বিউটির দিকে।

—কী হয়েছে, সেটা জিজ্ঞেস করে লাভ কী? তুমিও নিষ্ঠুর মেয়ে বিউটি! আমার মৃত্যুতেই তোমার শান্তি।

—আহ্, এরকম কথা বলতে নেই।

চিৎকার করে উঠল বিউটি।

—আমি বাবার কাছে যাচ্ছি—কেবলমাত্র তাকে আশ্বস্ত করতে যে আমি সুস্থ দেহে সুস্থ মনে ভালো আছি। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশ্বস্ত জন্তুটার প্রতি। আমি ফিরে আসব। যদি আমি ফিরে না আসি তবে জন্তুটা মারা যাবে। আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করি না।

রাজকুমার প্রশ্ন করল তখন,

—তুমি ওর প্রতি সদয় নও। তুমি ছাড়া কে ওকে দেখাশোনা করবে?

—আমি ওর প্রতি সদয়। তবু আমি অকৃতজ্ঞের মতো আচরণ করেছি। কারণ এরকম ভয়ংকর-দর্শন জন্তুর সাথে আমি কী করে থাকব।

বিউটি অনবরত কাঁদতে লাগল,

—এই যন্ত্রণার চেয়ে আমি মরে যেতে চাই। আমি তোমাকে বলতে চাই ওর কোনো দোষ নেই। সে কুৎসিত, সে ভয়ংকরদর্শন—আমি কী করব?

—আমি নিশ্চিত বলতে চাই তোমাকে, সে কুৎসিত—এটা তার কোনো দোষ নয়।

ঠিক তখনই এক অদ্ভুত শব্দ এসে ধাক্কা দিল। কেউ যেন কথা বলছে খুব কাছ থেকে। চোখ মেলতেই অন্য একটা ঘরে নিজেকে আবিষ্কার করে বিউটি। রাজপ্রাসাদের মতো উজ্জ্বল এবং জাঁকজমক নয় ঘরটা। তবে সে কোথায়? বিউটি লাফ মেরে বিছানায় উঠে বসে। পোশাক পরে নেয় দ্রুত। চোখ মেলে দ্যাখে প্যাক-করা বাক্সগুলো রয়েছে সামনে।

হঠাৎ করেই সে বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। মুহূর্তেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিউটি। চিৎকার করে বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে। ভাইবোনেরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ছোটবোনের দিকে। তারা ভাবতেই পারছে না, জীবিত অবস্থায় ছোটবোন আবার ফিরে আসবে। বিউটি প্রতিদিনের সব ঘটনা খুলে বলল বাবাকে।

বিউটি জিজ্ঞেস করে,

—এই অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী? কোন রাজকুমার বারবার বাইরের রূপকে বিশ্বাস করতে না করছে?

বাবা বললেন,

—তুমি বললে যে, অদ্ভুত জন্তুটার হৃদয় খুব কোমল। আদতে সে ভয়ংকর নয়। তোমাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। আর প্রত্যাশা করে তোমার ভালোবাসা। জন্তুটা ভদ্রতা দিয়ে, কোমলতা দিয়ে, দয়ালু আচরণ করে তোমাকে জয় করতে চায়। আমার মনে হয় রাজকুমার তোমাকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছে যে, অদ্ভুত জন্তুর কথা মেনে নিলে তুমি আরও বড় কোনো পুরস্কার পাবে। জন্তুটার কুৎসিতদর্শন চেহারা বড় কথা নয়। তার ভালোবাসা, আচরণ, ব্যবহারটাই বড় কথা।

বিউটির কাছে জন্তুটাকে বিয়ে করা অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়। যখনই স্বপ্নে-দেখা রূপবান রাজকুমারের কথা মনে পড়ে তখনই রাগ হয় জন্তুটার উপরে। বিরক্ত হয় সে। কীভাবে সে বিয়ে করবে তাকে?

যাহোক, দুমাস প্রয়োজন পড়ল না এসব চিন্তাভাবনার। প্রাসাদে থাকতে প্রতিদিন রাতে এ-বিষয়ে একবার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হত। এখন দুমাস ভাইবোনদের সঙ্গে আনন্দে উচ্ছলতায় তার দিন কাটতে লাগল।

এখন তাদের দরিদ্রতা নেই। তারা এখন যথেষ্ট ধনীলোক। শহরে বিশাল বাড়ি তাদের। অর্থবিত্ত প্রাচুর্যের কোনো অভাব নেই। ওদের সংসারে আনন্দেরও অভাব নেই আর।

কদাচিৎ প্রাসাদের কথা মনে পড়ে। কী সুখেই-না ওখানে দিন কাটত! সারাদিন কত আনন্দের অয়োজন হত। রাতে স্বপ্নে রাজকুমারের আগমন হত। নিজের বাড়িতে অবিশ্যি বিউটি আর স্বপ্ন দেখেনি। রাজকুমারের বিরহে বিউটি তাই কখনও কখনও ব্যথিত ও বিষণ্ন থাকে।

দেখতে দেখতে দুমাস কেটে গেল। কিন্তু বাবা আর ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সাহস হল না বিউটির। সবার ভালোবাসা আর আন্তরিকতাকে কীভাবে উপেক্ষা করবে সে? প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই সে ভেবেছে আজ রাতে সবার কাছ থেকে বিদায় নেবে। আংটি পরে রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবার ইচ্ছা পোষণ করবে। কিন্তু রাত এলেই সে সব ভুলে গেছে।

হঠাৎ করেই একদিন দুঃস্বপ্ন দেখল বিউটি। সেদিনই তার মন বদলে গেল। স্বপ্নে দেখল, সে

একাকী বাগানের পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে সে শুনল করুণ আর্তধ্বনি। দ্রুত ছুটে গিয়ে দ্যাখে, অদ্ভুত জন্তুটা এক গাছের তলায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গোঁগোঁ করে এক বিকৃত শব্দ উচ্চারণ হচ্ছে তার কণ্ঠ থেকে। মৃত্যুপথযাত্রী জন্তু। অজ্ঞান অবস্থায়, মূর্ছিত অবস্থায় জন্তুটা আর্তচিৎকার করছে।

সেই সময় এক অপূর্ব পোশাকধারী মহিলা এসে বিউটিকে বলল,

—বিউটি দ্যাখো—তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করনি বলেই আজ এই অবস্থা। আর যদি একদিন তুমি দেরি করো তা হলে তুমি এসে ওর মৃতদেহ পাবে।

ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেল বিউটির। নিদারুণ অস্বস্তিতে ভুগতে লাগল সারাদিন। কোনো কাজে তার মন বসল না। সেদিন রাতে সে সবার কাছ থেকে বিদায় নিল। আবার সে ফিরে যাবে অদ্ভুত জন্তুর কাছে। তাড়াতাড়ি সে শুয়ে পড়ল। আঙুলে পরে নিল অদ্ভুত জন্তুর দেয়া অঙ্গুরীয়। একাগ্রচিত্তে সে মনে-মনে বলল,

—আমি ফিরে যেতে চাই আমার রাজপ্রাসাদে। অদ্ভুত জন্তুর সঙ্গে আবার দেখা করতে চাই।

তারপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিউটি। ঘুম ভাঙল ঘড়ির শব্দে। ঘড়িতে তার নামের প্রতিধ্বনি হচ্ছে : বিউটি বিউটি বিউটি। বারবার সংগীতের মতো সুরেলা ধ্বনিতে তার নাম ডাকা হচ্ছে। বিউটি টের পেল, সে আবার ফিরে এসেছে রাজপ্রাসাদে।

প্রাসাদে তার কামরায় সবকিছুই আগের মতো ঠিকঠাক আছে। পাখিগুলো বিউটিকে দেখে আবার আগের মতো প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠল। পাখিগুলোকে বিউটি কি ভুলে গিয়েছিল?

সে নিদারুণ উদ্গ্রীব হয়ে পড়ল অদ্ভুত জন্তুটাকে দেখার জন্য। ভাবতে লাগল, কখন রাত হবে, কখন রাতের খাবারের সময় হবে। কিন্তু রাতে অদ্ভুত জন্তু এল না। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করল বিউটি। কিন্তু কোনো পদশব্দ শোনা গেল না। তারপর বিউটি দ্রুতবেগে ছুটল বাগানে। সেখানে যদি জন্তুটাকে খুঁজে পাওয়া যায়! উঁচুনিচু পথ বেয়ে বিউটি ছুটছে। ডাক দিচ্ছে জন্তুটাকে। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। শেষে সে ঘন-ঘাসে-ঢাকা একটা পথের ধারে এসে দাঁড়াল। এই রাস্তাটাই সে স্বপ্নে দেখেছে।

সে দ্রুত রাস্তার মুখে এল। সামনেই একটা গাছ। গাছের পাশে গুহামুখ। ওখানেই শুয়ে আছে জন্তুটা। বিউটি যা ভেবেছে তা-ই সত্যি। জন্তুটা চিত হয়ে গোঁগোঁ করছে। জন্তুটাকে খুঁজে পাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি পেল বিউটি। বিউটি জন্তুটার মাথাটা কোলে তুলে নিল। ভয়ে আতঙ্কে চোখ বন্ধ হয়ে গেল তার।

—সে মরে গেছে। সাড়াশব্দ নেই। হায় হায় সব দোষ আমার। সব দোষ আমার।

ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল বিউটি। হঠাৎ ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখে, জন্তুটার ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে। কাছের ঝরনা থেকে দ্রুত পানি এনে ওর মুখে দিল বিউটি। জন্তুটার মুখের দিকে পরম মমতায় তাকিয়ে রইল বিউটি। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল, জন্তুটা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে।

—আহা, তুমি কেন আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে।

কাঁদতে কাঁদতে বলল বিউটি :

—আমি জানতাম না, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি। এই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছি—আমার ভালোবাসা কতটা পূর্ণ, কতটা খাঁটি। আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি তোমার মৃত্যুদশা দেখে। আমাকে ভালোবাসার প্রমাণের সুযোগ না দিয়েই তুমি কি চলে যাচ্ছিলে?

—আমার মতো বিকটদর্শন, কুৎসিত এক প্রাণীকে সত্যিই কি তুমি ভালোবাস?

মূর্ছার ঘোরে জানতে চাইল জন্তুটা।

—তুমি ঠিক সময়মতো এসে পড়েছ বিউটি। আমি মরে যাচ্ছিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছে তুমি আমাকে ভুলে গেছ। এখন আমি সুস্থ। যাও নিজের কামরায় ফিরে যাও। বিশ্রাম নাও। আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

বিউটি স্তম্ভিত হয়ে গেল। জীবন-মরণের প্রশ্নে জন্তুটা ক্ষিপ্ত না হয়ে বরং বিউটির সঙ্গে ভদ্র আচরণ করছে। বিউটি ফিরে এল প্রাসাদে।

রাতের খাবার অপেক্ষা করছে টেবিলে। খাওয়াদাওয়ার পরপর জন্তুটার আগমন হল। আগের মতোই স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ তার ভাবভঙ্গি। বিউটি তার বাবা আর ভাইবোনদের গল্প শোনাল তাকে। জন্তু জিজ্ঞেস করল : তারা তোমাকে পেয়ে কি খুশি হয়েছে? নিশ্চয়ই তারা তোমাকে দেখার পর আনন্দিত?

বিউটি গল্প করতে দারুণ মজা পাচ্ছে। সে বাড়ির সমস্ত গল্পই বর্ণনা করল। জন্তুটা মনোযোগ দিয়ে সব শুনছে। তারপর তার ওঠার সময় হল।

জন্তুটা শেষমুহূর্তে চির-পুরাতন প্রশ্নটা আবার করল। সহজ ও স্বাভাবিকভাবে।

—বিউটি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

বিউটি তখন নতমুখী। তার চোখের কোণে জলের বিন্দু। সে লাজুকভাবে মৃদুস্বরে বলল,

—হ্যাঁ করব।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝলক আলো যেন জ্বলে উঠল। হাউই এবং আতশবাজিতে রঙিন হয়ে উঠল সন্ধ্যার আকাশ। জোরে পটকা ফুটতে লাগল। কমলালেবুর গাছের সারিতে আলোর দীপাবলি। রাতের জোনাকিরা জ্বলে জ্বলে সারি বেঁধে একটা লেখা তৈরি করল : দীর্ঘজীবী হও রাজকুমার। দীর্ঘজীবী হও বিউটি।

জন্তুটার মুখের দিকে তাকাতেই অবাক বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল বিউটি। এ কী দেখছে সে, স্বপ্ন না সত্যি! তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুকুমার, সৌম্যদর্শন তার স্বপ্নে-দেখা রাজকুমার। ঠিক একই সময়ে প্রাসাদের সামনে ছয়-ঘোড়ার গাড়ির শব্দ শোনা গেল। গাড়ি থেকে নেমে এল দুজন মহিলা। একজন হচ্ছে সেই সুদৃশ্য পোশাকধারী মহিলা যাকে সে স্বপ্নে দেখেছে। আরেকজন রানির মতো দেখতে—একেও স্বপ্নে দেখেছে বিউটি।

একজন মহিলা বিউটির উদ্দেশে বলল,

—শুভ হোক। সকল কিছু শুভ হোক। মহারানি—এই মেয়ের নাম বিউটি, যার সাহসের কারণে আমাদের রাজকুমার তার ভয়ংকর অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে। আপনি ওদের বিবাহের অনুমতি দিন। আপনি আশীর্বাদ করুন, ওরা সুখী হোক।

—আমার হৃদয়ের সকল ঐশ্বর্য দিয়ে আমি ওদের আশীর্বাদ করছি।

রানির চোখে শুভ্র তুষারের মতো জলবিন্দু। বিউটিকে জড়িয়ে ধরে রানি বলতে লাগলেন,

—আমি কী বলে তোমায় ধন্যবাদ দেব। তোমার কল্যাণেই আমার সন্তান আবার জীবন ফিরে পেয়েছে। শাপগ্রস্ত হয়ে আমার সন্তান অদ্ভুত জন্তু হয়ে গিয়েছিল। তার অভিশাপের শর্ত ছিল, কোনো মেয়ে যদি তাকে ভালোবেসে বিয়ে করে তবেই সে কেবল আবার মানুষের রূপ ফিরে পাবে। আজ আমার ছেলে আবার মানুষ হয়েছে। এ-আনন্দ আমি কোথায় রাখি?

রানি তার দু-কোলে রাজকুমার আর বিউটিকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। তখন

পরীরা এল শুভেচ্ছা জানাতে। তারা ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিল বর-কনের মাথায়। একজন পরী তখন বিউটিকে বলল,

—আমি এখুনি চলে যাচ্ছি তোমার বাবা আর ভাইবোনদের নিয়ে আসতে। তা না হলে বিয়ের উৎসব জমবে না।

পরদিন বিয়ের আনন্দ-অনুষ্ঠান শুরু হল। নাচ-গান, হইচই, হাস্যকৌতুকের বন্যা বয়ে গেল সেই বিয়েতে। এমন অভূতপূর্ব, আনন্দদায়ক, স্ফূর্তিময় অনুষ্ঠান আর কোথায় কখনও হয়নি।

রাজকুমার আর বিউটি তারপর পরম সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল।

অনুবাদ : আমীরুল ইসলাম

হাস্যকৌতুক

১. প্রিয়াংকা রাতে ঘুমাতে যাবার আগে প্রার্থনা করছিল : আল্লাহ দয়া করে ন্যাপলসকে ইতালির রাজধানী করে দাও।"
তার মা হঠাৎ করে এসে বলেন, "তুমি এই প্রার্থনা করছ কেন?"
প্রিয়াংকা বলল, "কারণ আজ আমি আমার ভূগোল পরীক্ষায় তা-ই লিখেছি।"

২. স্যার : এত আস্তে-আস্তে চিঠি লিখছ কেন?
ছাত্র : আমার বোন তো আস্তে-আস্তে পড়ে তাই।

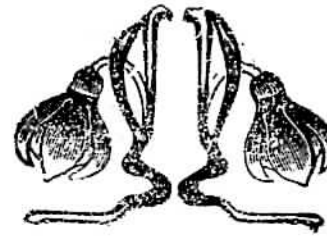

লুৎফর রহমান রিটন

বাবা রে বাবা

আমার মতোই বাবাটাও নাকি ছোট্ট ছিল রে আগে?
ভাবতে কী ভালো লাগে!
নীল হাফপ্যান্ট আর শাদা শার্ট পরে যেত ইশকুলে
কান ছিল তুলতুলে
সেই কানদুটো প্রিয় ছিল খুবই ক্লাস-টিচারের কাছে!
সেটা তো জানাই আছে
ইশকুলে গিয়ে কপালে জুটত নিয়মিত কানমলা
চোখ বুজে যায় বলা।

বাবাটার বাবা রাগী ছিল খুবই যেমনটি এই বাবা
'গোল্লায় তুমি যাবা'—
এ-কথা বলেই পিটুনি লাগাত কষে দিত চড় কিল
আরো ছিল মুশকিল
আমার মতোই খেলতে দিত না বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
বুড়ো পাজি ছিল কী-যে!

আজ বড় হয়ে বাবাটাও দ্যাখ ঠিক দাদুটারই মতো
শাসন করে যে কত!
আমি বড় হলে আমার ছেলেকে একটুও বকব না
বলব, 'লক্ষ্মী সোনা—
ইশকুলে যেতে হবে না তোমাকে, বৃষ্টিতে খেলো গিয়ে'

বলব কী ভাই, বিপদেই আছি পাজি বাবাটাকে নিয়ে।

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র